সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৩তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

১৩ খন্ড
সূরা মারইয়াম
থেকে
সূরা আল হজ্জ

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ শহীদুল্লাহ এফ, বারী

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(১৩তম খন্ড সূরা মারইয়াম থেকে সূরা আল হাজ্জ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

১১তম সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪৩২ ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed

13th Volume
(Surah Marium to Surah Al Hajj)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955

Bangladesh Centre
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Sales Centre: 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997

1st Edition 1999

11th Edition
Rabiul Awal 1432 February 2011

Price Tk. 200 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN NO 984-8490-25-6

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ্ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি, তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো। মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকারে ফেটে পড়ে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ-আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরুম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❏ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❏ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তো আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা মারইয়াম

আয়াত ৯৮ রুকু ৬

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣
قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ
بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ
امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ
يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ
يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ
وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

১. কাফ-হা-ইয়া-আঈন-ছোয়াদ। ২. (হে নবী, এ হচ্ছে) তোমার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলো) স্মরণ (করা), যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন, ৩. যখন সে একান্ত নীরবে তার মালিককে ডাকছিলো। ৪. সে বলেছিলো, হে আমার মালিক, আমার (শরীরের) হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেছে (তুমি আমার দোয়া কবুল করো), হে আমার মালিক, আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি! ৫. আমার (মৃত্যুর পর) আমি আমার পেছনে পড়ে থাকা আমার ভাই বন্ধুদের (দ্বীনের ব্যাপারে) আশংকা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রীও হচ্ছে বন্ধ্যা, (সন্তান ধারণে সে সক্ষম নয়, তাই) তুমি একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করো, ৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে– উত্তরাধিকত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের, হে (আমার) মালিক, তুমি তাকে একজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও। ৭. (আল্লাহ তায়ালা বললেন,) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে একটি ছেলে (হওয়া)-র সুখবর দিচ্ছি, তার নাম (হবে) ইয়াহ্ইয়া, এর আগে এ নামে আমি কোনো মানুষের নামকরণ করিনি। ৮. সে বললো, হে আমার মালিক, আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি নিজেও (এখন) বার্ধক্যের শেষ সীমানায় এসে উপনীত হয়েছি। ৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ), এটা এভাবেই (হবে), তোমার মালিক বলছেন,

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ قَالَ
رَبِّ اجْعَل لِّيٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠
فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً
وَّعَشِيًّا ۝١١ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝١٢ وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۝١٣ وَّبَرًّا ۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝١٤
وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝١٥ وَاذْكُرْ فِى
الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝١٦ فَاتَّخَذَتْ مِنْ
دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧ قَالَتْ

এটা আমার জন্যে নিতান্ত সহজ কাজ, আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম– (তখন) তুমিও তো কিছু ছিলে না! ১০. সে বললো, হে আমার মালিক, আমাকে (এ জন্যে কিছু) একটা নিদর্শন (বলে) দাও; তিনি বললেন (হ্যাঁ), তোমার নিদর্শন হচ্ছে, (সুস্থ থেকেও) তুমি (ক্রমাগত) তিন রাত মানুষদের সাথে কোনোরকম কথাবার্তা বলবে না। ১১. অতপর সে কামরা থেকে বেরিয়ে তার জাতির লোকদের কাছে এলো এবং ইশারা ইংগিতে তাদের বুঝিয়ে দিলো, তারা যেন সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। ১২. (এরপর এক সময় ইয়াহইয়ার জন্ম হলো, সে যখন বড়ো হলো, তখন আমি তাকে বললাম,) হে ইয়াহইয়া, (আমার) কেতাবকে তুমি শক্ত করে ধারণ করো; (আসলে) আমি তাকে ছেলে বেলায়ই বিচার বুদ্ধি দান করেছিলাম, ১৩. সে আমার একান্ত কাছ থেকেই হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা লাভ করলো; সে ছিলো (আসলেই) একজন পরহেযগার ব্যক্তি, ১৪. (তদুপরি) সে ছিলো পিতা মাতার একান্ত অনুগত– কখনো সে অবাধ্য ও নাফরমান ছিলো না। ১৫. তার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিলো), যেদিন তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, (শান্তি বর্ষিত হবে সেদিন)– যেদিন সে মৃত্যু বরণ করবে এবং যেদিন পুনরায় সে জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হবে।

রুকু ২

১৬. (হে নবী,) এ কেতাবে মারইয়ামের কথা তুমি স্মরণ করো। (বিশেষ করে সে সময়ের কথা-) যখন সে তার পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকের একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। ১৭. অতপর লোকদের কাছ থেকে (নিজেকে আড়াল করার জন্যে) সে পর্দা করলো। আমি তার কাছে আমার রূহ (জিবরাঈল)-কে পাঠালাম, সে পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করলো।

إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّٗا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ

لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمٗا زَكِيّٗا ﴿١٩﴾ قَالَتۡ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ

وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٞۖ وَلِنَجۡعَلَهُۥٓ ءَايَةٗ

لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةٗ مِّنَّاۚ وَكَانَ أَمۡرٗا مَّقۡضِيّٗا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بِهِۦ مَكَانٗا

قَصِيّٗا ﴿٢٢﴾ فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ

قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيٗا مَّنسِيّٗا ﴿٢٣﴾ فَنَادَىٰهَا مِن تَحۡتِهَآ أَلَّا تَحۡزَنِي قَدۡ جَعَلَ

رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِيّٗا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا

جَنِيّٗا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا

১৮. সে বললো (হে আগন্তুক ব্যক্তি), তুমি যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, তাহলে আমি তোমা (-র অনিষ্ট) থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাই। ১৯. সে বললো, আমি তোমার মালিকের পাঠানো দূত, (আমি তো এজন্যে এসেছি) যেন তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দিয়ে যেতে পারি। ২০. সে বললো (এ কি বলছো তুমি)! আমার ছেলে হবে কিভাবে, আমাকে (তো আজ পর্যন্ত) কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি, আর না আমি কখনো অসতী ছিলাম! ২১. সে বললো (হ্যাঁ), এভাবেই (হবে), তোমার মালিক বলছেন, তা আমার জন্যে খুবই সহজ কাজ এবং আমি তাকে মানুষদের জন্যে (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ (-সাদৃশ্য একটি মানুষ) বানাতে চাই, (মূলত) এটা ছিলো (আমার পক্ষ থেকে) এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। ২২. অতপর সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো এবং তাকে সহ দূরে (কোনো) এক জায়গায় চলে গেলো। ২৩. তারপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নীচে নিয়ে এলো, সে বললো, হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং আমি যদি (মানুষদের স্মৃতি থেকে) সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম! ২৪. তখন একজন (ফেরেশতা) তাকে তার নিচের দিক থেকে আহ্বান করে বললো (হে মারইয়াম), তুমি কোনো রকম দুঃখ করো না, তোমার মালিক (তোমার পিপাসা নিবারণের জন্যে) তোমার (পায়ের) নীচে একটি (পানির) ঝর্ণা বানিয়ে দিয়েছেন, ২৫. তুমি এ খেজুর গাছের কান্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, (দেখবে) তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে, ২৬. অতপর (এ গাছের) খেজুর তুমি খাও এবং (এ ঝর্ণার) পানীয় পান করো এবং (সন্তানের দিকে তাকিয়ে তোমার) চোখ জুড়াও, (ইতিমধ্যে) যখনি তুমি মানুষদের কাউকে দেখো তাহলে বলবে, আমি আল্লাহ তায়ালার নামে রোযার মান্নত করেছি, (এ কারণে) আমি আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলবো না। ২৭. অতপর সে তাকে

فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِۦ
قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا
كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟
كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ
ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِى
بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى
جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا
كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ

নিজের কোলে বহন করে নিজের জাতির কাছে (ফিরে) এলো; লোকেরা (তার কোলে সন্তান দেখে) বললো, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কান্ড করে বসেছো। ২৮. হে হারুনের বোন (একি করলে তুমি)? তোমার পিতা তো কোনো অসৎ ব্যক্তি ছিলো না, তোমার মাতাও তো (চারিত্রিক দিক থেকে) কোনো খারাপ (মহিলা) ছিলো না! ২৯. সে (সবাইকে) তার (কোলের শিশুটির) দিকে ইশারা করলো (এবং বললো তোমাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে একেই জিজ্ঞেস করো); তারা বললো, আমরা তার সাথে কিভাবে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার শিশু! ৩০. (এ কথা শুনেই) সে (শিশু) বলে ওঠলো (হ্যাঁ), আমি হচ্ছি আল্লাহ তায়ালার বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিয়েছেন এবং আমাকে তিনি নবী বানিয়েছেন, ৩১. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতোদিন আমি বেঁচে থাকি ততোদিন যেন আমি নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত প্রদান করি। ৩২. আমি যেন মায়ের প্রতি অনুগত থাকি, (আল্লাহর শোকর,) তিনি আমাকে না-ফরমান বানাননি। ৩৩. আমার ওপর (আল্লাহ তায়ালার বিশেষ) প্রশান্তি- যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, প্রশান্তি (থাকবে) সেদিন, যেদিন আমি (আবার) মৃত্যুবরণ করবো এবং (মৃত্যুর পরে) যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো। ৩৪. এ হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা এবং (এ হচ্ছে তার) আসল ঘটনা, যা নিয়ে তারা অযথাই সন্দেহ করে। ৩৫. (তারা বলে, সে আল্লাহ তায়ালার সন্তান, কিন্তু) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার কাজ নয়, তিনি (এ থেকে) অনেক

كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ

عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

পবিত্র; তিনি যখন কোনো কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন 'হও' এবং সাথে সাথেই তা 'হয়ে যায়'; ৩৬. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার মালিক এবং তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা সবাই তাঁরই গোলামী করো; আর এটাই হচ্ছে (সহজ ও) সরল পথ। ৩৭. এরপর (তাদের) দলগুলো নিজেদের মাঝে (মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে) নানা মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, অতপর (যারা আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা) অস্বীকার করলো তাদের জন্যে রয়েছে (কেয়ামতের) কঠিন দিনের দুর্ভোগ। ৩৮. যেদিন এরা আমার সামনে এসে হাযির হবে, সেদিন তারা ভালো করেই শুনবে এবং ভালো করেই দেখতে পাবে, কিন্তু আজ এ যালেমরা (না শোনা ও না দেখার ভান করে) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। ৩৯. (হে নবী,) সেই আক্ষেপের দিনটি সম্পর্কে তুমি এদের সাবধান করে দাও, যেদিন (জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। (এখন তো) এরা এ ব্যাপারে গাফলতে (ডুবে) রয়েছে, ওরা (আল্লাহর ওপরও) ঈমান আনছে না। ৪০. নিন্দেহে (এ) পৃথিবীর মালিক আমি এবং তার ওপর যা কিছু রয়েছে সেসবেরও, আর তাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অধিকাংশ মক্কী সূরার ন্যায় এই সূরাটিতেও তাওহীদ, পুনরুত্থান এবং লা-শরীফ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য সূরার প্রধান উপাদান হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ। এতে গোড়ার দিকে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারইয়াম, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, হারুন, ইসমাঈল, ইদ্রিস এবং আদম ও নূহ (আ.) প্রমুখ নবী রসূলদের আংশিক আলোচনাও এসেছে। সূরার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জুড়েই এসব ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যমে যে বিষয়গুলো প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ, পুনরুত্থান, আল্লাহ তায়ালা সন্তানহীন ও শরীকহীন, সত্য পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শ এবং সর্বোপরি ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের জীবনাদর্শের স্বরূপ।

এর পর আলোচনায় স্থান পেয়েছে কেয়ামতের কিছু চিত্র এবং পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের সাথে কিছু তর্ক বিতর্ক।

শেরককে বর্জন করা, আল্লাহর সন্তান হওয়া দাবীকে অস্বীকার করা, ইহকালে ও পরকালে কাফের মোশরেকদের করুণ পরিণতির বিষয়টি উপস্থাপন করা, এসব কিছুই এসেছে সূরায় মূল বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ফলে এসব আলোচনা সূরার মুল প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

সূরায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় একটা তীব্র আবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই আবেগ অনুভূতি মানব হৃদয়ে যেমন পরিলক্ষিত, তেমনি পরিলক্ষিত হচ্ছে পারিপার্শ্বিক জগতে। এই সে বিশাল জগত যা আমাদের কাছে এক অনুভূতিহীন জড় পদার্থ বলে মনে হয়, সেই জগতই আলোচ্য সূরার বর্ণনায় একটা অনুভূতিশীল ও সংবেদনশীল জীবন্ত অস্তিত্ব রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আমরা আকাশকে চরম ক্রোধে বিদীর্ণ হতে দেখতে পাই, প্রচন্ড আক্রোশে পাহাড়কে দিখন্ডিত হতে দেখতে পাই। অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় এসব জড় পদার্থও যে প্রভাবিত হয় তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। (এই আশংকার কারণ হচ্ছে এটাই) যে, এরা দয়াময় আল্লাহর জন্যে .... হিসেবে উপস্থিত হবে না। (আয়াত ৯০-৯২)

অপরদিকে মানবীয় আবেগ অনুভূতির বিষয়টির বর্ণনা এসেছে সূরার গোড়ার দিকে এবং শেষের দিকে। সূরায় বর্ণিত মূল ঘটনা জুড়ে রয়েছে এসব আবেগ অনুভূতির আলোচনা, বিশেষ করে মারইয়াম (আ.) এবং ঈসা (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মানবীয় আবেগ অনুভূতির আধিক্য ও প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

সূরার অন্তর্নিহিত ভাব ও ভঙ্গির মাঝে দয়া, করুণা, সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর যোগসূত্রের চিত্রটি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে। সূরার গোড়ার দিকেই যাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রসঙ্গ এসেছে। অপরদিকে যাকারিয়া (আ.) স্বীয় প্রভু ও মালিকের সাথে যে একাকী ও নিভৃতে নিজের মনের বাসনা ও আরযিটুকু সকাতর ভাষায় তুলে ধরছেন– সে প্রসংগও এসেছে। সূরার একাধিক স্থানে 'রহমত' শব্দ বা এর সমার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। সাথে সাথে 'পরম করুণাময়' শব্দের অধিক ব্যবহারও এখানে লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, পরকালে মোমেনরা যে সব নেয়ামত ভোগ করবেন সেগুলোকে 'ভালোবাসা' রূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াহ্‌ইয়া (আ.)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে সেটাকে 'স্নেহ বা মমতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তদ্রুপ ঈসা (আ.)-কে যে মাতৃভক্তি ও মাতৃ প্রীতির গুণ দান করা হয়েছে সেটাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'নম্রতা' ও 'কোমলতা' বলে।

মোটকথা, প্রতিটি শব্দে ও প্রতিটি বাক্যের পরতে পরতে আপনি দয়া, মায়া ও মমতার কোমল স্পর্শ অনুভব করবেন। অপরদিকে যেখানে 'শেরক' এর প্রসংগ এসেছে সেখানে আপনি গোটা সৃষ্টি জগতের মাঝে এক প্রচন্ড দ্রোহ ও ক্ষোভ অনুভব করবেন। মনে হবে যেন আকাশ পাতাল ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। কারণ, একমাত্র আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা মহাপাপ। এই পাপের কথা শুনে আকাশ পাতাল ও প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়তে উপক্রম হয়।

বর্ণনাভংগির মাঝেও এক বিচিত্র ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এখানে রয়েছে ছোট ছোট ও ছন্দময় বাক্য। প্রতিটি বাক্যের সমাপ্তি ঘটেছে একটি সুষম মাত্রা ও তালের মাধ্যমে। কোথাও লঘু আবার কোথাও গুরু। ক্ষোভ, আক্রোশ ও দ্রোহ যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেখানে শব্দের শেষের অক্ষরটি দ্বিত্ব রূপে এসেছে। ফলে ছন্দ ও তালের মাঝে দৃঢ়তা গাম্ভীর্য ও রুক্ষতার সৃষ্টি হয়েছে

যেমন, মাদ্দা, দিদ্দা, এদ্দা, হাদ্দা, এয্যা ও আয্যা ইত্যাদি। অর্থাৎ বক্তব্যের বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে ছন্দ ও মাত্রার মাঝেও বৈচিত্র্য এসেছে এই সূরার প্রতিটি জায়গায়।

বিবৃতি বা কাহিনী ধর্মী বক্তব্যে ছন্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। পক্ষান্তরে যেখানে মন্তব্য বা বিশ্লেষণ ধর্মী বক্তব্য এসেছে সেখানে বর্ণনা ভংগি সরল ও গদ্যময়। এই ভাবে বক্তব্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্ণনা ভংগির মাঝেও পরিবর্তন এসেছে সূরার একাধিক স্থানে।

আলোচ্য সূরার বিষয়বস্তু তিনটি পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এসেছে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, মারিয়াম ও ঈসা (আ.)-এর ঘটনা। ঘটনা বর্ণনা শেষে মন্তব্যের পালা এসেছে। এখানে ঈসা (আ.)-এর জন্মকে কেন্দ্র করে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে বিতর্ক চলে আসছে তার পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা এসেছে। এই ঘটনার বর্ণনায় তার পিতাসাথে ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রসংগ এসেছে। শেরকবাদী সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎ ও ন্যায় পরায়ন সন্তান-সন্ততির আকারে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তারও বর্ণনা এসেছে। এর পর নবী রসূলদের প্রসংগ এসেছে। সঠিক পথের অনুসারীদের শুভ পরিণতির বক্তব্যও এসেছে। সাথে সাথে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের অশুভ পরিণতির প্রসংগও উল্লেখিত হয়েছে। এই পর্যায়ে সব শেষে লা-শরীক আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা, অধিকার ও আনুগত্যের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, (কিছু সংখ্যক মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার ....পুনরুত্থিত হবো? (আয়াত ৬৫)

তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়টি এসেছে। এ প্রসংগে কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে শেরক ও খোদাদ্রোহীতার প্রতি গোটা সৃষ্টি জগতের প্রচন্ড ক্ষোভ ও আক্রোশের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে যুগে যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলোর করুণ দৃশ্যের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, (এই মূর্খ) লোকেরা বলে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন। (আয়াত ৮৭)

এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

তাফসীর

আয়াত ১-৪০

সূরার প্রথমেই পাঁচটি বিক্ষিপ্ত আরবী বর্ণ এসেছে। ইতিপূর্বেও এ জাতীয় বর্ণের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। এর ব্যাখ্যায় একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে আমাদের কাছে যে বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে তা হলো এই আল কোরআন– যা জাতীয় আরবী বর্ণমালারই সমষ্টির নাম। তবে এ সব বর্ণমালাগুলোকে পবিত্র কোরআনে এমন একটি ধারায় এমন একটি পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। অথচ মানুষ নিজেও এসব বর্ণ দ্বারা শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু কোরআনের পদ্ধতি ও ধারা অনুযায়ী শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারন, এই পদ্ধতি হচ্ছে অভিনব, এই ধারা হচ্ছে অসাধারণ।

হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর ঘটনা

এরপর যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আল্লাহর রহমত, দয়া ও করুণার বক্তব্য একাধিক বার এসেছে। ফলে পুরো ঘটনাটিই আল্লাহর রহমত ও দয়ার মূর্ত প্রতীক রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমেই এসেছে মোনাজাতের কথা, আল্লাহর কাছে যাকারিয়া (আ.)-এর সকাতর ও মিনিতিভরা দোয়ার কথা। সেই সকাতর আরযিতে তিনি স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে করে বলেন,

'যখন সে একান্ত নীরবে......... সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও। (আয়াত ৩-৬)

তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে, নির্জন ও নিভৃতে একাকী বসে বসে নিজের প্রভূ ও মালিকের সামনে নিজের মনের আশা-আকাংখা ও দুঃখ বেদনা তুলে ধরছেন। নিজের প্রভু ও মালিককে সরাসরি ডাকছেন 'প্রভুগো' নিজের এখানে অন্য কাউকে মাধ্যম করা হয়নি। এমন কি সম্বোধনের জন্যে সচরাচর যে 'হে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে সেটাও ব্যবহার করা হয়নি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, শব্দগত সকল প্রকার মাধ্যম ছাড়াই তিনি স্বীয় প্রভূ 'আল্লাহ' কে সরাসরি সম্বোধন করছেন যেন তিনি তাঁর সামনেই বসে বসে দোয়া করছেন। এটা ঠিক যে, আল্লাহ তায়ালা দোয়া না করলেও শুনেন, কেউ তাঁকে না ডাকলেও দেখেন। কিন্তু বিপদগ্রস্ত বান্দা তার মনের দুঃখ প্রকাশ করতে চায়, তার মনের আবেগ-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে চায়। তাই করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সে সুযোগ দিয়েছেন এবং অনুমতিও দিয়েছেন যেন সে তার মনের ব্যথা বেদনা ও যন্ত্রণার কথা তাঁর দরবারে তুলে ধরে। এর মাধ্যমে তার যন্ত্রণা লাঘব হবে, ব্যথায় উপশম হবে, মন হাল্কা হবে। সাথে সাথে তার মনে এই প্রত্যয়ও জন্মাবে যে, সে এমন এক মহা শক্তিশালী প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়েছে, যিনি কাউকে হতাশ করেন না, নিরাশ করেন না, খালী হাতেও কাউকে ফিরিয়ে দেন না।

যাকারিয়া (আ.) নিজের বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কথা তাঁর প্রভূকে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় জানাচ্ছেন। অস্থি মজ্জা দূর্বল হয়ে পড়েছে, চুলে পাক ধরেছে, শারীরিক ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। এমতাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, আর কোনো ভরসা নেই। তাই তিনি নিজের দুঃখ-দুর্দশা ও আশা-আকাংখা তাঁর দরবারেই পেশ করছেন।

মিনতি ভরা আরযি পেশ করার পর তিনি একটি কথা যোগ করে বলছেন, 'আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি' এই বক্তব্য দ্বারা তিনি স্বীকার করছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই তিনি তাঁর কাছে দোয়া করে কখনও বিফল হননি। অথচ তখন তিনি শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আর এখন তো তিনি অক্ষম ও দুর্বল। এই চরম বার্ধক্যে তো তিনি আরো দয়া ও করুণার মুখাপেক্ষী। কাজেই আল্লাহ তায়ালা যে, তার ডাকে এখন আরো বেশী করে সাড়া দেবেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

নিজের অবস্থার বর্ণনা দেয়ার পর এবং নিজের মনের আশা-আকাংখা তুলে ধরার পর তিনি একটি আশংকার কথা আল্লাহকে জানাচ্ছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার আত্মীয়স্বজনরা হয়তো তার আদর্শ ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। বনী ইসরাঈলের একজন নেতৃস্থানীয় নবী হিসেবে তার প্রতি অর্পিত মহান দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ। এ ছাড়া তিনি যাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তার এক জন ছিলেন মারইয়াম (আ.) যার দেখা শোনা তাকেই করতে হবে। অপরদিকে তিনি ধন সম্পদেরও মালিক ছিলেন, এসব ধন সম্পদ তিনি দেখা-শুনা করতেন এবং সঠিক রাস্তায় খরচ করতেন। এখন তিনি আশংকা করছেন যে, পরবর্তীতে যারা তার স্থলাভিষিক্ত হবে তারা হয়তো এসকল দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে না, এমন কি হয়তো তারা তার আদর্শ ও পথও অনুসরণ করবে না। এটা তিনি তাদের আচার আচরণ ও চলন বলন থেকেই জানতে পেরেছিলেন।

এরপর তিনি জানাচ্ছেন যে, তার স্ত্রী একজন বন্ধ্যা নারী, কাজেই তিনি এমন কোনো পুত্র সন্তান লাভ করেননি যাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে এই গুরু দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে রেখে যেতে পারবেন। এ কারণেই তিনি আশংকা করছেন এবং ভয় পাচ্ছেন। ফলে তার একজন সুসন্তানের খুবই প্রয়োজন যার পক্ষে তাঁর রেখে যাওয়া গুরু দায় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে

এবং নিজের পিতা ও পিতামহদের নবুওতী দায়িত্বভার গ্রহণ করাও সম্ভব হবে। এই সুসন্তান কামনা করেই তিনি আরযি পেশ করছেন এই ভাষায়, আমার (মৃত্যুর পর) আমি .... তুমি তাকে একজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বানাও। (আয়াত ৫-৬)

এই চরম বার্ধক্যে তিনি যে সুসন্তানের জন্যে মিনতি জানাচ্ছেন তার একটি গুণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'হে রব, তাকে তুমি রাযী খুশী থাকার (গুণ দিয়ে) সৃষ্টি করবে', অর্থাৎ সে যেন অহংকারী না হয়, বদমেযাজী না হয়, দাম্ভিক না হয় এবং লোভী না হয়। কারণ যার মাঝে রাযি, খুশী ও সন্তুষ্ট থাকার গুণ পাওয়া যাবে, তার মাঝে কখনও এই দোষগুলো থাকতে পারে না।

যাকারিয়া (আ.)-এর এই দোয়া ও মোনাজাত চলছিলো গোপনে ও নীরবে। এই দোয়ার ভাষা ও বক্তব্য ছিলো কোমল ও মিনতি ভরা। দোয়া এভাবেই করতে হয় এবং এ ভাবেই তা হওয়া উচিত।

এরপর আসছে দোয়া কবুলের দৃশ্য। এই দৃশ্যে আমরা মহান আল্লাহকে অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময় ও সহানুভুতিশীল পাচ্ছি। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর বান্দার নাম নিয়ে ডাকছেন, 'হে যাকারিয়া' বলে। এরপর বিলম্ব না করে বলছেন, 'তোমাকে আমি এক জন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি', এই সুসংবাদ শুনানোর সাথে সাথে পুত্রটির নামও ঘোষণা দিয়ে জানানো হচ্ছে। আর সে নাম হচ্ছে 'ইয়াহইয়া', এক অভিনব ও অভূতপূর্ব নাম। ইতিপূর্বে কাউকেই এই নামে ডাকা হয়নি।

আল্লাহর করুণা অঝোর ধারায় বয়ে যাচ্ছে এক বান্দার ওপর, যিনি নিজ প্রভুর সামনে কাতর স্বরে দোয়া করে চলেছেন, নীরবে ডেকে চলেছেন, নিজের মনের আশা-আকাংখার কথা তাকে জানাচ্ছেন। এই দোয়া ও কাকুতি মিনতির পেছনে এক মাত্র কারণ হচ্ছে যে, তিনি নিজ আদর্শ, নিজ আকীদা বিশ্বাস, নিজ ধন সম্পদ এবং দায় দায়িত্ব অর্পণ করার মতো উপযুক্ত কোনো পাত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। এরূপ একজন সুপাত্রের জন্যেই তিনি তার প্রভুর কাছে আরযি পেশ করেন। দয়াময় প্রভু তার ডাকে সাড়া দেন এবং তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ লাভের পরপরই যাকারিয়া (আ.) এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি হন। আর তা হলো, তিনি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন, শারীরিক দুর্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাছাড়া তার স্ত্রী ও একজন বন্ধ্যা নারী। সন্তান প্রসব করার মতো স্বাভাবিক ক্ষমতা তার নেই। এমতাবস্থায় তাঁর ঘরে কিভাবে সন্তান আসবে। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। তাই সে ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত হতে চান, কিভাবে এবং কোন উপায়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে সন্তান দান করবেন তা তিনি জানতে চান, বুঝতে চান। তাই তিনি বলে উঠলেন,

'সে বললো, হে আমার .... সীমানায় এসে উপনীত হয়েছি।' (আয়াত ৮)

তিনি একদিকে এই কঠিন বাস্তবতায় মুখোমুখি, অপর দিকে আল্লাহর ওয়াদা তার সামনে। তিনি এই ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। কিন্তু তিনি জানতে চান ও আশ্বস্ত হতে চান, এই কঠিন বাস্তবতার অস্তিত্ব সত্তেও ওয়াদার বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, এটা সাধারণ মানবীয় স্বভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। যাকারিয়া (আ.) একজন আল্লাহভীরু ও সৎ নবী ছিলেন। কিন্তু তিনি তো ছিলেন একজন মানুষ। কাজেই বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। এটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি আগ্রহ ভরে দেখতে চান ও জানতে চান যে, এই কঠিন বাস্তবকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে পরিবর্তন করবেন।

আল্লাহ তায়ালা এখানে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এরূপ করাটা তাঁর কাছে ব্যাপারই নয়। বরং খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলছেন, আল্লাহ তায়ালা......... তুমি কিছুই ছিলে না! (আয়াত ৯)

সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে কঠিন নয়। ছোট-বড়, এবং তুচ্ছ-অতুচ্ছ সব কিছুরই সৃষ্টির পদ্ধতি আল্লাহর কাছে কেবল একটাই। আর তা হলো, তিনি নির্দেশ দেন 'হও, এবং সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।'

বন্ধ্যা নারীর গর্ভে এবং অশীতিপর বৃদ্ধের ঔরসে সন্তান জন্ম না নেয়ার সাধারণ নিয়ম আল্লাহ তায়ালা নিজেই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এই নিয়মের পরিবর্তন করার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। ফলে একজন বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে এবং বৃদ্ধ পুরুষের মাঝে যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তিনি উভয়কে সন্তান উৎপাদনোক্ষম করে তুলতে পারেন। এটা কোনো উপাদান ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক বেশী সহজ। যদিও আল্লাহর কুদরতের সামনে সব কিছুই সহজ নতুন করে কিছু সৃষ্টি করা বা পুনরায় কিছু সৃষ্টি করা সবই আল্লাহর কাছে সমান।

তা সত্ত্বেও আশ্বস্ত হওয়ার আগ্রহে যাকারিয়া (আ.) সে শুভ সংবাদ বাস্তবায়নের একটা নিদর্শন বা আলামত দেখতে চান। আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া (আ.)-এর মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি নিদর্শন দান করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তিনি বার্ধক্যে পুত্র লাভ করার মতো এক বিরল নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারেন। আর সেই নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তিনি একাকী ও নির্জনে একাধারে তিন রাত আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী ও যেকের আযকারে কাটাবেন এবং এই সময়ে তিনি সম্পুর্ণ সুস্থ থাকা সত্তেও মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। বরং ইশারা ইংগিতে তাদের সাথে কথা বলবেন। নিচের আয়াতে সে বিষয়টি সম্পর্কেই বলা হয়েছে, সে বললো,

'হে আমার ....পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।'(আয়াত ১০-১১)

তিনি উপস্থিত জনতাকে ইংগিতে দিন রাত আল্লাহর যেকেরে মশগুল থাকতে বললেন, যেন তারাও সেই একই আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিচরণ করতে পারে যে পরিবেশে তিনি তিন দিন যাবত বিচরণ করছেন এবং তারাও যেন তার সাথে এই বিরল ও অভাবনীয় নেয়ামত লাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে একত্ব হয়ে যেতে পারে।

নবুওতের উত্তরাধীকারী হিসেবে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)

ধ্যান ও তসবীহমগ্ন যাকারিয়া (আ.)-এর প্রসংগ আপাতত স্থগিত রেখে আল্লাহ তায়ালা এখন নতুন এক প্রসংগের অবতারণা করছেন। এই প্রসংগটি হচ্ছে ইয়াহইয়া (আ.)-কে কেন্দ্র করে। এখানে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যে তার নাম ধরে ডাক দিয়ে বলছেন, ইয়াহিয়ার জন্ম হলো, এক পর্যায়ে সে যখন বড়ো .... বুদ্ধি দান করেছিলাম। (আয়াত ১২)

যাকারিয়া (আ.)-এর প্রসংগ এবং ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রসংগের মাঝে সময়ের যে বিরাট ব্যবধান ছিলো তারই মাঝে ইয়াহইয়া (আ.) জন্ম লাভ করেন, লালিত-পালিত হন এবং শৈশবে পদার্পন করেন। এই ব্যবধান ঘুচিয়ে পবিত্র কোরআন তার নিজস্ব রচনা শৈলীর মাধ্যমে নতুন প্রসংগের অবতারনা করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

আলোচ্য আয়াতে ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে একটি কথাও না বলে সরাসরি তার নাম ধরে ডাকার মাধ্যমে তার উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাকে এমন একজন উপযুক্ত উত্তরসূরী দান করেছেন যিনি তার মৃত্যুর পরে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন, তার আদর্শের ধারক ও বাহক হবেন। এ কারণেই

ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কিত প্রথম বক্তব্যেই তাকে এক মহান দায়িত্বের জন্যে নির্বাচিত করা হয় এবং বলা হয়, ইয়াহিয়ার জন্ম হলো, এক পর্যায়ে .... বুদ্ধি দান করেছিলাম। (আয়াত ১২)

আলোচ্য আয়াতে গ্রন্থ বা কেতাব বলতে 'তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে যা মূসা (আ.)-কে দান করা হয়েছিলো। এই কেতাবেরই অনুসরণ করতো বনী ইসরাঈলের সকল গোষ্ঠী এবং এই কেতাবেরই তালিম ও প্রচার প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশের সকল নবী রসূলরা। এখন ইয়াহইয়া (আ.) উত্তরাধিকার সূত্রে এই গ্রন্থই তার পিতা যাকারিয়া (আ.)-এর কাছ থেকে লাভ করতে যাচ্ছেন। তাই তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, তিনি যেন এই গুরু দায়িত্ব দৃঢ়তা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং এ ব্যাপারে যেন কোনো রূপ দূর্বলতা, অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার পরিচয় না দেন। সাথে সাথে উত্তরাধিকারের এই কঠিন দায়িত্ব থেকে যেন কখনও পিছপা না হন।

সম্বোধনের পালা শেষ হওয়ার এখন ইয়াহইয়া (আ.)-কে স্বীয় গুরু দায়িত্ব পালন করার মতো উপযোগী কি কি গুণাবলী দান করা হয়েছে সে প্রসংগে বলা হচ্ছে, ইয়াহিয়ার জন্ম হলো, এক পর্যায়ে .... পরহেযগার ব্যক্তি। (আয়াত ১২-১৩)

অর্থাৎ তাকে শৈশবেই জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে। এটা নিসন্দেহে একটা বিরল ঘটনা ঠিক ইয়াহইয়া (আ.)-এর নামের মতোই। কারণ, সাধারণ নিয়ম অনুসারে মানুষের মাঝে জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে তখনই যখন তার বয়স বৃদ্ধি পায় এবং তার মাঝে পরিপক্কতা আসে। কিন্তু ইয়াহইয়া (আ.)-এর বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাই শৈশবেই তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করা হয়েছে।

তাকে আর একটি গুণ দান করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে দয়া মায়ার গুণ। এই গুণ তাকে জন্মগতভাবেই দান করা হয়েছিলো। এটার জন্যে তাকে পৃথক কোনো চেষ্টা সাধনা করতে হয়নি। এই দয়া মায়ার গুণ নবীদের জন্যে খুবই জরুরী। কারণ তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সত্যের পথে ডাকা, কল্যাণের পথে ডাকা এবং নরম ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় মনকে আকৃষ্ট করা, তাদের অন্তরকে জয় করা।

তাকে আরো একটি গুণ দান করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে মনের পবিত্রতা, চরিত্রের নির্মলতা। উদ্দেশ্য হলো এগুলোর সাহায্যে যেন তিনি অন্যদের হৃদয়ের ও চরিত্রের কলুষ ও আবিলতা দূর করতে পারেন।

আল্লাহ ভীতি বা তাকওয়া পরহেযগারীর গুণও তাঁকে দান করা হয়েছে। এই তাকওয়া পরহেযগারীর ফলে তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারবেন। সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর দৃষ্টির সামনে দেখতে পাবেন। কাজেই প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্ব অবস্থায় তিনি আল্লাহকে ভয় করে চলবেন।

আল্লাহ তায়ালা ইয়াহইয়া (আ.)-কে শৈশবে এই পাথেয় দান করেই তাকে নিজ পিতার যোগ্য উত্তরসূরী রূপে গড়ে তুলেছেন। কারণ, তার বৃদ্ধ পিতা নিজ প্রভু ও মালিকের কাছে অত্যন্ত কাতর স্বরে এই দোয়াই জানিয়েছিলেন। দয়ালু প্রভু সেই দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে একজন সৎ পুত্র সন্তান দান করেছেন।

ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রসংগটি এখানেই শেষ হচ্ছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে, আদর্শ সম্পর্কে এবং কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে একটা মোটা রেখা এখানে টানা হয়েছে। ফলে একজন নবীর গুণাবলী, দায় দায়িত্ব ও চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করতে পারি। সাথে সাথে একথাও আমাদের জানতে হবে যে, যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দোয়া

কবুল হওয়া ইত্যাদি বিষয় থেকেও উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা এই উপদেশ ও মূল বক্তব্যের মাঝে নতুন কিছু জুড়ে দেখার প্রয়োজন নেই। উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট।

ঈসা (আ.)—এর জন্মবৃত্তান্ত

এখন অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা আসছে যা ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনার চেয়েও অনেক বেশী চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। ঘটনাটি হচ্ছে ঈসা (আ.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কিত। এখানে ঘটনা দুটোর বর্ণনায় একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে একজন বন্ধ্যা নারী ও একজন অশীতিপর বৃদ্ধের সন্তান লাভের ঘটনা। এটা একটা অসাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনা। এরপর বর্ণনা করা হয়েছে এমন আর একটি ঘটনা যা পূর্বের ঘটনার চেয়েও অধিক বিস্ময়কর এবং তা হচ্ছে কোনো পুরুষের সংস্পর্শে না এসেই একজন কুমারী নারীর সন্তান প্রসব করা।

এটা নিসন্দেহে একটা নযির বিহীন ঘটনা। গোটা মানব ইতিহাসে এ জাতীয় কোনো ঘটনার অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমরা নিজেরাও মানব সৃষ্টির মূল ঘটনার সাথে অপরিচিত। আমরা একটা ধরা বাঁধা নিয়মের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

খোদ মানব সৃষ্টির ঘটনাটা তো গোটা ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ঘটনার সাথে আমরা কতোটুকু পরিচিত? আদি মানবের সৃষ্টি হয়েছিলো পিতা ও মাতাবিহীন অবস্থায়। এই ঘটনার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে। কিন্তু অনুরূপ দ্বিতীয় কোনো ঘটনা পৃথিবীর বুকে আর ঘটেনি। তাই আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন এই পিতাবিহীন একটি মানব সৃষ্টির মাধ্যমে। স্বাভাবিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়মে ঈসা (আ.)-এর জন্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান, যেন গোটা মানব জাতি তাঁর কুদরতের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং আদি মানবের সৃষ্টির বিষয়টি যদি বোধগম্য না হয় তাহলে এই দ্বিতীয় বিস্ময়কর বিষয়টির প্রতিই যেন তারা দৃষ্টিপাত করে।

বংশবৃদ্ধি ও সন্তান উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়ম যা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তা হলো, নর ও নারীর মিলন। এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিটি জীব-জন্তু ও প্রজাতির ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন কি যে সব জীব ও প্রাণীর মাঝে স্ত্রী ও পুরুষ জাতি হিসেবে ভিন্ন কোনো জাতের অস্তিত্ব নেই, সে সবের মাঝেও আল্লাহ তায়ালা স্ত্রী-কোষ ও পুরুষ কোষ নামে দুটো ভিন্ন ভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে রেখেছেন। যুগ যুগ ধরে এই একই নিয়ম ও পদ্ধতি চলে আসার কারণে মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এটাই বুঝি একমাত্র নিয়ম। এর বাইরে আর কোনো নিয়ম নেই। অথচ তাদের সম্মুখে আদি মানবের সৃষ্টির ইতিহাস রয়েছে। সেই সৃষ্টিও ছিলো সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু, মানুষ সেই ইতিহাস ভুলে গেছে, তাই, আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁর কুদরত কোনো নিয়ম নীতির অধীন নয়, কোনো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের বেড়াজালেও আবদ্ধ নয়। বরং এই কুদরত, এই ইচ্ছা হচ্ছে স্বাধীন ও মুক্ত। তবে ঈসা (আ.)-এর জন্মের অনুরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটবে না। বরং জন্ম ও বংশ বৃদ্ধির সাধারণ নিয়মই বলবৎ থাকবে। কারণ, এই নিয়ম তাঁরই পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই সেটাই বলবৎ থাকবে। ঈসা (আ.)-এর ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে তাঁর স্বাধীন ও মুক্ত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে। এটা আল্লাহর কুদরতের একটা জ্বলন্ত নমুনা হিসেবে থেকে যাবে। 'যেন আমি তাকে মানবজাতির জন্যে একটা নিদর্শন বানাতে পারি।'

এই বিস্ময়কর ঘটনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করা এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাই তারা ঈসা (আ.)-এর প্রতি দেবত্ব আরোপ করে তার সম্পর্কে নানা ধরনের আজগুবী

ও কাল্পনিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। অথচ এসব কাহিনী দ্বারা ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর অপার কুদরতকে প্রমাণ করা, যে কুদরত কোনো বাঁধা ধরা নিয়মের অধীন নয়। এটা তাওহীদেরই একটা অংগ। অথচ সে সব আজগুবী ও কাল্পনিক ঘটনাবলীর দ্বারা এই তাওহীদের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে এই বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব উদ্ভট ও অতিপ্রাকৃতিক কেসসা-কাহিনীর জন্ম দেয়া হয়েছে সেগুলোকেও বাতিল ও ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘটনার নিরেট বর্ণনাকে অতিক্রম করে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যা মানবীয় আবেগ অনুভূতি দ্বারা পরিপূর্ণ, যা পাঠকের হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দেয় যেন সে স্বচক্ষে দৃশ্যগুলো অবলোকন করছে। এই কেতাবে মারইয়ামের কথাও .... এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (আয়াত ১৬-২১)

ঘটনার প্রথম দৃশ্যে আমরা এমন একজন যুবতীর সাক্ষাত পাই যে কুমারী ও ধর্মযাজিকা। সে যখন মাতৃগর্ভে ছিলো তখনই তার মা এবাদাত খানার সেবার জন্যে তাকে উৎসর্গ করেন। তার সম্পর্ক ছিলো বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় নেতা হারুন (আ.)-এর বংশের সাথে। কাজেই সে ছিলো সতীত্ব ও চারিত্রিক নির্মলতার মূর্তপ্রতীক। তার মাঝে এই সৎ গুণ ছাড়া অন্য কোনো অসৎ গুণের অস্তিত্বই ছিলো না।

এই সৎ ও পূত পবিত্র যুবতী একদিন নিতান্ত ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারের অন্যান্য লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নির্জন স্থানে চলে যায়। প্রয়োজনটা কি ছিলো, তার কোনো বিবরণ কোরআনে দেয়া হয়নি। খুব সম্ভবত মেয়েলী কোনো প্রয়োজন হতে পারে।

যা হোক এই নির্জন স্থানে পৌঁছে সে নিশ্চিত মনে ভাবতে লাগলো যে, সে এখন সম্পূর্ণ রূপে একা। কিন্তু হঠাৎ করে এই নির্জন স্থানে তার সামনে একজন বলিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ফলে সে একজন কুমারী যুবতীর মতোই ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যায়। সে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে, সাহায্য কামনা করে এবং লোকটির মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার জন্যে চেষ্টা করে। এই নির্জন স্থানে তাকে আল্লাহ তায়ালা দেখছেন সে কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে তাকে বলে, সে বললো .... কাছে পানাহ চাই। 'আয়াত ১৮)

আল্লাহভীরু লোকদের মন আল্লাহর কথা শুনলেই কেঁপে উঠে এবং কামভাব ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়।

এই পূণ্যাত্মা, সচ্চরিত্রা ও কুমারী যুবতীর কথা চিন্তা করলেই মনের মাঝে একটা কম্পনের সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি কোনো সাধারণ যুবতী ছিলেন না। বরং তিনি এমন এক অসাধাণ যুবতী ছিলেন যাকে তার মা ভ্রূণ অবস্থায়ই আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেছিলেন এবং জন্মের পর তার লালন-পালন হয়েছে একজন নবীর হাতে, এক পবিত্র পরিবেশে।

যুবতীর কথার উত্তরে লোকটি বলে, সে বললো আমি .... দিয়ে যেতে পারি। (আয়াত ১৯)

এই উত্তর শুনে যুবতীর মাঝে কি পরিমাণ ভয়-ভীতি ও লজ্জার সৃষ্টি হতে পারে তা চিন্তা করলে আর একবার হৃদয় প্রকম্পিত হয়। কারণ এই নীরব ও নির্জন স্থানে একজন সুপুরুষ একজন যুবতীকে বলছে, 'আমি তোমাকে সন্তান দান করতে চাই।' আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি বলে সে যে দাবী করছে সেটা হয়তো প্রতারণার উদ্দেশ্যে করছে। এর মাধ্যমে সে একজন সরলা ও অবলা যুবতীকে প্রতারণার ফাঁদে আটকাতে চায়।

লোকটির প্রস্তাব শুনে এবং নিজের ইযযত আবরু হুমকির সম্মুখীন দেখে যুবতীর মাঝে সাহস জন্ম নেয়। ফলে সে স্পষ্ট ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করে। সে বললো ....না আমি কখনো ব্যাভিচারিণী ছিলাম! (আয়াত ২০)

এভাবেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও খোলামেলা ভাষায় সে লোকটির দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। পরিস্থিতিই তাকে এমনটি করতে বাধ্য করেছে। এখন লজ্জা-শরমের স্থান নেই। এখানে ইযযত আবরু রক্ষার প্রশ্ন। কাজেই তাকে জানতে হবে, লোকটি কিভাবে তাকে সন্তান দান করবে। সে নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে দাবী করেছে বলেই ক্ষান্ত দিতে হবে, শান্ত থাকতে হবে, তা হতে পারে না। কারণ, তাকে তো ইতিপূর্বে কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি। এমন কি সে তো কোনো পতিতা ও নয় যে, সন্তান জন্ম নেয়ার মতো কাজ করতে সম্মত হবে।

তার এই প্রশ্ন দেখে মনে হয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে কল্পনাই করতে পারেনি যে, নর-নারীর মিলনের সাধারণ নিয়মের বাইরেও সন্তান জন্ম দেয়ার অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে। মানব স্বভাবের ধর্ম এটাই অর্থাৎ সে সাধারণ নিয়ম নীতি দ্বারা অভ্যস্ত।

সে বললো (হাঁ,) এ রূপই .... এক স্থিরীকৃত ব্যাপার, যা অবশ্যই পুরো হতে হবে। (আয়াত ২১)

এই অসাধারণ ঘটনা সেটা ঘটতে পারে বলে কল্পনা করাও মারইয়ামের পক্ষে অসম্ভব, তা আল্লাহর বেলায় খুবই সহজ ও সাধারণ। যে মহা শক্তিধর আল্লাহ 'হও' নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই সব কিছু হয়ে যায়, তার বেলায় এ কাজটি সহজ হবে না কেন? তাঁর ইচ্ছা তো কোনো নিয়ম-নীতির অধীন নয়। সাধারণ নিয়ম নীতি অনুযায়ী হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি যখন যা চাইবেন তাই হবে। এ কথাই জিবরাঈল (আ.) মারইয়ামকে জানিয়ে দিচ্ছেন। সাথে সাথে তাঁকে আশস্ত করছেন এই বলে যে, এই বিস্ময়কর ঘটনাটিকে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবজাতির জন্যে একটা নিদর্শন হিসেবে এবং বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যে রহমত হিসেবে রেখে দিতে যান। এর মাধ্যমে তারা যেন আল্লাহর অপার কুদরতের পরিচয় লাভ করতে পারে এবং তাঁর এবাদাত বন্দেগী ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

জিবরাঈল এবং মারিয়াম (আ.)-এর মধ্যকার কথাবার্তা এখানেই শেষ। এই কথাবার্তার পরে কি ঘটেছিলো, সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনায় একটা কৌশলগত ছেদ এখানে লক্ষ্য করা যায়। এটাই হচ্ছে কোরআনের এক প্রকার বর্ণনাভংগি, তবে উভয়ের মধ্যকার কথাবার্তায় জানা যায় যে, কুমারী হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো পুরুষের সংস্পর্শে না এসেও মারইয়ামের একটি সন্তান হবে। এই সন্তান গোটা মানব জাতির জন্যে খোদায়ী কুদরত ও রহমতের জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীর বুকে আগমন করবে। এ রকম একটি ঘটনা যে ঘটবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই চূড়ান্ত ও নির্ধারিত হয়েছিলো। কিন্তু কি ভাবে তা ঘটবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।(১)

(১) সূরায়ে 'আত্ তাহরীম' এর ১২ নং আয়াতেও 'রুহ' শব্দটি এসেছে এবং আলোচ্য সূরাতেও একই ভাবে 'রুহ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটো আয়াতে 'রুহ' বলতে কি একই অর্থ বুঝানো হয়েছে, না ভিন্ন কোনো অর্থ বুঝানো হয়েছে? আমাদের কাছে শব্দটি দু'জায়গায় দুটো অর্থ প্রকাশ করছে। আলোচ্য সূরায় 'রুহ' বলতে জিবরাঈল (আ.) কে এবং সূরায়ে তাহরিমে 'রুহ' বলতে আত্মা বা প্রাণ বুঝানো হয়েছে। এই আত্মা আদম (আ.)-এর মাঝে স্থাপন বা ফুৎকার করা হয়েছিলো এবং মাইরয়াম (আ.)-এর মাঝে স্থাপন বা ফুৎকার করা হয়েছিল এবং মরিয়ম (আ.)-এর মাঝেও। আত্মা স্থাপনের পর আদম (আ.) জীবন্ত হন, আর মারইয়াম (আ.)-এর দেহে এই আত্মা ফুৎকারের পর তাঁর ডিম্বকোষ জীবন্ত হয়ে তা সন্তান উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে উঠে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রুহ' ফুৎকারের মানুষের মাঝে জীবনের সৃষ্টি হয় এবং এই জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীও সৃষ্টি হয়। সূরায়ে মারইয়ামে বর্ণিত 'রুহ' জিবরাঈল (আ.) 'রুহ' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মার গুণাবলী নিয়ে এসেছিলেন মারইয়ামের জন্য। প্রকৃত রূহ বলতে কী বুঝায় তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু উভয় স্থানে 'রুহ' বলতে যে কারও প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সেটা অবশ্যই জানা আছে।সম্পাদক

এরপর ঘটনার অপর একটি নতুন চিত্র আমাদের সামনে চলে আসছে। এই চিত্রে আমরা একজন ভীত-সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা কুমারী যুবতীকে দেখতে পাই। সে তার প্রচন্ড অসহায়ত্বের কথা এভাবে তুলে ধরছে।

অতপর সে গর্ভে সন্তান......... বিস্মৃত হয়ে যেতাম! (আয়াত ২২-২৩)

তৃতীয় বার অবাক হওয়ার পালা। কারণ, পুর্বাপর কোনো আয়াতে বলা হয়নি সে কি ভাবে অন্তসত্বা হলো এবং কতোদিন ধরে সে অন্তসত্বা থাকলো। সে কি অন্যান্য নারীদের মতো সাধারণ নিয়মেই অন্তসত্বা হয়েছিলো? অর্থাৎ 'আত্মা ফুৎকার' এর মাধ্যমে তার ডিম্বকোষকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তোলা হয়েছে। ফলে সেটি পর্যায়ক্রমে মাংসপিন্ড, তারপর অস্থি, তারপর অস্থির উপর মাংসের আবরণ সৃষ্টি হয়ে একটি পরিপূর্ণ ভ্রূণে পরিণত হয়ে নির্ধারিত সময় কি অতিবাহিত করেছে? এ হলে হতেও পারে। কারণ গর্ভাশয়ে শুক্রাণু প্রবিষ্ট হওয়ার পরই ডিম্বকোষ জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর তা পূর্ণতা লাভ করতে চান্দ্র মাসের হিসেবে নয় মাস সময় লাগে। এখানে শুক্র বিন্দু সংস্থাপন এর পরিবর্তে 'আত্মা' ফুৎকার করা হয়েছে। এর ফলেই ডীম্বকোষ সক্রিয় হয়ে গর্ভ সঞ্চার ঘটিয়েছে এবং তা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই করা হয়েছে। অথবা তা সাধারণ নিয়মের বাইরেই ঘটেছে। অর্থাৎ ডিম্বকোষ অত্যন্ত দ্রুত ও অস্বাভাবিক ভাবে তার নির্ধারিত পর্যায়গুলো অতিক্রম করে ভ্রণে রূপান্তরিত হয়েছে। যা হোক, কোরআনের বক্তব্যে এ দুটোর কোনো একটিরও উল্লেখ নেই। কাজেই গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত কোনো প্রমাণ ব্যতীত এ প্রসংগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করাই আমি সীমচীন করি। তাই মারইয়ামের পরবর্তী অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিলো আমরা আবার সে প্রসংগে ফিরে যাচ্ছি।

পূর্বের আলোচনায় আমরা মারইয়ামের মাঝে সতিত্ব, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতার গুণ দেখেছি। এখন দেখছি সে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সমাজের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। একদিকে শারীরিক বেদনা, অপরদিকে মানসিক যাতনা। এর চেয়েও মারাত্মক ও কষ্টদায়ক হচ্ছে প্রসব বেদনা। এই প্রসব বেদনাই তকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে এসেছে এবং সেখানে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসতে বাধ্য করেছে। এখানে সে সম্পূর্ণ একা ও নিসংগ। প্রসব কোনো অভিজ্ঞতা তার নেই। কারণ, সে তো একজন কুমারী ও সতী যুবতী। এই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে সে কী করবে এবং কার সাহায্য নেবে কিছুই যেন স্থির করতে পারছিলো না। একান্ত অসহায় ও নিরুপায় হয়ে বলতে বাধ্য হয়,

'হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুছে যেতাম'-

এ কথা যখন সে বলছে তখন তার মনের অবস্থা কি ছিলো, তিনি কতোটুকু মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন তা আমরা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারি। তার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো বলেই সে 'ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো' (নাসিয়্যা) হতে চেয়েছিলো। কারণ এ জাতীয় কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করার পর তা ছুড়ে ফেলা হয় এবং ভুলে যাওয়া হয়।

এই প্রচন্ড প্রসব যন্ত্রণা ও মানসিক যাতনার কঠিন মুহূর্তে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যায়। গায়েবী কণ্ঠ ডাক দিয়ে বলছে।

তখন একজন (ফেরেশতা কিংবা শিশু ঈসা) তাকে তার .... সাথেই কথাবার্তা বলবো না। (আয়াত ২৪-২৬)

আল্লাহ তায়ালার কী কুদরত! সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরক্ষণেই নিচে থেকে তাকে ডাকছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে, আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলছে। সাথে সাথে তার খাবারের কথাও বলে দিচ্ছে, পানির কথাও বলে দিচ্ছে।

তুমি চিন্তা করো না। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ভুলে যাননি, তোমাকে ত্যাগ করে যাননি। চেয়ে দেখো, তোমার পায়ের নিচে পানির ধারা ছুটে চলেছে। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী এই পানির ধারা হয়তো তাৎক্ষণিক ভাবে কোনো ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো, অথবা পাহাড়ী ঢল থেকে নেমে এসেছিলো।

এই যে খেজুরের গাছ যেটার গোড়ায় তুমি হেলান দিয়ে বসে আছো সেটাকে ঝাঁকুনি দাও। তাতে করে ওপর থেকে পাকা ও তরতাজা খেজুর পড়বে। এই হচ্ছে তোমার খাবার ও পানীয়। মিষ্টি খাবার প্রসূতিদের জন্যে উপযোগী। এই হিসেবে মিষ্টি ও তরতাজা খেজুর প্রসূতীদের জন্যে একটা উত্তম খাবার। তাই প্রাণ ভরে এই খাবার খাও এবং তৃপ্তি সহকারে এই পানি পান করো। কোনোরূপ চিন্তা করো না। মনটাকে শান্ত রাখো। যদি কারো সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে কথা না বলে ইংগিতে জানিয়ে দিয়ো যে, তমি একাগ্রচিত্তে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগীর উদ্দেশ্যে কারো সাথে কথা না বলার প্রতিজ্ঞা করেছো। কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার তোমার প্রয়োজন নাই।

আমাদের ধারণা, এসব কথা শুনে মারইয়াম হয়তো দীর্ঘক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। খেজুর গাছে ঝাকুনী দিতেও ভুলে গিয়েছিলেন। বিস্ময় ঘোর কেটে যাওয়ার পর তার মনে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, না, আল্লাহ তায়ালা তাকে ছেড়ে যাননি এবং এই শিশুও কোনো সাধারণ শিশু নয়। বরং অসাধারণ ও অলৌকিক এক শিশু। তার মাধ্যমে অজানা ও অসাধারণ অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে।

এরপর তিনি শিশুটিকে কোলে করে নিজের গোত্রের লোকদের কাছে চলে আসলেন। তখন কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো তা চিন্তা করলেও মন কেঁপে উঠে। গোত্রের লোকেরা হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো, তাদেরই বংশের মেয়ে অজানা ও অপরিচিতি এক শিশুকে নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই মেয়েটিতো সতী, সাধবী, সচ্চরিত্র ও পূত-পবিত্র একজন কুমারী মেয়ে ছিলো। তার কোলে আবার সন্তান আসলো কোথা থেকে? তাই তারা বলে উঠলো।

অতপর সে তাকে নিজের .... ছিলো না! (আয়াত ২৭ ও ২৮)

মারইয়ামকে লক্ষ্য করে যখন তারা উপরের কথাগুলো বলছিলো তখন বোধ হয় দাঁত কটমট করে এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলছিলো। এরপর অত্যন্ত রাগের সুরে তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'হারুনের বোন।' অর্থাৎ একজন নবীর বোন হয়ে এবং তারই রেখে যাওয়া এবাদাত খানায় লালিত পালিত হয়ে, সেই এবাদাত খানার সেবায় নিয়োজিত থেকেও তোমার দ্বারা এই জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ করা কিভাবে সম্ভব হলো? তোমার মা বাপ তো কোনো খারাপ লোক ছিলো না, তাহলে তুমি এমন খারাপ কাজ কিভাবে করতে গেলে?

এখন মারিয়াম তার শিশুর উপদেশ পালন করে সে শিশুর দিকেই ইংগিত করলো। এই ইংগিত দেখে সমাজের লোকজনের মাঝে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো তা ব্যক্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। কারণ, একদিকে তো মেয়েটি অজানা ও অপরিচিত একটি শিশুকে কোলে নিয়ে হাযির হয়েছে। অপরদিকে আবার তাচ্ছিল্যভরে ও মশকারা করে সে শিশুকেই প্রশ্ন করে আসল ঘটনা জানতে বলছে। তাই তারা বলতে বাধ্য হয়,

'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো?'

কিন্তু তাদের জন্যে আর একটি বিস্ময়কর অলৌকিক কান্ড-কারখানা তখন অপেক্ষা করছে।

সেই কোলের শিশুটিই এবার বলে উঠলো, আমার ওপর ছিলো .... অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো। (আয়াত ৩৩)

ঈসা (আ.) এভাবেই আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য ও দাসত্বের কথা ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দিলেন। এর অর্থ, তিনি আল্লাহর পুত্রও নন এবং স্বয়ং কোনো দেবতাও নন, যেমনটি কোনো কোনো দল ও গোষ্ঠী মনে করে থাকে। বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী। তাঁর শরীকও নন এবং সন্তানও নন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং আজীবন নামায ও

যাকাত আদায়ে যত্নশীল হতে বলেছেন। সাথে নিজের মা ও বংশের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন, তাদের প্রতি বিনয়ী আচরণ করতে বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ঈসা (আ.) সীমিত জীবনের অধিকারী। তার মৃত্যু ও আছে এবং পুনরুজ্জীবনও আছে। তার জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিনে তাঁকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ করুণা, দয়া শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন ও করবেন।

ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য আসার পর কোনো রূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তর্ক বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

ঈসা (আ.) মায়ের কোলে কথা বলার পর ব্যাপারটিকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কিভাবে গ্রহণ করেছিলো, এই ঘটনার পর মারইয়াম ও তার এই অসাধারণ পুত্রের ভাগ্যে ঘটেছিলো এবং কখন তিনি নবুওত প্রাপ্ত হয়েছিলেন এসব ব্যাপারে কোরআনে আর কিছুই বলা হয়নি। কারণ এখানে প্রধান বিষয়বস্তু ছিলো ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। কাজেই সেই অভাবনীয় ও অলৌকিক ঘটনার বিবরণ এসে যাওয়ায় পর অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা না করে আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্যে এভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এই হচ্ছে মারিয়াম পুত্র ঈসা .... সরল পথ। (আয়াত ৩৪-৩৬)

অর্থাৎ ঈসা হচ্ছে মারইয়ামের পুত্র। সে কোনো দেবতাও নয় এবং কুমারী মায়ের পাপাচারের ফলও নয়। তার গোটা জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো। এই জন্ম বৃত্তান্তই সঠিক। সে ব্যাপারে যারা সন্দেহ করছে তারা ভুলের মাঝে রয়েছে। তিনি আল্লাহর পুত্র নন। কারণ আল্লাহ তায়ালা কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, আর এমনটি করা তাঁর জন্যে শোভাও পায় না। সন্তান তো তারা গ্রহণ করে যারা নশ্বর। তারা সন্তান গ্রহণ নিজের বংশ পরিচিতি টিকিয়ে রাখার জন্যে অথবা প্রয়োজনের সময় সাহায্য লাভের জন্যে। আল্লাহ তায়ালা তো অবিনশ্বর, তাঁর কোনো লয় নেই। তিনি নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও শক্তিধর। তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বরং গোটা সৃষ্টি জগত তাঁর নির্দেশেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তিনি কোনো কিছু করতে চাইলে, কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে কেবল বলেন, 'হও'। আর তখনই তা হয়ে যায়। এখানে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কোনো সন্তানের সহায়তারও প্রয়োজন হয় না। এরপর ঈসা (আ.)-এর বক্তব্য আসছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মানব জাতিকে একমাত্র ও লা শরীক আল্লাহর এবাদাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন,

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার .... সরল পথ। (আয়াত ৩৬)

এই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের পর আর কোনো কুসংস্কার ও পৌরানিক কেসসা কাহিনীর অবকাশ থাকে না।

ঘটনার শেষে যে বিবৃতিমূলক মন্তব্য এসেছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যটিকেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

এই চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট মন্তব্যের পর ঈসা (আ.)-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে সব মতপার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিষয়টিকে নিয়ে কোনো রূপ মতপার্থক্য ও বিতর্কের সৃষ্টি হওয়া অবান্তর ও অনাকাংখিতই বটে। সেই অবাঞ্চিত মতবিরোধের প্রতি ইংগিত করেই বলা হচ্ছে,

পরিস্কার ঘোষণা থাকা .... আগমনকালের কঠিন এক দুর্ভোগ! (আয়াত ৩৭)

একবার রোমান সম্রাট কনষ্টানটিন পাদ্রীদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। এটা ছিলো তাদের তিনটি প্রসিদ্ধ সম্মেলনের অন্যতম। এই সম্মেলনে দুই হাজার একশত সত্তর জন পাদ্রী অংশগ্রহণ করেছিলো। এরা সকলেই ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে প্রচন্ড মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। প্রত্যেক দলই তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছিলো। কেউ বলছিলো, ঈসা (আ.) হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। এরপর যাকে ইচ্ছা তাকে জীবিত

রেখে এবং যাকে ইচ্ছা তাকে মৃত্যু দিয়ে তিনি পুনরায় উর্ধলোকে ফিরে গিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলছিলো, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পুত্র। অন্যদল বলছিলো, তিনি হচ্ছেন তিনের মাঝে এক। অর্থাৎ, উপাস্য আল্লাহ তায়ালা, উপাস্য তিনি ও উপাস্য তাঁর মাতা। অপরদিকে আর এক দল বলছিলো, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রসূল, তাঁর আত্মা ও তাঁর বাণী। এভাবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত ও বক্তব্য দিয়ে চলছিলো। কোনোক্রমেই তারা সর্বসম্মতিক্রমে কোনো ঐকমত্যে থাকতে পারছিলো না। তবে তাদের মধ্য থেকে তিন শত আট জনের বেশী পাদ্রী একটি রায়ের ব্যাপারে অভিন্নমত পোষণ করে। ফলে সম্রাট তাদের রায়কেই মেনে নেন এবং বাকী সবাইকে বিশেষ করে তাওহীদ পন্থীদেরকে সম্মেলন থেকে তাড়িয়ে দেন। এর ফলে সে তিনশত আট জন পাদ্রীরই বিজয় সূচিত হয়।

সম্মেলন করে ভ্রান্ত মত ও আকীদা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হলেও তা আল্লাহর কাছে ভ্রান্ত বলেই বিবেচিত হবে। কাজেই আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে যারা এ জাতীয় ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসকে মেনে নেবে পরকালে তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে বলে পরবর্তী আয়াতে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে,

পরিস্কার ঘোষণা থাকা ....ওপর আমলও করছে না। (আয়াত ৩৭, ৩৮, ৩৯)

কি ভয়ংকর ও মারাত্মক হবে পরকালের সেই দৃশ্য। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে মানুষ ও জীবন উভয় জাতি। যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে ওরা কুফুরী করেছে সেই আল্লাহর সামনে এই ভয়ংকর দৃশ্য অবলোকন করবে স্বয়ং ফেরেশতারাও।

দুনিয়ার বুকে এরা দেখেও দেখতো না, শুনেও শুনতো না। সত্য পথের সন্ধান পেয়েও তারা সে পথে চলতো না। আর এখন, এই চরম মুহূর্তে, এই কঠিন দিনটিতে যেন তাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি যেন প্রখর হয়ে উঠেছে। এখন তারা ভালো করে দেখতেও পাচ্ছে এবং সুস্পষ্ট ভাবে শুনতেও পাচ্ছে। তাদের এই নতুন পরিবর্তনকে উপহাস করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

যেদিন এরা আমার সামনে এসে ....নিমজ্জিত হয়ে আছে। (আয়াত ৩৮)

কি অদ্ভুত তাদের অবস্থা! যখন দেখা ও শুনা হেদায়াত ও মুক্তির উপায় ছিলো তখন তারা শুনতো না ও দেখতো না। আর যেদিন এই দেখা ও শুনা তাদের জন্যে লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেদিন তারা খুব ভালোভাবেই দেখছে ও শুনছে! তাই আজ এই মহান দিনটিতে তাদেরকে সেই সব জিনিসই শুনানো হচ্ছে ও দেখানো যা তারা ঘৃণা করে ও পরিহার করে চলে।

'পরিতাপের দিনটি সম্পর্কে তাদেরকে হুশিয়ার করে দিন।'

কারণ, এই দিনটিতে সবাই হায়-হুতাশ ও আক্ষেপ করতে থাকবে। পরিতাপ ও বিষাদের ছায়া এই দিনটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাই এই দিনটিকে 'পরিতাপের দিন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দিনটি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে বলা হয়েছে। কারণ, এই দিনে আক্ষেপ করে, হা-হুতাশ করে কোনোই লাভ হবে না। কারণ, আয়াত ৩৯নং এর অনুবাদ এই দিনটির আগমন যেন ওদের অবিশ্বাস ও গাফলতিরই পরিণতি স্বরূপ ঘটবে।

এই সন্দেহাতীত দিনটি সম্পর্কে ওদেরকে হুশিয়ার করে দিন। চিরকাল কেউ পৃথিবীতে থাকবে না, বরং সবাইকে একদিন ওই মহান আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। মিরাসী সম্পত্তি ওয়ারিসদের কাছে যেমন ফিরে যায় সেভাবেই ফিরে যাবে সবাই। সে কথাই নিচের আয়াতে বলা হয়েছে,

চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী তো .... ফিরে আসতে হবে। (আয়াত ৪০)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۥ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ

يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يٰٓاَبَتِ

اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا

سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ

وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ

لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ

اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا

রুকু ৩

৪১. (হে নবী, এই) কেতাবে তুমি ইবরাহীম (-এর ঘটনা)-কে স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো এক সত্যবাদী নবী। ৪২. (বিশেষ করে সে সময়ের কথা–) যখন সে তার পিতাকে বললো, হে আমার পিতা, তুমি কেন এমন একটা জিনিসের পূজা করো, যা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, যা তোমার কোনো কাজেও আসে না। ৪৩. হে আমার পিতা, আমার কাছে (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে) যে জ্ঞান এসেছে তা তোমার কাছে আসেনি, অতএব তুমি আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে সোজা পথ দেখাবো। ৪৪. হে আমার পিতা (সে জ্ঞানের মৌলিক কথা হচ্ছে), তুমি শয়তানের গোলামী করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার না-ফরমান। ৪৫. হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, (না-ফরমান শয়তানের গোলামী করলে) পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার কোনো আযাব এসে তোমাকে স্পর্শ করবে, আর (এর ফলে জাহান্নামে) তুমি শয়তানেরই সাথী হয়ে যাবে। ৪৬. সে বললো, হে ইবরাহীম, তুমি কি (আসলেই) আমার দেব দেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো, (তবে শোনো, এখনো) যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো, (আর যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে) তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও। ৪৭. সে বললো (আচ্ছা), তোমার প্রতি আমার সালাম, (আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি; কিন্তু এ সত্ত্বেও) আমি আমার মালিকের কাছে তোমার জন্যে মাগফেরাত কামনা করতে থাকবো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান। ৪৮. আমি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো তাদের সবার কাছ থেকেও (আলাদা হয়ে যাচ্ছি), আমি তো আমার

رَبِّىْ ز عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لا وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ ع وَاذْكُرْ فِى
الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ
الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾
وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ ع
وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِى
الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ قف لا وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

মালিককেই ডাকতে থাকবো, আশা (করি) আমার মালিককে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হবো না। ৪৯. অতপর যখন সে সত্যিই তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং (পৃথক হয়ে গেলো তাদের থেকেও) যাদের ওরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতো, তখন আমি তাকে ইসহাক ও (ইসহাক পুত্র) ইয়াকুব দান করলাম; এদের সবাইকেই আমি নবী বানিয়েছি। ৫০. আমি তাদের ওপর আমার (আরও বহু) অনুগ্রহ দান করেছি এবং তাদের আমি সুউচ্চ নাম যষ দান করেছি।

রুকু ৪

৫১. (হে নবী,) তুমি (এ) কেতাবে মূসার (ঘটনা) স্মরণ করো, অবশ্যই সে ছিলো একনিষ্ঠ (বান্দা), সে ছিলো রসূল-নবী। ৫২. (আমার কথা শোনার জন্যে) আমি তাকে 'তূর' (পাহাড়ের) ডান দিক থেকে ডাক দিলাম এবং তাকে আমি গোপন তথ্য (-সমৃদ্ধ কথা) বলার জন্যে আমার নিকটবর্তী করলাম। ৫৩. আমি আমার নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে (তার সাহায্যকারী হিসেবে) দান করলাম। ৫৪. (হে নবী,) এ কেতাবে তুমি ইসমাঈলের (কথাও) স্মরণ করো, নিশ্চয়ই সে ছিলো যথার্থ প্রতিশ্রুতি পালনকারী, আর সে ছিলো রসূল (ও) নবী, ৫৫. সে তার পরিবার পরিজনদের নামায (প্রতিষ্ঠা করা) ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিতো, (উপরন্তু) সে ছিলো তার মালিকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি। ৫৬. (হে নবী,) তুমি এ কেতাবে ইদরীসের (কথাও) স্মরণ করো, সেও ছিলো একজন সত্যবাদী নবী। ৫৭. আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছিলাম। ৫৮. এরা হচ্ছে সে সব (নবী), যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন, (এরা সবাই ছিলো) আদমের বংশোদ্ভূত, যাদের তিনি (মহাপ্লাবনের সময়) নূহের সাথে নৌকায়

نُوْحٍ ز وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا
تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ
شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّهٗ كَانَ
وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ط وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً
وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا
نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

আরোহণ করিয়েছেন এরা তাদেরই বংশের লোক, (এদের কিছু লোক) ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, (উপরন্তু) যাদের তিনি হেদায়াতের আলো দান করেছিলেন এবং যাদের তিনি মনোনীত করেছিলেন (এরা হচ্ছে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত); (এদের অবস্থা ছিলো এই,) যখনি এদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হতো তখন এরা আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করার জন্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় যমীনে লুটিয়ে পড়তো। ৫৯. তাদের পর (তাদের অপদার্থ) বংশধররা এলো, তারা নামায বরবাদ করে দিলো এবং (নানা) পাশবিক লালসার অনুসরণ করলো, অতএব অচিরেই তারা (তাদের এ) গোমরাহীর (পরিণাম ফলের) সাক্ষাত পাবে, ৬০. কিন্তু যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (তাদের কথা আলাদা), তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে, (সেদিন) তাদের ওপর কোনোরকম যুলুম করা হবে না। ৬১. স্থায়ী জান্নাত এমন এক বস্তু যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের কাছে অদৃশ্য করে রেখে দিয়েছেন; অবশ্যই তাঁর ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকবে। ৬২. সেখানে তারা কোনো অর্থহীন কথা শুনতে পাবে না, (চারদিকে থাকবে) শুধু শান্তি (আর শান্তি); সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্যে (নিত্য নতুন) রেযেকের ব্যবস্থা থাকবে। ৬৩. এ হচ্ছে জান্নাত, আমার বান্দাদের মাঝে যারা পরহেযগার আমি শুধু তাদেরই এর অধিকারী বানাবো। ৬৪. (ফেরেশতারা বললো, হে নবী,) আমরা কখনো তোমার মালিকের আদেশ ছাড়া (যমীনে) অবতরণ করি না, আমাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এর মধ্যবর্তী স্থানে, তা সবই তো তাঁর জন্যে, (মূলত) তোমার মালিক (কখনো কাউকে) ভুলে থাকেন না,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক এবং (তিনি মালিক) এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে (তারও), অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই গোলামী করো, তাঁর গোলামীর ওপরই কায়েম থাকো, তুমি তাঁর সম (-গুণসম্পন্ন এমন) কোনো নাম কি জানো (যে, তুমি তার গোলামী করবে!)

তাফসীর

আয়াত ৪১-৬৫

'আর স্মরণ করো এই আল কেতাবের মধ্যে ইবরাহীমের কথা। অবশ্যই সে ছিলো পরম সত্যবাদী নবী......... আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং তিনিই মালিক ওই সব বস্তুর যা এই দুয়ের মাঝে বর্তমান রয়েছে, অতএব পূর্ণাংগও নিঃশর্তভাবে আনুগত্য করো তাঁর এবং তাঁর এই পূর্ণাংগ আনুগত্য করার জন্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। সর্বময় ক্ষমতার মালিক সেই মহান সত্ত্বার মতো ক্ষমতাবান আর কারো নাম তোমার জানা আছে কি?' *(আয়াত ৪১-৬৫)*

ওপরের বর্ণনা মতে ঈসা (আ.) আল্লাহর ছেলে হওয়া সম্পর্কিত যে কাল্পনিক কথা প্রচার করে রাখা হয়েছে তার বিবরণ এই আয়াতগুলোতে শেষ হলো। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এসব অবাস্তব কথাকে খুব খুব জোরেশোরেই প্রচার করা হয়েছিলো; কিন্তু আল কোরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ওইসব বিভ্রান্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। মারইয়ামের পেটে ঈসা (আ.)-এর অস্বাভাবিকভাবে আগমনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো আহলে কেতাব (খৃষ্টান) ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তাদের বিভ্রান্তিকর এ দাবীর ভিত্তি নিছক অনুমান ও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, বরং এটার পেছনে রয়েছে তাদের শুধু এক অন্ধ বিশ্বাস। এর পরবর্তী আলোচনা আসছে ইবরাহীম (আ.)-কে কেন্দ্র করে যা ঈসায়ীদের মধ্যে বিরাজমান শেরকের আকীদা বিশ্বাসকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। ইবরাহীম (আ.) সেই মহান নবী যার বংশধর হওয়ার দাবী করে আরব জাতি নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করে, এসব মোশরেকরা দাবী করে বলে যে তারাই সেই কা'বা শরীফের রক্ষক যা ইবরাহীম ও ছেলে ইসমাঈল এক সাথে মিলে তৈরী করেছিলেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভদ্রতা ও সহনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর শান্ত ও বিনম্র স্বভাব যেমন প্রকাশ পেতো তাঁর চাল-চলনে তেমনি তাঁর প্রতিটি কথা ও ব্যবহারে এই মহান গুণাবলী ফুটে উঠতো। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ আল কোরআন তাঁর এই মহান প্রকৃতির বর্ণনা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছে। এটা অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার, তার স্বভাব প্রকৃতি ছিলো তার বদ-মেযাজী ও হঠকারী পিতার সম্পূর্ণ

বিপরীত। সত্য বিরোধিতায় ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার যে যুক্তিহীন ও হঠকারিতাপূর্ণ ভূমিকা ছিলো তার মোকাবেলা করতে গিয়ে ইবরাহীম (আ.) যে ধৈর্য-সহ্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সর্বকালের মানুষের জন্যে এক বিস্ময়কর ও অতীব বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, একই সাথে তার পিতা ও মোশরেক স্বগোত্রীয় লোক এবং প্রতিবেশীদের সাথে মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এমন এক মহান আদর্শ যার কারণে তিনি পরবর্তীকালের লোকদেরকে নিয়ে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এক মহিমান্বিত জাতি। এ জাতির মধ্যে জন্ম নিয়েছেন পর্যায়ক্রমে বহু নবী রসূল নেককার মানুষ ও সত্যসেবী নেতা। আবার এটাও সত্য, কালক্রমে তার মতাদর্শকে দূরে নিক্ষেপ করে আর একদল মানুষ কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়েছে; লোভ লালসা ও নেতৃত্বের বাসনা তাদেরকে এমনভাবে বিপথগামী করেছে যে তারা মানবতার সকল দাবীকে উপেক্ষা করে সত্য পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের রক্ষাকবচ যে সত্যপ্রিয়তা ও সরলতা তাকে বিসর্জন দিয়ে তারা শয়তানের দাসত্ব শুরু করেছে এবং এভাবে তাদের সবার পূর্ব পুরুষ মহান নবী ইবরাহীম (আ.)-এর স্থাপিত আদর্শকে বাদ দিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। এরা হচ্ছে মক্কাবাসী ও তৎসন্নিহিত মোশরেক গোত্রসমূহ।

ইবরাহীম (আ.)—এর ঘটনা

আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইবরাহীম (আ.)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে তিনি ছিলেন বড়ই সত্যবাদী নবী। 'সিদ্দীক' শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করে; পরম সত্যবাদী ও সত্যের পক্ষে দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্যদানকারী এবং এ উভয় অর্থেই ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে এ শব্দটি যথাযথভাবে প্রজোয্য। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করো এই আল কেতাবের মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-কে; অবশ্যই সে ছিলো একজন পরম সত্যবাদী ও সত্য প্রতিষ্ঠাতাকারী নবী......... হে আমার পিতা, মহা দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন আযাব আপনাকে পেয়ে বসবে বলে আমার ভয় হয়, যার কারণে শয়তানই আপনার দরদী বন্ধুতে পরিণত হবে।'

উপরোক্ত বাক্যসমূহে ইবরাহীম (আ.) তার পিতার জন্যে এমনই এক চিত্তাকর্ষক বাক্যমালা ব্যবহার করেছেন, যাতে দেখা যাচ্ছে, তিনি তার পিতাকে সেই মহা কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন যে দিকে বড় মেহেরবানী করে তার আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিচালনা করেছেন এবং তাকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন, এ শিক্ষাকে তিনি মহব্বতের সাথে গ্রহণ করছেন এবং এ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে পিতাকে সম্বোধন করতে গিয়ে বলছেন, 'হে আমার পিতা', তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেন আপনি এমন জিনিসের পূজা করেন যা শোনে না, দেখে না এবং যা আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না?' এবাদাত শব্দটির মধ্যে আসল যে অর্থ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে, সে তার থেকে শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান বুদ্ধি ও যোগ্যতা দক্ষতায় যখন কাউকে বড় মনে করে তখন তার মুখাপেক্ষী হয়ে যায় এবং তার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তাকে অতি মানুষ মনে করে, সাধারণ মানুষের মর্যাদা থেকে তাকে অনেক বেশী মর্যাদা দিতে থাকে এবং মনে করে, সে সাধারণ মানুষের তুলনায় বহু বহু গুণে উন্নত শ্রেণীর মানুষ, এমতাবস্থায়, যে মানুষ নয়, বরং মানুষ থেকে, শক্তি-সামর্থ ও মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক নিম্নমানের বরং মাটি পাথর নির্মিত যে সব মূর্তি তারা নিজেরা বানায়, যারা শোনেনা, দেখে না, কারো ক্ষতি বৃদ্ধিও করতে পারে না, তার সামনে সৃষ্টির সেরা এই মানুষ কিভাবে মাথা নত করতে পারে। বলা হচ্ছে যে আজকে কোরায়শ জাতি তো সেই একইভাবে মূর্তি পূজা করে চলেছে যেভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর বাপের আমল থেকে দেব-দেবীর পূজা প্রথা চলে আসছিলো।

এই হচ্ছে সেই প্রথম বিষয় যার দ্বারা ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করেছিলেন, এরপর সুস্পষ্টভাবে পিতাকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, এ কাজ তিনি নিজের ইচ্ছায় বা নিজের বুদ্ধিতে শুরু করেননি, বরং আল্লাহর নির্দেশেই তিনি এ কাজ শুরু করেছেন, এ জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাকে দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাকে পরিচালনা করছেন। যদিও পিতার থেকে তিনি বয়সে ছোট এবং অভিজ্ঞতাও কম, তবুও মহান আল্লাহর সাহায্যে তিনি, অন্য যে কোনো ব্যক্তি থেকে বেশী বুঝেন ও সত্যকে বেশী চেনেন। এজন্যেই পিতাকে উপদেশ দেয়ার দায়িত্ব তিনি পালন করছেন, কেননা তার কাছে তো সঠিক জ্ঞান নেই, পিতাকে সেই পথেই তিনি চলতে বলছেন যে পথে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে চালানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার পিতা অবশ্যই আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই সঠিক জ্ঞান এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। অতএব, আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথেই চালাবো।'

দেখুন, পিতাকে, সঠিক পথ প্রাপ্তির ব্যাপারে, পুত্রের অনুসরণ করার আহ্বানে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা নরম কথা নেই, কেননা পুত্র তো সর্বজ্ঞ ও সর্বোচ্চ্য ক্ষমতার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে জ্ঞান ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তিনি নিজে মূল উৎস থেকে জ্ঞান পাচ্ছেন বলেই নির্বিকার চিত্তে ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে হেদায়াতের পথে পিতাকে আহ্বান জানাতে পারছেন।

মূর্তি-পূজার অসারতা ও খারাবী সম্পর্কে জানার পর এবং পূর্ণাংগ জ্ঞানের উৎসের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা এসে যাওয়ার পরই তিনি পিতাকে দাওয়াত দিচ্ছেন। একারণেই সুস্পষ্টভাবে তিনি পিতাকে জানাতে পারছেন যে তার পথ অবশ্যই শয়তানের পথ। তার একমাত্র বাসনা যে পিতা মহাদয়াময় আল্লাহর পথে চলুক-কেননা প্রতিনিয়ত তাঁর ভয় হচ্ছে, পিতা যে পথে চলছে তা যে কোনো সময় তাকে আল্লাহর গযবের মধ্যে ফেলে দেবে এবং শয়তানের অনুসারী হিসাবে তার প্রতি চিরস্থায়ী আযাবের ফয়সালা হয়ে যাবে। তাই ইবরাহীম (আ.)-এর সতর্কবাণী উদ্ধৃত করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'হে আমার পিতা, শয়তানের অনুসরণ করবেন না, অবশ্যই শয়তান আল্লাহর না-ফরমান হয়ে গেছে। হে আমার পিতা, আমার ভয় হচ্ছে, আপনাকে মহা দয়াময় আল্লাহর আযাব পাকড়াও করে নেবে, ফলে আপনি শয়তানের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবেন।'

আর শয়তান তো সেই দুরাশয় খবীস, যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে প্রতিনিয়ত মূর্তিপূজার দিকে মানুষকে প্ররোচিত করে চলেছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এসব মূর্তির পূজা করে, সে যেন শয়তানেরই পূজা করে, আর শয়তান তো মহা দয়াময় পরওয়ারদেগারের সরাসরি না-ফরমানি করেছে। এখানে ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন যেন সে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে ক্রোধান্বিত না করে, তা করলে অবশ্যই তাকে আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দেবেন এবং তাকে শয়তানের বন্ধু ও অনুগামী বানিয়ে দেবেন। অতপর, বুঝতে হবে যে আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর বান্দাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দেন এটা অবশ্যই তার জন্যে এক অপার নেয়ামত এবং যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে শাস্তি দেন তখন শয়তানকে তার বন্ধু বানিয়ে দেন। এটা এমনই এক প্রতিশোধ বা শাস্তি যে কেয়ামতের দিন হবে এটা আরো কঠিন ও আরো বেশী ক্ষতিকর এবং হিসাব নিকাশের দিনে এ শাস্তি হবে আরো মারাত্মক।

কিন্তু পরম প্রিয় ও মধুর কথা দ্বারা প্রদত্ত এই মর্মস্পর্শী দাওয়াত কিছুসংখ্যক বিবেকবান লোকের অন্তর স্পর্শ করলেও খুঁতখুঁতে প্রাণ মোশরেক ও কঠিন হৃদয়ে এ দাওয়াত কোনো দাগ কাটতে সক্ষম হয় না। তাই দেখা যায়, ইবরাহীম (আ.)-এর মোলায়েম ও যৌক্তিক কথাকে তাঁর পিতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তাঁকে চরমভাবে তিরস্কার করতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং তাকে কঠিন শাস্তি দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। কালামে পাকে তার কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'তুমি কি আমার মাবুদদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যেতে চাও এবং তাদের থেকে আমাকেও বিমুখ বানাতে চাও? হে ইবরাহীম এসব বাজে কথা বলা যদি বন্ধ না করো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে ফেলবো, দূর হয়ে যাও এখান থেকে আর সহসা যেন তোমাকে আমি এ অঞ্চলে না দেখি।'

অর্থাৎ তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, হে ইবরাহীম? তাদের পূজা করতেও কি তুমি অনিচ্ছুক, তুমি কি তাদেরকে অস্বীকার করো? এতোদূর স্পর্ধা তোমার, যে আমার মাবুদদের সম্পর্কে তুমি এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলতে সাহস পেয়েছো? ভালো করে জেনে নাও, যদি আমার মাবুদদের সম্পর্কে পুনরায় তোমার মুখে এসব জঘন্য উক্তি শুনতে পাই তাহলে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'তুমি যদি না থামো তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি পাথর নিক্ষেপে মেরে ফেলবো।'

সুতরাং দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, আর শোনো, তুমি এতো দূরে চলে যাবে যেন বহু দিন ধরে আর তোমাকে আমি না দেখি, যদি বাঁচতে চাও তো শীঘ্র পালাও এখান থেকে। 'দীর্ঘদিনের জন্যে আমার থেকে দূরে চলে যাও।'

যখনই কোনো বিপথগামী ব্যক্তি কাউকে হেদায়াতের দিকে ডাকে তখন এমনই হয় তার প্রতিক্রিয়া আর এই ধরনের কঠিন কথাই ভদ্র রুচিবান ও সম্ভ্রান্ত মানুষদেরকে শুনতে হয়। এই হচ্ছে ঈমান ও কুফর এর মধ্যে সম্পর্ক আর কুফরীর কারণে যে অন্তর বিগড়ে গেছে তার মোকাবেলায় কথা বলতে গিয়ে এমনই কঠিন অবস্থা বরদাশত করতে হয়– সে অন্তরকে যা ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়েছে।

দেখুন, আল্লাহর পরম প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ.) কেমন প্রশান্ত বদনে বাপের এসব তিরস্কার ও কঠিন কথাকে সহ্য করছেন। তিনি কোনো রাগ করলেন না, আদবের খেলাফ কোনো কথাও বলছেন না বা এমন কোনো আচরণও করছেন না যার দ্বারা তার অধৈর্য হওয়ার কথা প্রকাশ পেতে পারে বা তার উন্নত চরিত্র ও ব্যবহার থেকে তিনি সরে গেছেন বলে মনে হতে পারে! নীচের শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হচ্ছে,

'সে বললো, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, শীঘ্রই আমি আমার রবের কাছে আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, অবশ্যই তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। ঠিক আছে, আমি আপনাদের এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদের পূজা অর্চনা আপনারা করে চলেছেন, তাদের সবাইকে ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা জানাব যেন তিনি আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার তাওফীক দেন এবং তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে হতভাগ্য না বানান।'

খেয়াল করে দেখুন, ইবরাহীম (আ.) পিতার সাথে কোনো ঝগড়া করছেন না, তাকে কোনো কষ্ট দিচ্ছেন না, তার ধমক ও শাস্তি দানের ভয় দেখানোতে কোনো প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করছেন না........ তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবো যেন তিনি আপনাকে ক্ষমা করে

দেন এবং তিনি চিরস্থায়ী গোমরাহীর মধ্যে হাবুডুবু খেতে এবং শয়তানের সহচর অবস্থায় থাকার জন্যে আপনাকে ছেড়ে না দেন, বরং তিনি যেন আপনার প্রতি রহম করেন এবং হেদায়াতরূপ নেয়ামত আপনাকে দান করেন, অবশ্যই তিনি আমাকে সম্মানিত করবেন এবং আমার দোয়া কবুল করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আমার উপস্থিতি ও আপনার পাশে আমার অবস্থান যদি আপনার জন্যে কষ্টদায়ক হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এবং আপনার জাতিকে আমি ছেড়ে চলে যাবো, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসবের পূজা অর্চনা আপনারা করে চলেছেন তাদের সবাইকেই আমি পরিত্যাগ করতে এতোটুকু কুণ্ঠাবোধ করবো না, সাহায্যের জন্যে বুকভরা আশা নিয়ে একমাত্র তাঁকেই আমি ডাকবো যিনি প্রকৃতপক্ষে আমার রব, আর আল্লাহকে আমার ডাকার কারণে অবশ্যই আমি আশা করবো যে তিনি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।

সুতরাং, এখানে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে ইবরাহীম যার কাছে আশা করছেন· একমাত্র তিনিই যে তাকে যে কোনো ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারেন সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত। যাকে ইবরাহীম মনে প্রাণে অনুভব করেন এবং যার অস্তিত্ব ও করুণারাশি সবখানে পরিব্যাপ্ত বলে তাঁর হৃদয় মন ভরপুর, একমাত্র তার কাছে আশা করাটাই তো যুক্তিযুক্ত, অথচ তাঁকে তিনি নিজের চোখে দেখছেন না এবং তিনিই যে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারেন এই অনুভূতি ছাড়া তাঁর সম্পর্কে অতিরিক্ত আর কিছু তিনি জানেন না।

এভাবেই ইবরাহীম তার বাপকে, তার জাতিকেও তাদের পূজা অর্চনা এবং পূজনীয় বস্তু ও ব্যক্তিবর্গকে ছেড়ে চলে গেলেন, পরিত্যাগ করলেন তার পরিবারবর্গ ও ঘরবাড়ী। কাজেই আল্লাহ তায়ালাও তাকে নিঃসংগ ও একাকী অবস্থায় ছেড়ে দিলেন না, বরং তার স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়া নির্বাসনের মধ্যে তাকে মহান আল্লাহ দান করলেন তার বংশধর এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দিলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন সে পরিত্যাগ করে চলে গেলো তাদেরকে এবং সেইসব বস্তু বা ব্যক্তিকে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা অর্চনা তারা করছিলো তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক নামক এক ছেলে এবং ইসহাকের ছেলে ইয়াকুব নবীকে। আর এদের প্রত্যেককে বানালাম নবী, আর আমার রহমতের মধ্য থেকে তাদের প্রত্যেককে দান করলাম বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত ও প্রভুত্ব মান সম্ভ্রম, আর তাদের প্রত্যেকের জন্যে বানিয়ে দিলাম অতি মর্যাদাপূর্ণ সত্য কথা বলার ক্ষমতা।

আসুন, এবার আমরা এই নবীদের পরিচয় জেনে নেই, ইসহাক (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র, যিনি তার স্ত্রী সারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, অথচ ইতিপূর্বে সে স্ত্রী ছিলেন বন্ধা, আর ইয়াকুব (আ:) ছিলেন ইসহাক (আ.)-এর ছেলে। কিন্তু অনেকে তাকে ইবরাহীম (আ.)-এর ছেলে মনে করে থাকে কারণ ইসহাক (আ.) ইয়াকুব (আ.) কে তার দাদা ইবরাহীমের জীবদ্দশাতে তার বাড়ীতেই এমনভাবে লালন-পালন করেছিলেন যে তিনি সরাসরি তার ছেলের মতোই আদর মহব্বত পেয়েছেন তাকে তার বাপের মতো আল্লাহ তায়ালা নবীও বানিয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর দান করেছি তাদেরকে আমি আমার রহমত থেকে' বহু নবী যেমন ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশে আরো বহু নবী.........আর আল্লাহর রহমতের কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, কারণ এ সূরার প্রতি ছত্রের মধ্যে আল্লাহর রহমতের কথা মূর্ত হয়ে রয়েছে, আর আল্লাহর নবুওত রূপ এ রহমত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই দান যা তিনি ইবরাহীম ও তার বংশধরদের মধ্যে দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ.)-এর সমগ্র গোষ্ঠী ও তার গোত্রের পর গোত্র ধরে বহু

বহু লোক এ মহান নেয়ামতের অধিকারী হয়েছেন এবং দুনিয়াকে তারা হেদায়াতের আলো দেখিয়েছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর বানিয়েছি আমি, তার কথাকে সমুন্নত।' এর ফলে, বরাবরই দাওয়াত দিতে গিয়ে তারা সততা ও সত্যবাদিতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাদের জাতির লোকেরা মুগ্ধ হৃদয়ে সাড়া দিয়েছে তাঁদের দাওয়াতে এবং মহব্বতের সাথে তারা এই নবীদের আনুগত্য করেছে।

হযরত মুসা ও ইসমাঈল (আ.)–এর ঘটনা

এরপর ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে আগত আম্বিয়ায়ে কেরামের বর্ণনা পর্যায়ক্রমে এগিয়ে চলেছে। এদের মধ্য থেকে একটি সিঁড়ি আলাদা হয়ে গিয়ে ইসহাক (আ.)-এর বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন মূসা এবং হারুন (আ.)। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এ মহান কেতাবের মধ্যে স্মরণ করো মূসাকে। সে ছিলো বড়ই মোখলেস (নিষ্ঠাবান) এবং একই সাথে রসূল ও নবী, আর আমি তার সাথে গোপন ও রহস্যপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করার জন্যে পবিত্র তূর পর্বতের কাছে তাকে ডেকেছিলাম। আর আমার মেহেরবানীর দান হিসাবে তার ভাই হারুনকেও তার সাথে নবী বানিয়ে (তার সাথী করে) দিয়েছিলাম।'

এখানে মূসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে তিনি ছিলেন বড়ই নিষ্ঠাবান (মোখলেস), যাকে আল্লাহ তায়ালা বড় আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং একমাত্র তাঁর জন্যেই দাওয়াতী কাজ করার প্রেরণা তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই দান করেছিলেন। তিনি রসূল ছিলেন নবীও ছিলেন। আর রসূল তো হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি নবীদের মধ্যে বিশেষভাবে আল্লাহর আহ্বানকে কার্যকরভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। নবীরা সেটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে একই মর্যাদায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে থেকে সঠিক পথপ্রাপ্ত। যাদেরকে দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে এই রকম সঠিক পথপ্রাপ্ত ভালো মানুষ বহু ছিলেন, যারা মূসা (আ.)-এর আদর্শকে নিজেদের জীবনে যথাযথভাবে বহন করে মানুষের সামনে আদর্শ হয়ে ফুটে থাকতেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে যে তাওরাত কেতাব মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিলো তার বিধানকে তারা চালু রাখতেন। এ কথারই বহন করছে নীচের আয়াতটি।

'আমি নাযিল করেছি তাওরাত– তার মধ্যে রয়েছে সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত) ও সঠিক পথকে বুঝার জন্যে সুস্পষ্ট যুক্তি (নুর আলো) যার দ্বারা ওই নবীরা শাসনকার্য পরিচালনা করতো, যারা নিজেরা আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি মেনে চলতো, আর পরিচালনা করতো তারাও যারা নিবেদিত প্রাণ মুসলমান (দরবেশ) ছিলো এবং ওই সমাজের বিজ্ঞ আলেমরাও তাদেরকে সেইসব বিধান দ্বারা পরিচালনা করতো যা তারা আল্লাহর কেতাব থেকে শিখে রেখেছিলো, আর তারা নিজেরাও ওইসব হুকুম আহকাম পালনকারী ছিলো।'

এর পর পবিত্র তূর পর্বতের কাছে থেকে মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা নিজে আহ্বান জানানোর কারণে, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কথা জানানো হচ্ছে,

আল্লাহহর সাথে তাঁর প্রিয় মোসলেম বান্দা মুসা (আ.)–এর কথোপকথন অতি সংগোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো যা আমাদের কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, আমরা জানি না কিভাবে এ কথোপকথন হয়েছিলো এবং মূসা (আ.) কিভাবে এ কথাগুলো বুঝেছিলেন এসব কথা কি কোনো আওয়ায ছিলো, যা তার কান শুনতে পেয়েছিলো অথবা এগুলো ছিলো কি এমন কোনো কথা যা গোটা মানব জাতি শুনতে পেয়েছিলো, আর আমরা এও জানি না যে মূসা (আ.) এ মানব দেহ নিয়ে বিশ্ব-স্রষ্টা চিরন্তন আল্লাহর কথা কিভাবে শুনতে পেয়েছিলেন.........তবে আমরা বিশ্বাস করি

যে অবশ্যই এসব কথোপকথোন হয়েছিলো, আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাইলে, তাঁর পক্ষে, তাঁর কোনো বান্দার কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেয়াটা মোটেই কোনো দুরূহ ব্যাপার নয়। তাঁর উপায়সমূহের মধ্য থেকে যে কোনো এক উপায়ে তিনি তা পৌঁছে দিতে পারেন। তবে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবশ্যই মুসা (আ.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ, অপরদিকে ছিলো সুমহান আল্লাহর মর্যাদাসিক্ত কথা তাঁর প্রিয় নবীর কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারটি। হাঁ এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই, কারণ এর আগে, মানবতার জন্ম লগ্নে, আল্লাহর তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দেয়ার ফলেই তো মাটির একটি কায়া মানুষের অস্তিত্ব লাভ করেছিলো।

অপরদিকে, মূসা (আ.)-এর আবেদনে হারুন (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে যে তাঁর সংগী ও সহযোগী বানিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে সে কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমার ভাই হারুন সে আমার থেকেও স্পষ্টভাষী, সুতরাং হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার সাহায্যকারী হিসাবে তাকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও যাতে করে সে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারে, আমার খুব ভয় হয়, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করবে।'

আর সূরাটির সবটুকুর মধ্যে আল্লাহর রহমতের যে ছায়া বিরাজ করছে তারই মাধ্যমে সুশীতল ছায়া দান করেন সকল ছায়ার মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং নিজে।

এরপর সূরাটির আলোচ্য প্রসংগ ফিরে যাচ্ছে এ সূরার সর্বশেষ অধ্যায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বর্ণনার দিকে। অতপর আরববাসীদের পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃকুল ইসমাঈল (আ.)-এর বর্ণনা আসছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করো এ মহান কেতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে, অবশ্যই সে ছিলো ওয়াদাকে সত্যে পরিণতকারী, একজন রসূল ও নবী। সে তার পরিবারকে নামায কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার হুকুম দিতো এবং সে ছিলো তার পরওয়ারদেগারের নিকট পরম প্রিয় ও সন্তোষপ্রাপ্ত।'

এখানে ইসমাঈল (আ.)-এর গুণাবলীর দিকে বিশেষভাবে ইংগিত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, তিনি তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণতকারী ছিলেন, আর যেহেতু ওয়াদা পূরণ করা প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির অনন্য বৈশিষ্ট্য, এজন্যে বলা হচ্ছে ইসমাঈল (আ.)-এর এ বেশিষ্ট্যের বহিপ্রকাশ ঘটেছিলো অভূতপূর্ব এক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে তিনি ছিলেন একজন রসূল। অতএব, প্রথম সারির সম্মানিত আরবদের কাছে তাঁর কথা ছিলো অধিক গ্রহণযোগ্য, যেহেতু তিনি ছিলেন সকল আরববাসীর পূর্ব পুরুষ। অবশ্য এটাও সত্য যে, মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত পাওয়ার পূর্বে আরববাসীদের মধ্যে অনেকে একত্ববাদী ছিলো, সুতরাং এতে বেশ বুঝা যাচ্ছে যে ইসমাঈল (আ.)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তখনও রয়ে গিয়েছিলো যারা তার শিক্ষাকে একেবারে ভুলে যায়নি। প্রসংগক্রমে এখানে একথাও উল্লেখ করা যায় যে, ইসমাঈল (আ.)-এর আকীদার বহিপ্রকাশ ছিলো নামায ও যাকাত। এই দুটি আনুষ্ঠানিক এবাদাত তার সম্পর্কে তার বশংধরদের মধ্যে কিছু না কিছু চেতনা তখনও অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো। তারা জানতো ও স্বীকারও করতো যে, তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তার অনুসারীদেরকে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের জন্যে নির্দেশ দিতেন এবং তাদের কাছ থেকে একথাও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইসমাঈল (আ.) তার রবের কাছে বড়ই প্রিয় ও সন্তোষভাজন ছিলেন। আর যেসব বৈশিষ্ট্য এ সূরার মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ইসমাঈল (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং আল্লাহর এ সন্তোষ তাঁর দয়া ও রহমতরূপে ঝরে পড়েছে তার ও তার বংশধরদের ওপর। সন্তোষ ও দয়া প্রদর্শনের গুণ মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ!

আরো কয়েকজন নবী ও তাদের পথভ্রষ্ঠ জাতির কাহিনী

পরিশেষে ইদ্রিস (আ.)-এর উল্লেখ দ্বারা ওপরে বর্ণিত আলোচনা ধারার সমাপ্তি টানা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করো এই আল কেতাবের মধ্যে ইদ্রীস নবীকে, অবশ্যই সে ছিলো সত্যনিষ্ঠ নবী এবং আমি মহান আল্লাহ সমুন্নত করেছিলাম তার মর্যাদাকে।'

ঠিক কোন সময়ে ইদ্রীস নবীর আগমন ঘটেছিলো তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তবে এটা বলা যায় যে, তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বে এসেছিলেন এবং তিনি বনু ইসরাঈল জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো নবী ছিলেন না। এজন্যে বনী ইসরাঈল জাতির কাছে অবতীর্ণ কেতাবগুলোর মধ্যে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র আল কোরআনের মধ্যে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ মহান কেতাব তার সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলছে যে, তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছিলেন, আর তাঁর মর্যাদার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে যে মহান আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং লোকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তার স্মৃতি ও শিক্ষাকে জাগরুক রেখেছিলেন।

অবশ্য ইদ্রিস (আ.) সম্পর্কে কিছু লোকের ধারণা যে, শুধুমাত্র নবীদের একজন হওয়ার কারণেই আল কোরআনে তার উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না। মিসরের পুরাতন কাহিনীর মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের মতামত জানা যায় যে, ইদ্রীস শব্দটি প্রাচীন মিশরের ভাষায় উচ্চারিত 'ওযরেস'-এর আরবী প্রতিশব্দ, যেমন বলা হয়ে থাকে 'ইউহেনা'-র আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে ইয়াহইয়া এবং 'ইলয়্যশা'র আরবী প্রতিশব্দ 'আল য়্যমা'............ আর এভাবে অনেক প্রাচীন কথা কিংবদন্তী আকারে চালু হয়ে রয়েছে। এসব প্রাচীন ইতিহাসবিদরা মনে করতো এবং আরবের অনেকেও রসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানাতেও বিশ্বাস করতো যে ইদ্রীস (আ.) উর্ধাকাশে আরোহণ করেছিলেন এবং সেখানে তাকে এক মহা মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিলো। আর যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার আমলনামা গুনাহের কাজের তুলনায় নেকীর কাজে বেশী ভারী হয়ে যাবে সে সে ওযরেস-এর সাথে মিলিত হতে পারবে, যাকে আরববাসী দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো, আর এই নবী আকাশে আরোহণের পূর্বে তার অনুসারীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কিন্তু যে যাইই বলুক না কেন, আমরা ওইকথার ওপর টিকে থাকবো যা আল কোরআনে উলেখ হয়েছে এবং এই কথাকেই গুরুত্ব দেবো যে ইদ্রীস (আ.) বনী ইসরাঈল জাতির পূর্ব যামানাতে আগমন করেছিলেন।

ওপরে বর্ণিত সে সকল নবীদের বর্ণনা এখানে পেশ করা হয়েছে যাতে করে নেককার মোমেন জনতা এবং আরবের মোশরেক ও বনী ইসরাঈলদের মোশরেকদের মধ্যে তুলনা করে তাদের অবস্থাকে পৃথক পৃথকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এই তুলনামূলক আলোচনায় দেখা গেছে এই দুই দলের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে রয়েছে বহু দূরত্বের ব্যবধান— এমন এক গভীর খাদ দুই দলের মধ্যে বিরাজ করছে যে এক দলের সাথে আর এক দলের সম্প্রীতি গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ নেই। অতীতে এবং পরবর্তীতে একইভাবে এই দূরত্ব বিরাজ করবে এদের একত্রিত হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এদের সম্পর্কে কালামে পাকে যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তার দিকে একবার খেয়াল করে দেখুন,

'এরা হচ্ছে বনী আদমের মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত সেইসব নবী যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বহু নেয়ামত দান করেছেন। এসব নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের সারিতে তারাও আছে যাদেরকে আমি নূহের সাথে জাহাজে আরোহণ করিয়েছিলোম......এরপর তাদের পেছনে এলো

আর এক দল যারা নামায পড়া সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করলো ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে দিলো যার ফলে অচিরেই তারা এর মন্দ পরিণতি ভোগ করবে। (আয়াত ৫৮-৫৯)

মানব জাতির ইতিহাসে নবুওতের পাতার মধ্যে রয়েছে মানবতার অতি উজ্জ্বল বিশেষ বিশেষ চিহ্ন, যার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা এখানে পেশ করা হয়েছে, বলা হচ্ছে, 'আদম সন্তানদের মধ্য থেকে' 'আর নূহের সাথে যাদেরকে আমি জাহাজে আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের থেকে,' আর ইবরাহীম ও ইসরাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে। আদম (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে আপনা থেকেই গোটা মানব জাতির বর্ণনা এসে যায়, তারপরই নূহ (আ.)-এর স্থান অর্থাৎ আদম (আ.)-এর পর তার নাম উল্লেখ করাতেও মানব জাতির চিত্র ফুটে উঠে। তারপর ইবরাহীম (আ.)-এর কথা বলার সাথে সাথে বড় বড় নবীদের একাংশের কথা বুঝা যায়, ইয়াকুব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করায় মানব জাতির মধ্য থেকে বনী ইসরাঈল জাতির এক বিশেষ শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর আরব জাতি নামক আর একটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়, যারা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশোদ্ভুত বলে জানা যায় এবং তাদের মধ্যেই আগমন হয়েছে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর।

এই নবীরা এবং এদের সংগী-সাথী, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন এবং তাদের বংশধরদের যে সব নেক লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা মানব মন্ডলীর মধ্য থেকে তাঁর নেক বান্দা রূপে বাছাই করে নিয়েছেন, তাদের দল এদের মধ্যে যে সব গুণ ছিলো তা সবার সামনে প্রকাশিত ছিলো। এদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

'এরা এমন এক শ্রেণীর লোক যাদের সামনে দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে প্রকম্পিত হৃদয় নিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় পড়ে যায়,.......

এরাই হচ্ছে সেইসব আল্লাহভীরু, যারা আল্লাহ সম্পর্কে তীব্র অনুভূতি রাখে, তাদের সামনে যখনই আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখনই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে তাদের হৃদয় মনে যে প্রচন্ড আবেগ সৃষ্টি হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, গভীর ভয় ও মহব্বতে তাদের দুনয়ন থেকে বিগলিত ধারায় ঝরতে থাকে অজস্র অশ্রু ......এদের পরে এলো আর এক জনপদ যারা আল্লাহ তায়ালা থেকে অনেক দূরে সরে পড়লো, 'তারা ধ্বংস করে দিলো নামাযকে' অর্থাৎ পরিত্যাগ করলো নামায এবং ধ্বংস করে দিলো নামাযের মাধ্যমে গড়ে ওঠা পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনের বুনিয়াদকে 'আর তারা তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করলো এবং ডুবে গেলো প্রবৃত্তির দাসত্বের মধ্যে– হায়, কতো যোজনব্যাপী দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে।

এসব লোকদের জন্যে আযাবের ধমকি দেয়া হয়েছে, অথচ তাদের বাপ দাদারা কতো নেককার মানুষ ছিলো-তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, তারা গোমরাহীর পর্দা ছিন্ন করে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং পরিশেষে রয়েছে তাদের জন্যে ধ্বংস। বলা হচ্ছে, 'শীঘ্র তারা মুখোমুখি হবে গোমরাহীর পরিণতিতে চরম শাস্তির।' 'গাইয়ু' শব্দটির অর্থ হচ্ছে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং পথভ্রষ্টতা। আর দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস।

জান্নাতের পরিবেশ ও তা পাওয়ার উপায়

এরপর তাওবার দরজাকে পুরোপুরি খুলে দেয়া হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রহমত, তাঁর মেহেরবানী ও অসংখ্য নেয়ামতের মৃদ সমীরণ প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তবে যে তাওবা, ঈমান আনবে এবং ভালো কাজ করবে তারাই জান্নাতে দাখেল হবে এবং তাদের প্রতি কিছু মাত্র যুলুম করা হবে না আমার সেসব বান্দাদেরকে যারা জীবনে তাকওয়া অবলম্বন করে চলেছে।' (আয়াত ৬০-৬৩)

কিন্তু সে তাওবা এমন হতে হবে যা ঈমান ও ভালো কাজ গড়ে তোলে। এভাবে তাওবার দ্বারা যে অবশ্যই ইতিবাচক ফল হয় তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিতও হয়েছে............ এইভাবে তাওবা দ্বারা সে ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানুষ নাজাত পাবে এবং রোয হাশরের সেই ভীষণ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে যা নির্ধারিত রয়েছে অহংকারী ও হঠকারীদের জন্যে। তাওবাকারী ব্যক্তিরা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না। তারা সাময়িকভাবে দাখেল হবে– তা নয়, বরং চিরস্থায়ীভাবে থাকার জন্যেই তারা সেখানে প্রবিষ্ট হবে। এ জান্নাত তো ঠিক করে রাখা হয়েছে করুণাময় আল্লাহর সেইসব বান্দাদের জন্যে যারা না দেখে এ জান্নাতের কথা বিশ্বাস করেছে এবং এ জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে তারা পরম আগ্রহে নিজেদেরকে যাবতীয় অন্যায় কাজ ও মন্দ আচরণ থেকে রক্ষা করেছে। তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর ওয়াদাও সত্য, যা কিছুতেই নষ্ট হবার নয়, আর তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তুলনা ও দৃষ্টান্ত দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এরপর আঁকা হচ্ছে জান্নাত ও জান্নাতবাসীর এমন জীবন্ত ছবি যেন পাঠক জান্নাতকে তার চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে।

সেখানে 'সালাম' 'সালাম' 'শান্তি'– শান্তির এ মহা বাণী ছাড়া কোনো বাজে কথা তারা সেখানে শুনতে পাবে না, শুনতে পাবে না কোনো তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া বিবাদ। শুধুমাত্র একটি শব্দই তারা শুনবে যার দ্বারা তাদের প্রাণ ঠান্ডা হয়ে যাবে আর তা হবে শান্তির বাণী। এ জান্নাতের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই তারা পাবে, কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হবে না বা কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে কোনো পরিশ্রমও করা লাগবে না, হারিয়ে যাওয়ার বা শেষ হওয়ার চিন্তা তাদেরকে বিব্রত করবে না, আসবে না, কোনো পেরেশানী বা ভয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের জন্যে সেখানে থাকবে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যা তারা পাবে সকাল সন্ধ্যায় সব সময়ে।'

এতে তাদের মনের চাহিদা মিটে যাবে। আর এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরাপদ ও সন্তোষজনক নেয়ামতে পরিপূর্ণ স্থানে তারা অনন্তকাল ধরে থাকবে। যেখানে কোনো দিন আসবে না কোনো প্রকার পেরেশানী। ঐ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'এ হচ্ছে সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমি আমার সেই সব বান্দাকে বানিয়েছি যারা জীবনে সদা-সর্বদা পরহেযগার ছিলো।'

এখন সেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার আকাংখী যে হতে চাইবে তার জন্যে সহজ পথ রয়েছে সবার কাছে সুপরিচিত, আর সে পথ হচ্ছে, তাওবা ঈমান ও আমলে সালেহ, বংশধর হিসাবে যে উত্তরাধিকার পাওয়ার কথা আমরা সাধারণভাবে বুঝতে, পারি, সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা সেখানে নেই। হাঁ, উত্তরাধিকার সূত্রে যারা সম্পত্তি পাবে তারা হচ্ছে নবীদের নেককার অনুসারীরা, আর সেইসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দা রূপে মানবমন্ডলীর মধ্য থেকে তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। কিন্তু হায়, তাদের পরবর্তী লোকেরা নামায পরিত্যাগ করলো এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব গ্রহণ করে নিলো, যার ফলে নবীদের বংশধর হওয়ার কোনো সুবিধা তারা অর্জন করতে পারলো না।

এরশাদ হচ্ছে, 'অতপর, শীঘ্রই তারা সাক্ষাত লাভ করবে অভাবনীয় কঠিন শাস্তির।'

আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব

পরিশেষে আলোচ্য পাঠটির সমাপ্তি টানা হচ্ছে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্ব কর্তৃত্বের চূড়ান্ত ঘোষণা দানের সাথে। এ পর্যায়ে তাদেরকে আল্লাহর নিরংকুশ ও সার্বিক আনুগত্য করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং এপথে আগত সকল বাধা বিঘ্ন ও সংকট সমস্যার মধ্যে সবর করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে, ফেরেশতাদের কথা উদ্ধৃত করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আর আমরা তোমার রবের হুকুম ছাড়া কখনও অবতীর্ণ হই না। আমাদের সামনে, পেছনে এবং এই দুই স্থানের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক তো একমাত্র তিনি, আর তোমার রব কোনো কিছু ভুলে যান না। আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সেসব কিছুর মালিকও একমাত্র তিনি, অতএব, নিরংকুশভাবে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করো এবং একমাত্র তাঁরই অনুগত্য করার ব্যাপারে তুমি চূড়ান্তভাবে মযবুত হয়ে থাক। তাঁর (শক্তি ক্ষমতা প্রকাশক) যেসব নাম আছে অনুরূপ (শক্তি-ক্ষমতা প্রকাশক) নাম আর কারো আছে বলে কি তোমার জানা আছে?'

এই আয়াতাংশ নাযিল হওয়া সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় তা একটা আর একটার সাথে মিশে থাকার কারণে সেগুলো থেকে সঠিক অর্থ উদ্ধার করা বড়ই মুশকিল। কিছু দিন ওহী আসা বিলম্বিত হওয়ার কারণে জিবরাঈলের আগমন ও স্থগিত থাকে এবং তার এই না আসার কারণ জানাতে গিয়ে উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এ সময় মোহাম্মদ (স.)-এর অন্তরে এক দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয় এবং তিনি প্রিয়তম মালিকের সাথে সম্পর্ক পুনস্থাপনের জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তখন আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা জিবরাঈলকে ওপরে বর্ণিত কথাগুলো নবী (স.)-কে বলার নির্দেশ দেন, 'আমরা তো তোমার রবের হুকুমেই নাযিল হই', অর্থাৎ আমাদের সকল কাজের মালিক একমাত্র তিনি। এরশাদ হচ্ছে,

'আমাদের সামনে, পেছনে এবং এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে যতো কিছু আছে, সব কিছুর মালিক একমাত্র তিনি।'

তিনি কিছুই ভুলে যান না। তিনি ওহী তখনই নাযিল করেন যখন তার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন।

'আর তোমার রব কখনও ভুলে যান না।'

এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ও স্মরণ করানো হচ্ছে যেন তিনি আল্লাহর হুকুম পালনের কাজে দৃঢ়তার সাথে লেগে থাকেন এবং একমাত্র আল্লাহরই প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব সম্পর্কে ঘোষণা দেয়ার কাজ জারি রাখেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আকাশমন্ডলী ও যমীনের এবং এ দুইস্থানের মধ্যবর্তী স্থানগুলোরও সবটুকুর মালিকও একমাত্র তিনি।'

তিনি ছাড়া প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব আর কারো নয়। এই ঘোষণা দেয়ার পর জনগণকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব কর্তৃত্ব মানতে নিষেধ করে দেয়া হলো এবং তাঁর সাথে এই মহা বিশ্বের কোনো কিছুকে অংশীদার মনে করতেও মানা করা হলো। এজন্যে এশাদ হচ্ছে,

'তাঁর আনুগত্য করো এবং তাঁর এবাদাত করতে গিয়ে মযবুত হয়ে থাকো।'

অর্থাৎ, তাঁর এবাদাত করো পূর্ণাংগ ও নিঃশর্তভাবে তাঁর যাবতীয় বিধি নিষেধ মেনে চলো এবং এইভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে দুঃখ দৈন্য সংকট সমস্যা যাই আসুক না কেন তার মধ্যে মযবুত হয়ে থাকো। মাবুদ পরওয়ারদেগারের যাবতীয় হুকুম পালন করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হওয়া এবং আনুগত্যের এ মহান ব্রতে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকাই হচ্ছে বান্দাদের কর্তব্য। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বলছেন পূর্ণাংগভাবে তোমার মনিবের আনুগত্য করো এবং তোমার শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী তোমার মালিকের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্যে মনকে গুছিয়ে নাও, চেষ্টা সাধনা করো কিন্তু অবশ্যই এটা একটা দুঃসাধ্য ও কষ্টকর কাজ। সকল কিছু থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে হৃদয় মনকে রুজু করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বড় কষ্ট করেই এভাবে মনকে তার লাগাম ছাড়া চাহিদার বস্তু থেকে সরিয়ে নিতে হয়। এতে কি যে কষ্ট হয় তা সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে আন্তরিকভাবে এ চেষ্টা সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। পৃথিবীর অসংখ্য লোভনীয় জিনিসের হাতছানি থেকে নিজেকে

বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে হৃদয়মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে চায়, কিন্তু একবার এ সাধনা শুরু করলেই এর মধ্যে এক রহস্যময় তৃপ্তি অনুভূত হয়। কষ্ট করেও দুঃখ সয়ে যারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে তারাই আল্লাহর বিশেষ রহমতের হকদার হয়। দুঃখ কষ্ট ছাড়া ও ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া এবাদাতের স্বাদ ও সাফল্যের খুশী লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয় এর রহস্যময় কারণ একমাত্র তারাই জানতে পারে এবং আল্লাহর রহমতের খোশবু একমাত্র তারাই পেতে পারে যারা পুরোপুরিভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেয় এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বানিয়ে নেয়। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সত্য উপলব্ধির জন্যে তাদেরই হৃদয় দ্বার খুলে যায় এবং তাদের অনুভূতির বাতায়নসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আনুগত্য করো নিঃশর্ত ও নিরংকুশভাবে একমাত্র তাঁর এবং চরমভাবে ধৈর্য অবলম্বন করো সকল প্রতিকুল পরিস্থিতিতে।'............

আর একথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে ইসলামের এবাদাত শুধুমাত্র অন্তরে বিদ্যমান নিছক কোনো অনুভূতির নাম নয়। ইসলাম গ্রহণ করতে গেলে এবং আল্লাহর কাছে মুসলমান বলে স্বীকৃতি পেতে হলে প্রয়োজন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, এ চেষ্টাকালে প্রতিটি কর্মাকাণ্ড, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি ব্যস্ততা, প্রতিটি ইচ্ছা এরাদা, প্রতিটি ঝোঁক প্রবণতা আল্লাহর কাছে পুরস্কারের নিশ্চয়তা এনে দেয়। তবে একথা স্থির নিশ্চিত আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি লাভ করতে হলে এবং চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারে উপনীত হতে হলে অবশ্য অবশ্যই কিছু না কিছু কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে একটা স্বত-সিদ্ধ কথা রয়েছে, মূল্য দিয়েই মূল্যবান কিছু লাভ করা যায় এবং কষ্ট করেই কষ্ট দূর করার পথ উন্মুক্ত হয়। এজন্যে পুরোপুরি আল্লাহমুখী হতে হবে এবং সবাইকে ছেড়ে এবং সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহকেন্দ্রিক হতে হবে। এপথে যে কষ্ট আসবে তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে পৃথিবীর সকল মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আকাশের মালিকের নৈকট্য লাভ করা যায়..... পৃথিবীর জনতার ভীড় থেকে ও যাবতীয় প্রয়োজন ও লোভ-লালসার ফাঁদ থেকে এবং প্রবৃত্তির বল্গাহীন চাহিদা ও ভোগ বিলাস থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলেই আখেরাতের চিরন্তন সুখ এবং চরম ও পরম শান্তির আশা করা যেতে পারে।

আল্লাহর এবাদাত বা আল্লাহকে মনিব মালিক প্রভু মেনে তাঁর হুকুম মতো যে জীবন যাপন করা হয় তাই হচ্ছে আল্লাহর জীবনের পূর্ণাংগ দেয়া ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করেই মানুষ সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তুলতে পারে এবং এ ব্যবস্থা মতো চলতে গিয়ে মানুষ অনুভব করে যে তার জীবনের ছোট বড় সব কিছুর মধ্যে সে আল্লাহরই দাসত্ব করছে, এভাবে সে তার সকল কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে আল্লাহর বিধান পালনকারী হিসাবে দেখতে পায় এবং জীবনকে ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, আর এভাবেই তার জীবনকে সে সুখী ও সুন্দর বানাতে সক্ষম হয়। তবে এ জীবন পথে প্রয়োজন অনেক সবর, প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।

অতএব তাঁর দাসত্ব করো এবং তাঁর হুকুমমতো চলার জন্যে ধৈর্য অবলম্বন করো ও দৃঢ়তা গ্রহণ করো .... কারণ তিনিই হচ্ছেন একমাত্র সেই সত্ত্বা এই সৃষ্টির সব কিছু যাঁর আনুগত্য করে চলেছে এবং সবাই প্রকৃতিগতভাবে যাঁর মুখাপেক্ষী এবং সকল অন্তর যাঁর দিকে ঝুঁকে থাকে তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাঁর সমকক্ষ ক্ষমতাবান অন্য কোনো নাম তোমার জানা আছে কি?' অর্থাৎ তাঁর মতো আরো কেউ ক্ষমতাধিকারী আছে বলে কি তোমার জানা আছে? যতোপ্রকার গুণ মানুষের হতে পারে এবং যতো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে সব কিছু থেকেই তিনি উর্ধে।

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ
ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ
أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي
الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾

রুকু ৫

৬৬. (কিছু সংখ্যক মূর্খ) মানুষ বলে, (একবার) আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় (মাটির ভেতরে থেকে) পুনরুত্থিত হবো? ৬৭. (এ নির্বোধ) মানুষটি কি (একবারও) চিন্তা করে না, এর আগে তো আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি; অথচ সে তখন কিছুই ছিলো না। ৬৮. অতএব তোমার মালিকের শপথ, আমি অবশ্যই এদের একত্রিত করবো, (একত্রিত করবো) শয়তানদেরও, অতপর এদের (সবাইকে) হাঁটু গাড়া অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে এনে জড়ো করাবো। ৬৯. তারপর আমি অবশ্যই এদের প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি যারা সবচাইতে বেশী বিদ্রোহী (ছিলো), তাদের (খুঁজে খুঁজে) বার করে আনবো। ৭০. ওদের মধ্যে যারা (জাহান্নামে) নিক্ষিপ্ত হবার অধিকতর যোগ্য, আমি তাদের সবার চাইতে বেশী জানি। ৭১. (জাহান্নামে তোমাদের মধ্যে) এমন একজন ব্যক্তিও হবে না, যাকে এর ওপর দিয়ে পার হতে হবে না, এটা হচ্ছে তোমার মালিকের অমোঘ সিদ্ধান্ত। ৭২. (এ পার হওয়ার সময়) আমি শুধু ওসব মানুষদেরই পার করিয়ে নেবো যারা দুনিয়ার জীবনে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করেছে, (অবশিষ্ট) যালেমদের আমি নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো। ৭৩. তাদের সামনে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়েছে, তখন যারা (ঈমানের বদলে) কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলে (বলো তো), আমাদের উভয় দলের মাঝে কোন্ দলটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও কোন্ দলের মাহফিল বেশী শানদার! ৭৪. অথচ ওদের পূর্বে কতো (শানদার মাহফিলের অধিকারী) মানবগোষ্ঠীকে আমি নির্মূল করে দিয়েছি, যারা (আজকের) এ (কাফেরদের) চাইতে সহায় সম্পদ ও প্রাচুর্যের বাহাদুরীতে ছিলো অনেক শ্রেষ্ঠ!

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا
وَّأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ
الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ
بِـَٔايٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ
الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا
لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৭৫. (হে নবী, এদের) বলো, যে ব্যক্তি গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) থাকে, তাকে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা অনেক ঢিল দিতে থাকেন– যতোক্ষণ না তারা সে (বিষয়)-টি (স্বচক্ষে) প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে– হয় তা (হবে) আল্লাহ তায়ালার শাস্তি, নতুবা হবে কেয়ামত, (তেমন সময় উপস্থিত হলে) তারা অচিরেই একথা জানতে পারবে, কোন্ ব্যক্তিটি মর্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলো এবং কার জনশক্তি ছিলো দুর্বল! ৭৬. (এর বিপরীত) যারা হেদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন; (হে নবী,) তোমার মালিকের কাছে তো স্থায়ী জিনিস হিসেবে (মানুষের) নেক আমলই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার– পাবার দিক থেকে যেমন (তা ভালো), প্রতিদান হিসেবেও (তা তেমনি উত্তম)। ৭৭. তুমি সে ব্যক্তির অবস্থা লক্ষ্য করেছো কি– যে আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে এবং (ঔদ্ধত্যের সাথে) বলে বেড়ায়, (কেয়ামতের হলে সেদিন) আমাকে অবশ্যই (আমার) মাল ও সন্তান দিয়ে দেয়া হবে। ৭৮. সে কি গায়বের) কোনো খবর পেয়েছে? না দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (এ ব্যাপারে) সে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে! ৭৯. না (এর কোনোটাই নয়), যা কিছু সে বলে আমি তার (প্রতিটি কথাই) লিখে রাখবো এবং সে হিসেবেই (কেয়ামতের দিন) আমি তার শাস্তি বাড়াতে থাকবো, ৮০. সে (তার শক্তি সমর্থ সম্পর্কে আজ) যা কিছু বলছে আমিই হবো তার অধিকারী, আর সে একান্ত একাকী (অবস্থায়ই) আমার কাছে (ফিরে) আসবে। ৮১. এরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাবুদ বানায়, যেন এরা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হতে পারে, ৮২. কিন্তু না; (কেয়ামতের দিন বরং) এরা তাদের এবাদাতের কথা (সম্পূর্ণত) অস্বীকার করবে, এরা (তখন) তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ
جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ
الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ
عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

রুকু ৬

৮৩. (হে নবী,) তুমি কি (এ বিষয়টির প্রতি) লক্ষ্য করোনি, আমি (কিভাবে) কাফেরদের ওপর শয়তানদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, তারা (আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে) তাদের ক্রমাগত উৎসাহ দান করছে, ৮৪. অতএব, তুমি এদের (আযাবের) ব্যাপারে কোনো রকম তাড়াহুড়ো করো না; আমি তো এদের (চূড়ান্ত ধ্বংসের) দিনটিই গণনা করে যাচ্ছি, ৮৫. সেদিন আমি পরহেযগার বান্দাদের সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছে একত্রিত করবো, ৮৬. আর না-ফরমানদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত (উটের ন্যায়) তাড়িয়ে নিয়ে যাবো, ৮৭. (সেদিন) কোনো মানুষই আল্লাহ তায়ালার দরবারে সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা রাখবে না, হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে (তেমন কোনো) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে থাকে (তবে তা ভিন্ন কথা)। ৮৮. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, করুণাময় আল্লাহ তায়ালা সন্তান গ্রহণ করেছেন; ৮৯. (তুমি এদের বলো,) এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কথা, তোমরা যা (আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে) নিয়ে এসেছো, ৯০. (এটা এতো কঠিন কথা) যার কারণে হয়তো আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হবে, যমীন বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড়সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ৯১. (এর কারণ,) এরা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্যে সন্তান হওয়ার কথা বলেছে, ৯২. (অথচ) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালার জন্যে কোনো অবস্থায়ই শোভনীয় নয়। ৯৩. (কেননা) আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (কেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তার অনুগত (বান্দা) হিসেবে উপস্থিত হবে না; ৯৪. তিনি (তাঁর সৃষ্টির) সব কিছুকেই (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পূর্ণাংগ হিসাব রেখে দিয়েছেন; ৯৫. কেয়ামতের দিন এদের সবাই নিসংগ অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا

يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

৯৬. যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। ৯৭. আমি তো এ কোরআনকে তোমার ভাষায় সহজ (করে নাযিল) করেছি, যাতে করে তুমি এর দ্বারা– যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিতে পারো এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) যে জাতি (খামাখা) ঝগড়া করে, তুমি তাদেরও (এ দিয়ে) সাবধান করে দিতে পারো। ৯৮. তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এদের কোনোরকম অস্তিত্ব কি তুমি এখন অনুভব করো, না শুনতে পাও এদের কোনো ক্ষীণতম শব্দও?

তাফসীর
আয়াত ৬৬-৯৮

'আর মানুষ বলে, আমরা যখন মরে যাবো তখন কি আবারও আমাকে যিন্দা করে তোলা হবে? .... ওদের মধ্য থেকে কাউকে কি তুমি অনুভব করছো? অথবা কোনো মৃদু শব্দও কি শুনতে পাচ্ছ? (আয়াত ৬৬-৯৮)

এ সূরার আলোচ্য অংশের মধ্যে যাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে মারইয়াম ও ঈসা (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত তথ্যাদি, আলোচনা হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা ও পিতা থেকে তার পৃথক হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, আরো বর্ণিত হয়েছে তাদের কথা যারা পরবর্তীতে হেদায়াত গ্রহণ করেছে অথবা গোমরাহ হয়ে গেছে এবং এসব ঘটনাবলী শেষে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক মালিকের কর্তৃত্ব সম্পর্কে, যিনি নিরংকুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। এই হচ্ছে সেই আসল ও মহা সত্য যা সকল কাহিনী ও ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সকল দৃশ্য ও সবার পরিণতির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ সত্য।

আলোচ্য সূরার শেষ পাঠটির মধ্যে শেরক ও রোয হাশরের দিনে আবার যে যিন্দা হয়ে উঠতে হবে, সে সম্পর্কে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আর কেয়ামতের যে সব দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে মানব জাতির প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত তথ্য এমন জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে যে মনে হয় সে সব ঘটনা যেন চোখের সামনে বাস্তবে ঘটে চলেছে এবং এসব ঘটনার সাথে যেন গোটা সৃষ্টির সকল কিছু সহযোগিতা করে চলেছে; আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, মানুষ, জ্বিন, এ সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিরাজমান সকল মোমেন ও সকল কাফের ব্যক্তি সবাই যেন সে মহাসত্য কেয়ামতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সত্যকে বাস্তবায়নে সহায়তা করে চলেছে।

এরপর আলোচনার গতি ফিরে যাচ্ছে সেসব দৃশ্যের দিকে যা দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া ও আখেরাত পাশাপাশি এবং একটা আর একটার সাথে অংগাংগিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দুনিয়ার বুকে যে বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হয় এসবের ফল পাওয়া যাবে বা মীমাংসা হবে আখেরাতে। এই দুই জীবনের মধ্যে যে দূরত্ব বা পার্থক্য রয়েছে তা কিছু আয়াত বা কিছু শব্দের মাধ্যমে দূর হতে পারে না, অর্থাৎ এ পার্থক্য আছে এবং অবশ্যই থাকবে। এভাবে বুঝা যায় দুনিয়া ও আখেরাত এই দুই জগত একটা আর একটার সাথে পাশাপাশি লেগে আছে, একটার সাথে অন্যজগতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং একটা আর একটার সম্পূরক।

'মানুষ বলে, আমরা মরে যাওয়ার পর কি আবার যিন্দা হয়ে উঠবো? মানুষ কি স্মরণ করে দেখে না যে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন অবস্থা থেকে যখন তারা কিছুই ছিলো না সুতরাং, তোমার রবের কসম, অবশ্যই আমি তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একদিন একত্রিত করবো, তারপর জাহান্নামের চতুর্দিকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায়, আমি তাদেরকে জড় করবো। .... তারপর নাজাত দেবো তাদেরকে যারা ভয় করে চলেছে এবং যালেমদেরকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় ছেড়ে দেবো।' (আয়াত ৬৬-৭২)

কেয়ামতের ময়দানে পাপিষ্ঠদের ভয়াবহ অবস্থা

এখানে যে দৃশ্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে মানুষ সাধারণভাবে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে মানুষ এ মহা সত্য সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছে। এতে বুঝা যায় সকল যুগে কিছু কিছু মানুষ রোয হাশর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং নানা প্রকার আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'মানুষ বলে, আমরা যখন মরে সাফ হয়ে যাবো, তখন আমরা কি আবারও কি যিন্দা হয়ে উঠবো?'

এ প্রশ্নের মূলে রয়েছে পুনরুত্থান সম্পর্কে মানুষের প্রচন্ড অজ্ঞতা ও ভীষণ ঔদাসিণ্য। কিন্তু তারা এই আপত্তি তোলার সময় একবারও চিন্তা করে দেখে না যে তারা কোথায় ছিলো এবং কেমন ছিলো? তাদের আদৌ কোনো অস্তিত্ব না থাকা অবস্থা থেকে তো তাদেরকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে। যে মহাশক্তিমান প্রকৌশলীর পক্ষে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, তার পক্ষে সৃষ্টির বুকে লুকিয়ে থাকা অণু পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় অস্তিত্ব দান করা মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়– একথা যে কোনো চিন্তাশীল লোক সহজে বুঝতে পারে, কারণ প্রথম সৃষ্টি কাজটা করা থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্রিয়া অবশ্যই সহজ। একটু খেয়াল করলেই একথা সহজে মানুষের বোধগম্য হবে। তাই আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন, বলছেন,

'মানুষ কি একবার স্মরণ করে দেখে না যে তাকে আমি সেই অবস্থা থেকে অস্তিত্বে এনেছি যখন সে কিছুই ছিলো না?'

তারপর আল্লাহ তায়ালা, তাদের এই অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে এবং তাদেরকে আযাবের ধমকি দিতে গিয়ে তাঁর নিজ সত্ত্বার কসম খেয়ে বলছেন, যে অবশ্যই তাদেরকে সুনির্দিষ্ট একটি দিনে একত্রিত করা হবে– অর্থাৎ, তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে অণু-পরমাণুগুলোকে একত্রিত করে দ্বিতীয়বার তাদেরকে জীবিত করে তোলার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে একত্রিত করবো।'

অর্থাৎ তারা পৃথক পৃথক থাকবে না, বরং একত্রিত করবো তাদের সবাইকে একটি বিশাল প্রান্তরে

'এবং শয়তানদেরকেও।'

আসলে অস্বীকৃতির দিক দিয়ে তারা ও শয়তানেরা একই সমান, কারণ তারাই শয়তান যারা এ মহা সত্যকে অস্বীকার করে এবং অপরের মধ্যে ওয়াসওসা সৃষ্টি করে। তারা নিজেরাতো গোমরাহ হয়েছেই অপরকেও গোমরাহ হতে প্ররোচিত করে। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পয়দা হয় অনুসারী ও অনুসৃত হওয়ার কারণে– তাদের একদল হচ্ছে পরিচালক, অপর দল পরিচালিত।

এখানে সে অপরাধীদের দারুন এক চিত্র আঁকা হচ্ছে। দেখুন ওরা কেমন হীনতা দীনতার সাথে জাহান্নামের চতুর্দিকে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে এনে নতজানু অবস্থায় জড় করবো।'

এ এক ভয়াবহ চিত্র অসংখ্য মানুষ উপস্থিত থাকবে বিশাল এ সমাবেশে। এরা অপরাধের গ্লানি মাথায় নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় থাকবে। তীব্র উত্তপ্ত ওই স্থান থেকে কিছুতেই তারা সরে যেতে পারবে না। ওই ভয়াবহ তাপে তাদের গোটা দেহ ঝলসে যেতে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হবে যে তাদেরকে এখনই ছুঁড়ে ফেলা হবে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা সে জাহান্নামের আগুনে। ভয় ও অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে সে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকায় হাঁটু গেড়ে তারা প্রহর গুণতে থাকবে............।

এটাই হবে অহংকারী ও মানুষের ওপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণীর মানুষদের জন্যে সেদিনকার করুন ও অপমানকর দৃশ্য। এদের মধ্যে যারা অধিক অহংকারী ও মানুষের ওপর জবরদস্তিকারী তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলার দৃশ্য হবে আরো আরো হৃদয়বিদারক। দেখুন সে দৃশ্যের বর্ণনা কিভাবে পেশ করা হচ্ছে,

'তারপর প্রত্যেক দল থেকে টেনে হিঁচড়ে সে হতভাগাদের বের করে নেবো, যারা ছিলো দয়াময় আল্লাহ তায়ালার প্রতিবেশী বিদ্রোহী। ওদের কথা বলতে গিয়ে এবং ওদের অবস্থার ছবি আঁকতে গিয়ে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা এতোই কঠোর এবং তীব্র রোষে পরিপূর্ণ যে কর্ণকুহরে সে শব্দগুলো এক অকল্পনীয় আতংক জাগায়, বিশেষ করে জাহান্নামে পতনের পূর্বে দলের মধ্য থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনার ওই কঠিন দৃশ্যের বর্ণনা, আর তারপর রয়েছে আগুনে ছুঁড়ে ফেলার ভয়ংকর চিত্র। এভাবে ওদেরকে ছুঁড়ে ফেলার কথাকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে তাদের শাস্তির পূর্ণাংগতা বিধান করা হবে!

অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীনই জানেন ওদের মধ্যে কোন কোন গ্রুপকে সর্বাগ্রে আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে। এখানে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদেরকে সে অগণিত জনতার ভীড় থেকে আগুনে ফেলার জন্যে হঠাৎ করে এবং অপরিকল্পিতভাবে বের করে আনা হবে তা নয়, ওই চরম অপরাধীরা একে একে চিহ্নিতাবস্থায় বহিষ্কৃত হবে এবং সে ভয়াবহ আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

'আমিই সবচেয়ে ভালোজানি যে, জাহান্নামে দগ্ধ হবার জন্যে কারা বেশী উপযুক্ত।' অহংকারী কাফেরদেরকেই জাহান্নামে আগে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে মোমেনরা সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য অবলোকন করবে মাত্র।

'তোমাদের কেউই জাহান্নামের কাছে যেতে বাকী থাকবে না। এটা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত ফয়সালা।'

অর্থাৎ মোমেনরাও জাহান্নামের কাছে যাবে, তার কাছে দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার ভয়াবহ দহন-ক্রিয়া ও তাতে আল্লাহদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত হওয়ার দৃশ্য দেখতে থাকবে। 'অতপর আল্লাহভীরুদের আমি মুক্তি দেবো।'

অর্থাৎ জাহান্নামকে তাদের কাছ থেকে দূরে রাখা হবে এবং তারা তা থেকে অব্যাহতি পাবে।

'আর যলেমদের তার ভেতরে যন্ত্রণা ভোগ করতে রেখে দেবো।'

মোমেন ও কাফেরদের বিপরিতমুখী অবস্থান

আল্লাহর অবাধ্যদের এই লাঞ্ছনাময় ও অবমাননাকর যন্ত্রণা ভোগ করার ভয়াবহ দৃশ্য এবং আল্লাহভীরুদের তা থেকে মুক্তি লাভের দৃশ্য তুলে ধরার পর তাদের পার্থিব জীবনের একটা ভিন্ন রকম দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। এটা হলো মোমেনদের ওপর কাফেরদের দম্ভ প্রকাশ, নিজেদের ক্ষণস্থায়ী বিত্তবৈভবের জন্যে অহংকার ও বড়াই এবং মোমেনদের দারিদ্র ও অভাব অনটনের জন্যে তাদেরকে ধিক্কার দেয়ার দৃশ্য,

'তাদের সামনে যখন আমার আয়াতগুলোকে স্পষ্টভাবে পাঠ করা হয় তখন কাফেররা মোমেনদেরকে বলে, এই দু'দলের মধ্যে কারা উৎকৃষ্টতর জীবন মানের অধিকারী এবং কারাই বা উৎকষ্টতর সমাজের অধিবাসী?'

একদিকে বিপুল জাঁকজমক, শান শওকত ও বিলাবহুল জীবন যাপন করে দোর্দণ্ড প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত বিত্তশালী লোকেরা অপ্রতিহত গতিতে যুলুম দুর্নীতি ও স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে তারই পাশাপাশি অবস্থান করছে মুসলমানদের জাঁকজমকহীন ও দারিদ্র পীড়িত সমাজ, যাদের হাতে ঈমানদারী ও সততা ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই, তাদের না আছে অঢেল অর্থ, না আছে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং না আছে ক্ষমতার দৌরাত্ম্য ও আধিপত্য, এই দুই ধরনের সমাজ এই পৃথিবীতে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

প্রথম গোষ্ঠীটার রয়েছে অত্যন্ত বড় বড় ও জাঁকালো সম্পদ সম্পত্তি, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা। ওই সম্পদ সম্পত্তি ও পদমর্যাদাকে সংরক্ষণ ও কার্যকর করনের নিমিত্তে রয়েছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও বিপুল ভোগ বিলাসের উপকরণ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় গোষ্ঠীটা চরম দরিদ্র ও অভাবী। ক্ষমতার দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিত্ত বৈভবের অভাবের কারণে তারা ব্যাংগ বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র। তারা কোনো পার্থিব ধন ঐশ্বর্য, স্বার্থ বা শাসকদের নৈকট্য, আনুকুল্য ও শুভ দৃষ্টি লাভের জন্যে মানুষকে আহ্বান জানায় না। তারা আহ্বান জানায় ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও নীতি আদর্শের দিকে যা সর্ব প্রকারের সাজ সজ্জা, জাঁকজমক ও পার্থিব স্বার্থ থেকে বঞ্চিত থেকেই অর্জন করতে হয়। এ আদর্শ লাভ করা আর কারো কাছ থেকে নয়, বরং শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই সম্মান ও মর্যাদা লাভের আশা করা যায়। বরং এ আদর্শ তাদেরকে দুঃখ কষ্ট, সংগ্রাম ও শত্রুর গোয়ার্তুমির মোকাবেলা করতে বাধ্য করে। অথচ এসবের জন্যে ইহকালীন জীবনে তাকে প্রতিদানও দিতে পারে না। এর প্রতিদান হিসেবে সে পায় আল্লাহর নৈকট্য ও আখেরাতের বিপুল পুরস্কার।

রসূল (স.)-এর যুগে কোরায়শ নেতাদের সামনে যখন কোরআন পড়া হতো, তখন তারা দরিদ্র মোমেনদেরকে বলতো, দু'দলের মধ্যে কারা উচ্চতর মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতর বিলাস ব্যসনের অধিকারী?' অর্থাৎ যেসব বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর ঈমান আনেনি, তারা, না মোহাম্মদ (স.) চার পাশে সমবেত দরিদ্র লোকগুলো? এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনোটি অধিকতর মর্যাদাবান এবং কোন দলে সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা রয়েছে। নাযার ইবনুল হারেস, আমর ইবনে হিশাম, (আবু জাহল) ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং তাদের সমমনারা, না বেলাল, আম্মার, খাব্বাব এবং তাদের সর্বহারা দ্বীনী ভাইয়েরা? মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াত যদি ভালোই হতো, তাহলে তার অনুসারী এই দরিদ্র লোকগুলো হবে কেন, যাদের কোরায়শ সমাজে কোনোই গুরুত্ব নেই? কেনই বা তারা খাব্বাবের মতো দরিদ্র লোকের বাড়ীতে জমায়েত হয় আর তাদের বিরোধীরা বড় বড় জৌলুসপূর্ণ সভা-সমিতি ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী কেন হয়?

এ হচ্ছে বস্তুবাদীজগতের খোঁড়া যুক্তি। উচ্চতর জগতের ব্যাপারে যাদের কোনোই ধারণা নেই, তাদের যুক্তি সর্বকালে ও সর্বত্র এ রকমই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ

সম্পর্কে আল্লাহর প্রাজ্ঞ নীতি হলো, তা সর্ব প্রকারের বাহ্যিক সাজ-সজ্জা ও আকর্ষণ থেকে এবং সর্ব প্রকারের প্রলুব্ধকারী উপকরণসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে, যাতে এ আদর্শকে যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মনেপ্রাণে একনিষ্ঠভাবে কামনা করে তারাই গ্রহণ করে, গ্রহণ করে সব ধরনের পার্থিব স্বার্থ ও মোহ বিসর্জন দিয়ে। অপরদিকে পার্থিব স্বার্থ ও লাভের প্রত্যাশীরা এবং বিলাস ব্যসন, বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহ ও ধনৈশ্বর্যের অভিলাষীরা এর কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

পরবর্তী আয়াতে নিজের ধনৈশ্বর্যের গর্বে গর্বিত কাফেরদের উল্লেখিত দম্ভোক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এ মন্তব্যে তাদেরকে অতীতের বিপুল বিত্তশালী ও প্রাচুর্যবান কাফেরদের ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি তাদের পূর্বে এমন বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের চেয়ে অধিকতর সম্পদশালী ও ঐশ্বর্যশালী ছিলো।' আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে ধ্বংস করার ফয়সালা করলেন, তখন তাদের ধনৈশ্বর্য তাদের ধ্বংসকে রোধ করতে পারেনি।

অতীতকে ভুলে যাওয়া মানুষের অভ্যাস। যদি সে মনে রাখতো এবং চিন্তা করতো, তাহলে অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী তাদেরকে সতর্ক ও সচকিত করতো। ধনে জনে তাদের চেয়ে শক্তিশালী অতীতের জাতিগুলো যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তা তাদের উদাসীনতা দূর করে দিতে পারতো এবং তারা তাদের অপকর্মগুলো অব্যাহত রাখতো না।

এই মনোযোগ আকর্ষণমূলক মন্তব্যের পর পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ দেন যে, কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে যে দলটা বিপথগামী, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে আরো বেশী করে বিপথগামী করেন। অবশেষে একদিন তারা দুনিয়ায় বা আখেরাতে তাদের প্রতিশ্রুত পরিণতি দেখতে পাবে।

'বলো, যে দল বিপথগামী, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে আরো বেশী অবকাশ দেন ......'। (আয়াত ৭৫-৭৬)

তারা দাবী করে যে, তারা মোহাম্মদ (স.)-এর অনুসারীদের চেয়ে বেশী সুপথগামী। কেননা তারা অধিকতর বিত্তশালী ও প্রতাপশালী। বেশ, তারা ধনবান ও প্রতাপশালী থাকুক। আর মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর কাছে দোয়া করুক যে, উভয় দলের মধ্যে যে দল বিপথগামী, তাদেরকে তিনি আরো বিপথগামী করুন। আর যারা সুপথগামী, তাদেরকে আরো সুপথগামী করুন, যতোক্ষণ না তাদের জন্যে প্রতিশ্রুত আযাব সংঘটিত হয়। বিপথগামীদের এই আযাব দুনিয়াতে মোমেনদের হাতেও সংঘটিত হতে পারে, আবার তা কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতম আযাব দিয়েও হতে পারে। সেই আযাবের সম্মুখীন হলেই তারা বুঝবে কোন দল নিকৃষ্টতর এবং দুর্বলতর। সেই দিন মোমেনরা খুশী হবে সম্মানিত হবে।

'আর চিরস্থায়ী সৎকর্মগুলো তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রতিদানের দিক দিয়েও উত্তম, লাভের দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ।'

অর্থাৎ বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দুনিয়াদাররা যেসব জিনিস নিয়ে দম্ভ করে, তার চেয়ে উত্তম।

পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের আরো এক ধরনের ধৃষ্টোক্তির উল্লেখ ও পর্যালোচনা করে তার প্রতি বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে,

'আমার আয়াতগুলোকে যে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমাকে অবশ্যই সন্তান ও ধন সম্পদ দান করা হবে তাকে কি তুমি দেখেছো? ....' (আয়াত ৭৭)

এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) বলেন, 'আমি একজন কামার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা ছিলো। তার কাছে পাওনা আদায় করতে গেলে সে বললো, 'তুমি মোহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা দেবো না।' আমি বললাম, আল্লাহর কসম, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি মোহাম্মদ (স.)-কে অস্বীকার করবো না। সে বললো, আমি যদি মরে আবার জীবিত হই, তাহলে তখন আমার কাছে এসো। তখন আমার অনেক সন্তান ও ধন সম্পদ হবে। তখন আমি তোমার পাওনা দিয়ে দেবো।' তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

আসলে আ'স ইবনে ওয়ালের এই উক্তি কাফেরদের দম্ভ ও আখেরাতকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টারই নমুনা। কোরআন তার এই মনোভাবের বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং তার দম্ভোক্তির নিন্দা করেছে।

'সে কি অদৃশ্য জেনে ফেলেছে?'

অর্থাৎ সেখানে তার জন্যে কী পরিণতি অপেক্ষা করছে, তা কি সে জেনে ফেলেছে?

'নাকি সে দয়াময়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে?'

আর এই প্রতিশ্রুতি লাভের সুবাদেই কি সে আস্থাশীল যে, সে সন্তান ও সম্পদ লাভ করবে?

'কখনো নয়!' অর্থাৎ সে অদৃশ্যও জানতে পারেনি এবং আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অংগিকারও আদায় করেনি।' বরঞ্চ সে কুফরী ও ব্যংগ বিদ্রূপে লিপ্ত।' এই হুমকি ও সতর্কবাণী হঠকারী কাফেরদেরকে শিক্ষা দানের জন্যে যথার্থ উপযোগী।

'কখনো নয়। তার উক্তি আমি লিখে রাখবো এবং তার আযাব আরো বাড়িয়ে দেবো।'

অর্থাৎ তার উক্তিকে হিসাবের দিনের জন্যে লিপিবদ্ধ করে রাখবো, ফলে তা ভুলে যাওয়াও যাবে না এবং কোনো ভুল বুঝাবুঝির অবকাশও থাকবে না। এ উক্তিটাতে আসলে হুমকির একটা দৃশ্যমান রূপ তুলে ধরা হয়েছে। নচেত ভুল বুঝাবুঝি এমনিতেই অসম্ভব। আল্লাহর জ্ঞান যে কোনো ছোট বড় জিনিসকে নিজের আওতাধীন রাখে। 'আর তার আযাব বাড়িয়ে দেই।' অর্থাৎ তাকে চিরস্থায়ী করে দেই এবং কখনো বন্ধ করি না।

'আর আমি তার কথাবার্তার উত্তরাধিকারী হই।'

এ আয়াতে হুমকিকে অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং তা ছবি দেখানোর ভংগিতে। অর্থাৎ নিজের যে সব ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির কথা সে বলে থাকে, তা থেকে সে যতোখানি রেখে যায়, তা আমি গ্রহণ করি, ঠিক যেমন উত্তরাধিকারী গ্রহণ করে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে 'এবং আমার কাছে সে একাকীই আসে।' অর্থাৎ সহায় সম্পদ, সন্তানাদি ও সাহায্যকারী ছাড়াই একেবারে একাকী, দুর্বল ও অসহায়ভাবে আসে।

বলা হয়েছে যে, যে আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, আসলে এমন একটা দিনের অপেক্ষা করে, যে দিনে তার কাছে কিছুই থাকবে না এবং তার কাছ থেকে তার যাবতীয় ইহলৌকিক সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে সেই ব্যক্তিকে কি তুমি দেখেছো। সে আসলে কাফেরের একটা নমুনা। তার আচরণ কাফের কুদম্ভ ও ধৃষ্টতার নমুনা।

এরপর কাফের ও শেরকের বৈশিষ্ট্যগুলোর পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে,

'তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করলো যাতে তারা তাদের সম্মানকারী হয়।' (আয়াত ৮১-৮৭)

অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকারকারী এইসব লোক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে সম্মান, সাহায্য ও বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে কেউবা ফেরেশতাদেরকে, কেউবা জ্বিনদেরকে পূজা করে তাদের কাছ থেকে সাহায্য ও শক্তি লাভের আশায়। অথচ সে আশা কখনো পূর্ণ হবার নয়। কেননা জ্বিনেরা ও ফেরেশতারা তাদের পূজা উপাসনাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে এবং আল্লাহর কাছে এ সবের দায় দায়িত্বও অস্বীকার করবে এবং তারা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান ও তাদের দায় দায়িত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

শয়তানদের গোষ্ঠী মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত হবার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাদের ওপর শয়তানদের আধিপত্য বিস্তৃত থাকে এবং তাদের ব্যাপারে ইবলীসের অবাধ ক্ষমতা লাভের পর থেকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'অতএব, তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না।'

তাদের ব্যাপারে তুমি বিব্রত বোধ করো না। কেননা তাদেরকে সীমিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে, তাদের প্রতিটা কাজের হিসাব নেয়া হবে, তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের রেকর্ড রাখা হচ্ছে। এখানে এমন শব্দ চয়ন করা হয়েছে, যা কেয়ামতের হিসাব নিকাশের নিপুণতা ও সূক্ষ্মতার ছবি এঁকে দেখায়, 'আমি তাদের সব কিছু গুণে রাখি।' বস্তুত এক আতংকজনক দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যার গুনাহ গুণে গুণে রাখেন, তার পরিণতি যে কেমন ভয়াবহ হতে পারে এবং তার হিসাব-নিকাশ যে কতো কঠিন হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তার ইহকালীন নেতা বা প্রভু তার কার্যকলাপ নিজেই সরাসরি তদারক করেন, সে সর্বদা ভয়ে তটস্থ থাকে এবং তার প্রতিটা মুহূর্ত কাটে প্রচন্ড উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায়। আর মহা পরাক্রান্ত তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যদি ওই ভূমিকা পালন করেন, তা হলে উপায়?

যে কথা শুনে আসমান যমীন ক্রোধে ফেটে পড়ে

এরপর কেয়ামতের একটা দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিসাব নিকাশের শেষ ফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমে মোমেনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

'যেদিন আমি আল্লাহভীরুদেরকে দয়াময়ের কাছে সংঘবদ্ধভাবে একত্রিত করবো...... পক্ষান্তরে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আমি পশুর পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাবো,

'আমি অপরাধীদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো জাহান্নামের দিকে।'

সৎ কাজ করে যাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা ছাড়া আর কোনোভাবেই সেদিন কোনো সুপারিশ করানো যাবে না। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উপযুক্ত পুরস্কার দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা কখনো ওয়াদা ভংগ করেন না।

এরপর পুনরায় মোশরেকদের একটা জঘন্য উক্তির সমালোচনা করা হয়েছে। আরবের মোশরেকরা বলতো, ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। ইহুদী মোশরেকরা বলতো, ওয়ায়ের আল্লাহর ছেলে। খৃষ্টান মোশরেকরা বলে থাকে, ঈসা মসীহ আল্লাহর ছেলে। এ কথাটা এতো ঘৃণ্য যে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি এ উক্তিতে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ও বিস্ফোরনোন্মুখ এবং স্বতস্ফূর্তভাবেই ঘৃণা প্রবণ,

'তারা বলে, দয়াময় একজন সন্তান গ্রহণ করেছেন.........'। (আয়াত ৮৮-৯২)

এ আয়াতগুলোর প্রতিটা শব্দের ঝংকার প্রকৃতির ক্রোধোদ্দীপ্ত পরিবেশটাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছে। কোনো মানুষ নিজে বা তার প্রিয় কোনো ব্যক্তি অপমানিত হলে যেমন

রেগে যায় এবং তার প্রতিটা অংগ প্রত্যংগ ক্রোধে ফুলতে ও কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহর সন্তান গ্রহণ সংক্রান্ত জঘন্য উক্তি শুনে বিশ্ব প্রকৃতিও রাগে ও ক্ষোভে কেঁপে উঠে, কেননা এতে মহান আল্লাহর প্রচন্ড অবমাননা হয় প্রকৃতির এই রাগ ও ক্ষোভে আকাশ, পৃথিবী পাহাড় পর্বত ইত্যাদি সবই অংশ নেয়। প্রকৃতির এই রাগ ও ক্ষোভজনিত কম্পন এ আয়াতগুলোর শব্দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেই ঘৃণ্য কথাটা যেই বলা হলো, 'তারা বলে, দয়াময় একজন সন্তান গ্রহণ করেছেন, অমনি এই আতংকজনক কথাটাও সাথে সাথেই উচ্চারিত হলো, নিশ্চয় তোমরা একটা জঘন্য কাজ করে ফেলেছো।' এরপর তাদের আশপাশের প্রতিটি নিশ্চল জিনিস কেঁপে ওঠে এবং সমগ্র প্রকৃতি তার স্রষ্টার অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সে টের পায় যে, এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার বিবেক ও প্রকৃতির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে,

'এতে যেন আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হয়ে যাবে এবং পবর্তমালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়বে। কেননা তারা দয়াময় আল্লাহর ওপর সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপ করেছে।'

এই প্রাকৃতিক রুদ্র রোষের মাঝেই উচ্চারিত হয় ভয়াবহ বক্তব্য,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা দয়াময় আল্লাহর কাছে অনুগত দাস হিসেবে আসবে। তিনি তাদের সবাইকে গুণে গুণে রেখেছেন। তাদের সকলেই কেয়ামতের দিন তার কাছে একাকী আসবে।'

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সবাই তার দাস এবং তারা আপন মনিবের কাছে অনুগত বান্দা হিসেবেই আসবে। কোনো সন্তান বা অংশীদার হিসেবে নয় বরং সৃষ্টি ও দাস হিসেবেই আসবে।

'তিনি তাদেরকে গুণে গুণে রেখেছেন'

এই বক্তব্য উপলব্ধি করলে মানুষ মাত্রেই প্রকম্পিত হয়। কারোই আর পালাবার বা ভুলে থাকার অবকাশ নেই। তাদের প্রত্যেকেই একাকী আসবে কেয়াতের দিন। প্রত্যেকের ওপর আল্লাহর কড়া দৃষ্টি থাকবে। প্রত্যেকে একাকী আসবে। ফলে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত বা সম্মানিত হবে, এমন অবকাশ থাকবে না। এমনকি সংঘবদ্ধ হওয়ার বা দল ভুক্ত হওয়ার চেতনাই দূর করে দেয়া হবে। এভাবে সে মহান আল্লাহর কাছে একাকীই উপস্থিত হবে।

এই ভয়ংকর একাকীত্বের পরিবেশে সহসা মোমেন বান্দাদের প্রীতিসিক্ত পরিবেশে নিয়ে আসা হয়েছে,

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।'

এ ভালোবাসা প্রথমে সর্বোচ্চ ফেরেশতাদের মধ্যে জন্ম নেয় এবং তারপর সেখান থেকে মানুষের ভেতরে চলে আসে, তারপর তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, হে জিবরীল, আমি অমুককে ভালোবাসি। কাজেই তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরীল তাকে ভালোবাসে। তারপর তিনি আকাশবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুককে ভালোবেসেছেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসে। অতপর পৃথিবীতে সে জনপ্রিয় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি। কাজেই তুমিও তাকে ঘৃণা করো। তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা

করেন। অতপর তিনি আকাশবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুককে ঘৃণা করেন কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। তখন আকাশবাসী তাকে ঘৃণা করে। অতপর সে পৃথিবীতেও ঘৃণিত হয়ে যায়। (বোখারী, মুসলিম, আহমদ)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহভীরু মোমেনদের জন্যে এই সুসংবাদ এবং বিদ্রোহীদের জন্যে উক্ত সতর্কবাণী ও হুমকি এই দুটোই কোরআনের মূল মর্মবাণী। আল্লাহ তায়ালা একে আরবী ভাষায় নাযিল করে আরবদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন যাতে তারা কোরআন অধ্যয়ন করে।

'আমি এই কোরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি..........'। (আয়াত ৯৭)

অতপর এমন একটা দৃশ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সূরার সমাপ্তি ঘটানো হচ্ছে, যা নিয়ে মানুষ দীর্ঘদিন চিন্তা ভাবনা করতে পারে। চেতনা দীর্ঘ সময় তাদের কম্পমান থাকতে পারে এবং এর পর্যালোচনা থেকে মন এক মুহূর্তও নিরস্ত থাকে না,

'তাদের পূর্বে বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি'। (আয়াত ৯৮)

এ দৃশ্য পাঠককে প্রথমে কাঁপিয়ে তোলে। তারপর গভীর নীরবতায় ডুবিয়ে দেয়। মনে হয় যেন তা তাকে ধ্বংসের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জগত যেন দৃষ্টির সীমার বাইরে বিরাজমান তার কল্পনা যেন চলমান জগতের সাথে এবং চলমান জীবনের সাথে ভেসে চলে। তার কল্পনা যেন জীবন্ত আশা আকাংখার বিমূর্ত রূপ। তারপর সেখানে আসে নিস্তব্ধতা, আসে মৃত্যু, দেখা যায় লাশের ছড়াছড়ি, বিরাজ করে ধ্বংসাবশেষ। আর কোনো সাড়া শব্দ যেন পাওয়া যায় না সেখানে।

'তুমি কি তাদের মধ্য থেকে কারো কোনো সাড়া পাও অথবা কোনো ক্ষীণতম শব্দ শুনতে পাও!'

কান পেতে শোনো। দেখবে গভীর নীরবতা ও ভয়াল নিস্তব্ধতা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। সেখানে চিরঞ্জীব অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নেই।

সূরা ত্বাহা

আয়াত ১৩৫ রুকু ৮

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ۚ ۞ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۞ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۞

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۞ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

اسْتَوٰى ۞ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ

الثَّرٰى ۞ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۞ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۞ وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۞ اِذْ رَاٰ

نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ

اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ۞ اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. ত্বা-হা, ২. (হে নবী,) আমি (এ) কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দ্বারা) কষ্ট পাবে, ৩. এ (কোরআন) তো হচ্ছে বরং (কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার) একটি (উপায় ও) নসীহত মাত্র— সে ব্যক্তির জন্যে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, ৪. (এ কেতাব) তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন; ৫. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা মহান আরশে সমাসীন হলেন। ৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, যা কিছু আছে এ দুয়ের মাঝখানে এবং যমীনের অনন্ত গভীরে, তা (সবই) তাঁর জন্যে। ৭. (হে মানুষ,) তুমি যদি জোরে কথা বলো তা (যেমন) তিনি শুনতে পান, (তেমনি) গোপন কথা— (বরং তার চাইতেও গোপন যা) তাও তিনি জানেন। ৮. আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, যাবতীয় উত্তম নাম তাঁর জন্যেই (নিবেদিত)। ৯. (হে নবী,) তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে? ১০. (বিশেষ করে সে ঘটনাটি—) যখন সে (দূরে) আগুন দেখলো এবং তার পরিবারের লোকজনদের বললো, তোমরা (এখানে অপেক্ষায়) থাকো, আমি সত্যিই কিছু আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত তা থেকে কিছু আগুনের টুকরো আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবো, কিংবা তা দ্বারা আমি (পথঘাট সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ পেয়ে যাবো! ১১. অতপর সে যখন সে স্থানে পৌঁছুলো তখন তাকে আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা; ১২. নিশ্চয়ই আমি, আমিই হচ্ছি তোমার

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ
لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ وَمَا
تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا
عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا
هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾

মালিক, তুমি তোমার জুতো দুটো খুলো ফেলো, কেননা তুমি এখন পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় (দাঁড়িয়ে) আছো; ১৩. আমি তোমাকে (নবুওতের জন্যে) বাছাই করেছি, অতএব যা কিছু তোমাকে এখন ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে তা মনোযোগের সাথে শোনো। ১৪. আমিই হচ্ছি আল্লাহ তায়ালা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, অতএব তুমি শুধু আমারই এবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠা করো। ১৫. কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি (এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) তা গোপন করে রাখতে চাই, যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়। ১৬. যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস করে না এবং যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে ওতে বিশ্বাস স্থাপন থেকে কখনো বাধা দিতে না পারে, (এমনটি করলে) অতপর তুমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে, ১৭. হে মূসা (বলো তো), তোমার ডান হাতে ওটা কি? ১৮. সে বললো, এটি হচ্ছে আমার (হাতের) লাঠি, আমি (কখনো কখনো) এর ওপর ভর দিই, আবার কখনো তা দিয়ে আমি আমার মেষের জন্যে (গাছের) পাতা পাড়ি, তা ছাড়াও এর মধ্যে আমার জন্যে আরো অনেক কাজ আছে। ১৯. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, তুমি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করো। ২০. অতপর সে তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা সাপ হয়ে (এদিক ওদিক) ছুটাছুটি করতে লাগলো। ২১. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে মূসা), তুমি একে ধরো, ভয় পেয়ো না। (দেখবে) আমি এখনই তাকে তার আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে আনছি। ২২. (হে মূসা, এবার) তুমি তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, অতপর (দেখবে) কোনো রকম (অসুখজনিত) দোষত্রুটি ছাড়াই তা নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে, এ হচ্ছে (আমার) পরবর্তী নিদর্শন। ২৩. (এগুলো এ

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ
اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾
يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ
اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾
اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا
عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾ اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي
التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ
وَعَدُوٌّ لَّهٗ ۗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ ﴿٣٩﴾

জন্যে দেয়া হলো যেন) আমি তোমাকে আমার (কুদরতের আরো) বড়ো বড়ো নিদর্শন দেখাতে পারি। ২৪. (হাঁ, এবার এগুলো নিয়ে) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, কেননা সে (নিজেকে মাবুদ দাবী করে মারাত্মক) সীমালংঘন করে ফেলেছে।

রুকু ২

২৫. সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও , ২৬. আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও, ২৭. আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, ২৮. যাতে করে ওরা আমার কথা (ভালো করে) বুঝতে পারে, ২৯. আমার আপনজনদের মধ্য থেকে (একজনকে) আমার সাহায্যকারী বানাও, ৩০. হারূন হচ্ছে আমার ভাই (তাকেই বরং তুমি আমার সহযোগী বানিয়ে দাও), ৩১. তার দ্বারা তুমি আমার শক্তি বৃদ্ধি করো, ৩২. তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দাও, ৩৩. যাতে করে আমরা (উভয়ে মিলে) তোমার অনেক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি, ৩৪. তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি; ৩৫. নিশ্চয়ই তুমি আমাদের (কার্যক্রমের) সম্যক দ্রষ্টা। ৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা, তুমি যা কিছু চেয়েছো তা (সবই) তোমাকে দেয়া হলো। ৩৭. আমি তো এর আগেও (অলৌকিকভাবে তোমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে) তোমার ওপর আরেকবার অনুগ্রহ করেছিলাম, ৩৮. যখন আমি তোমার মায়ের কাছে একটি ইংগিত পাঠিয়েছিলাম, (আসলে) সে (বিষয়টি) ইংগিত করে বলে দেয়ার মতো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ই ছিলো, ৩৯. (সে ইংগিত ছিলো,) তুমি তাকে (ফেরাউনের লোকদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্যে জন্মের পর একটি) সিন্দুকের ভেতরে রেখে দাও, অতপর তাকে (সিন্দুকসহ) নদীতে ভাসিয়ে দাও, যেন নদী তাকে (ভাসাতে ভাসাতে) তীরে ঠেলে দেয়, (আমি জানি,) একটু পরই তাকে উঠিয়ে নেবে– (এমন এক ব্যক্তি, যে) আমার দুশমন এবং তারও দুশমন; (হে মূসা,) আমি আমার কাছ থেকে (ফেরাউন ও অন্য মানুষদের মনে) তোমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, যেন তুমি আমার চোখের সামনেই বড়ো হতে পারো।

إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ
أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ
وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ
يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا
فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن
يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا
رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ

৪০. যখন তোমার বোন চলতে থাকলো এবং (এখানে এসে ফেরাউনের লোকজনদের) বললো, আমি কি তোমাদের একথা বলে দেবো যে, কে এর লালন পালনের ভার নিতে পারবে (তারা রাযী হয়ে গেলো)। এভাবেই আমি তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে (তার কোলেই) ফিরিয়ে আনলাম, যাতে করে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং (তোমাকে হারিয়ে) সে যেন চিন্তাক্লিষ্ট না হয়; স্মরণ করো, যখন তুমি একজন মানুষকে হত্যা করলে, তখন আমি (হত্যাজনিত সেই) মানসিক যন্ত্রণা থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম, (এ ছাড়াও) তোমাকে আমি আরো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতপর তুমি বেশ কয়েকটি বছর মাদইয়ানবাসীদের মাঝে কাটিয়ে এলে! এরপর হে মূসা, একটা নির্ধারিত সময় পরেই তুমি (আজ) এখানে এসে উপস্থিত হলে। ৪১. আমি (এই দীর্ঘ পরীক্ষা দ্বারা) তোমাকে আমার নিজের (কাজের) জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। ৪২. আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে তুমি ও তোমার ভাই (এবার ফেরাউনের কাছে) যাও, (তবে) কখনো আমার যেকেরের মাঝে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, ৪৩. তোমরা দু'জনে (অবিলম্বে) ফেরাউনের কাছে চলে যাও, কেননা সে মারাত্মকভাবে সীমালংঘন করেছে, ৪৪. (হেদায়াত পেশ করার সময়) তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে অথবা সে (আমায়) ভয় করবে। ৪৫. তারা বললো, হে আমাদের মালিক, আমরা ভয় করছি সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে, কিংবা সে (আরো বেশী) সীমালংঘন করে বসবে। ৪৬. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা (কোনোরকম) ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সংগেই আছি, আমি (সব কিছু) শুনি, (সব কিছু) দেখি। ৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ই তার কাছে যাও এবং বলো, আমরা তোমার মালিকের পাঠানো দুজন রসূল, অতএব (এ নিপীড়িত) বনী ইসরাঈলের লোকদের তুমি আমাদের সাথে যাবার (অনুমতি) দাও, তুমি

مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ
الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾ قَالَ
رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ
الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً ۗ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾ كُلُوْا وَارْعَوْا
اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا
نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ

তাদের (আর) কষ্ট দিয়ো না; আমরা তোমার কাছে তোমার মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের) নিদর্শন নিয়ে এসেছি; এবং যারা এই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্যে (রয়েছে অনাবিল) শান্তি। ৪৮. আমাদের ওপর (এ মর্মে) ওহী নাযিল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি (তার আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার ওপর আল্লাহর আযাব (পড়বে)। ৪৯. (এসব শোনার পর) ফেরাউন বললো, হে মূসা (বলো), কে (আবার) তোমাদের দু'জনের মালিক? ৫০. সে বললো, আমাদের মালিক তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে তার (যথাযোগ্য) আকৃতি দান করেছেন, অতপর (সবাইকে তাদের চলার পথ) বাতলে দিয়েছেন, ৫১. সে বললো, তাহলে আগের লোকদের অবস্থা কি হবে? ৫২. সে বললো, সে বিষয়ের জ্ঞান আমার মালিকের কাছে (সংরক্ষিত বিশেষ) গ্রন্থে মজুদ আছে, আমার মালিক কখনো ভুল পথে যান না– তিনি (কারো) কোনো কথা ভুলেও যান না। ৫৩. তিনি এমন (এক সত্তা), যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, ওতে তোমাদের (চলার) জন্যে বহু ধরনের পথঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি প্রেরণ করেন; অতপর তা দিয়ে আমি (যমীন থেকে) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ বের করে আনি। ৫৪. তোমরা (তা) নিজেরা খাও এবং (তাতে) তোমাদের পশুদেরও চরাও; অবশ্যই এর (মাঝে) বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্যে (শিক্ষার) অনেক নিদর্শন রয়েছে।

রুকু ৩

৫৫. (এই যে যমীন–) তা থেকেই আমি তোমাদের পয়দা করেছি, তাতেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং পরিশেষে তা থেকেই আমি তোমাদের দ্বিতীয় বার বের করে আনবো। ৫৬. (ফেরাউনের অবস্থা ছিলো,) আমি তাকে আমার যাবতীয় নিদর্শন

وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ
بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ
مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا
تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦١﴾
فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾ قَالُوٓا۟ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ
يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾ قَالُوا۟

দেখিয়েছি, কিন্তু (এ সত্ত্বেও) সে (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অবিশ্বাস করেছে। ৫৭. (এক পর্যায়ে ফেরাউন বললো,) হে মূসা, (তুমি কি নবুওতের দাবী নিয়ে) এ জন্যে আমাদের কাছে এসেছো যে, তুমি তোমার যাদু (ও তেলেসমাতি) দিয়ে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে। ৫৮. (হাঁ,) আমরাও তোমার সামনে অতপর অনুরূপ যাদু এনে হাযির করবো, অতএব এসো তোমার এবং আমাদের মাঝে একটি (মোকাবেলার) ওয়াদা ঠিক করে নিই, যার আমরাও খেলাপ করবো না, তুমিও করবে না, (এটা হবে) খোলা ময়দানে (যেন সবাই তা দেখতে পায়)। ৫৯. সে বললো, হাঁ তোমাদের সাথে (প্রতিযোগিতার) ওয়াদা হবে (তোমাদের) মেলা বসার দিন, সেদিন মধ্য দিনেই যেন লোকজন এসে জমা হয়ে যায়। ৬০. (অতপর) ফেরাউন উঠলো এবং (কথানুযায়ী) যাদুর (সামানপত্র) জমা করলো, তারপর (মোকাবেলা দেখার জন্যে) সে (ময়দানে) এসে হাযির হলো। ৬১. মূসা তাদের (লক্ষ্য করে) বললো, দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কখনো আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করো না, তাহলে তিনি তোমাদের আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন, (আর) যে ব্যক্তি মিথ্যা বানায় সে ব্যর্থ হয়ে যায়। ৬২. (মূসার কথা শুনে) তারা নিজেদের পরিকল্পনার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মতবিরোধ করলো, কিন্তু তারা গোপন সলাপরামর্শ গোপনই রাখলো। ৬৩. (ফেরাউনের) লোকজন বললো, অবশ্যই এ দুজন মানুষ হচ্ছে যাদুকর, তারা যাদুর (খেলা) দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে এবং তোমাদের এ উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব খতম করে দিতে চায়। ৬৪. অতএব (হে যাদুকররা), তোমরা তোমাদের সব যাদু একত্রিত করো, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে (যাদু দেখানোর জন্যে) উপস্থিত হয়ে যাও, আজ যে (এ মোকাবেলায়) জয়ী হবে সে-ই হবে সফলকাম। ৬৫. তারা বললো, হে

يٰمُوسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ
فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ
فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ
مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ
وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ
فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ؗ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ
نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ

মূসা (বলো, আগে) তুমি (তোমার লাঠি) নিক্ষেপ করবে– না আমরা নিক্ষেপ করবো? ৬৬. সে বললো, তোমরাই বরং (আগে) নিক্ষেপ করো, যাদুর প্রভাবে তার কাছে মনে হলো তাদের (যাদুর) রশি ও লাঠিগুলো বুঝি এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে, ৬৭. (এতে) মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভয় (ও শংকা) অনুভব করলো। ৬৮. আমি বললাম (হে মূসা), তুমি ভয় পেয়ো না, (শেষতক) অবশ্যই তুমি বিজয়ী হবে। ৬৯. (হে মূসা,) তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিক্ষেপ করো, (দেখবে এ যাবত) যা খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মূলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা তো (ছিলো) নেহায়াত যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো কামিয়াব হয় না– যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন! ৭০. (মূসার লাঠি বিশাল অজগর হয়ে যাদুকরদের সাপগুলোকে গিলে ফেললো, এটা দেখে) অতপর যাদুকররা সবাই সাজদাবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো, আমরা হারুন ও মূসার মালিকের ওপর ঈমান আনলাম। ৭১. সে (ফেরাউন) বললো, আমি তোমাদের (এ ধরনের) কোনো অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে! (আমি দেখতে পাচ্ছি) সে-ই হচ্ছে (আসলে) তোমাদের (প্রধান) গুরু, যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে (দেখো এবার আমি কি করি), আমি তোমাদের হাত পা উল্টো দিক থেকে কেটে ফেলবো, তদুপরি আমি তোমাদের খেজুর গাছের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবো, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে আমাদের (উভয়ের) মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। ৭২. তারা বললো, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদের (এ দুনিয়ায়) পয়দা করেছেন, তাঁর ওপর আমরা কখনোই

قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن
يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن
يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن
تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

তোমাকে প্রাধান্য দেবো না, সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই করো; তুমি (বড়ো জোর) এ পার্থিব জীবন সম্পর্কেই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে; ৭৩. আমরা তো আমাদের মালিকের ওপর ঈমান এনেছি, যাতে করে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ-(বিশেষ করে) তুমি যে আমাদের যাদু করতে বাধ্য করেছো তা যেন মাফ করে দেন; (আমরা বুঝতে পেরেছি,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তিনিই হচ্ছেন অধিকতরো স্থায়ী। ৭৪. যে ব্যক্তি কোনো অপরাধে অপরাধী হয়ে তার মালিকের দরবারে হাযির হবে, তার জন্যে থাকবে জাহান্নাম (আর জাহান্নাম এমন এক জায়গা); যেখানে (মানুষ মরতে চাইলেও) মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) বাঁচবেও না! ৭৫. অপর দিকে যে ব্যক্তিই তার কাছে মোমেন হয়ে কোনো নেক কাজ নিয়ে হাযির হবে- তারাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা, ৭৬. এমন এক স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল; এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে (স্বীয় জীবনকে) পবিত্র রেখেছে।

রুকু ৪

৭৭. আমি মূসার কাছে এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছি, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায়ই এ দেশ ছেড়ে চলে যাও এবং (আমার আদেশে) তুমি ওদের জন্যে সমুদ্রের মধ্যে একটি শুষ্ক সড়ক বানিয়ে নাও, পেছন থেকে কেউ তোমাকে ধাওয়া করবে এ আশংকা তুমি কখনোই করো না। ৭৮. (মূসা তার জাতিকে নিয়ে সাগর পানে বেরিয়ে গেলো,) অতপর ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তারপর সাগরের (অথৈ) পানি তাদের ডুবিয়ে দিলো, ঠিক যেমনটি তাদের ডুবিয়ে দেয়া উচিত ছিলো; ৭৯. (মূলত) ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে দিয়েছে, সে কখনোই তাদের সঠিক পথ দেখায়নি।

يٰبَنِىٓ اِسۡرَآءِيۡلَ قَدۡ اَنۡجَيۡنٰكُمۡ مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوٰعَدۡنٰكُمۡ جَانِبَ الطُّوۡرِ
الۡاَيۡمَنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡمَنَّ وَالسَّلۡوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ
وَلَا تَطۡغَوۡا فِيۡهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِىۡ ۚ وَمَنۡ يَّحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِىۡ ۚ فَقَدۡ
هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّىۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰى ﴿٨٢﴾ وَمَآ
اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ
اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ
السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوۡسٰٓى اِلٰى قَوۡمِهٖ غَضۡبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوۡمِ اَلَمۡ
يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ الۡعَهۡدُ اَمۡ اَرَدۡتُّمۡ اَنۡ يَّحِلَّ
عَلَيۡكُمۡ غَضَبٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُمۡ مَّوۡعِدِىۡ ﴿٨٦﴾ قَالُوۡا مَاۤ اَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ

৮০. হে বনী ইসরাঈল (চেয়ে দেখো), আমি (কিভাবে) তোমাদের (প্রধান) শত্রু (ফেরাউন)
থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছি এবং আমি তোমাদের (নবীর) কাছে তূর (পাহাড়ের) ডান
দিকের যে (স্থানে তাওরাত গ্রন্থ দানের) ওয়াদা করেছিলাম (তাও পূরণ করেছি,) তোমাদের জন্যে আমি
(আরো) নাযিল করেছি 'মান' এবং 'সালওয়া'(নামের কিছু পবিত্র খাবার-)। ৮১.
তোমাদের আমি যা পবিত্র খাবার দান করেছি তা খাও এবং তাতে বাড়াবাড়ি করো না,
বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের ওপর আমার গযব অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর
আমার গযব অবধারিত হবে সে তো ধ্বংসই হয়ে যাবে! ৮২. আমি অবশ্যই তার প্রতি
ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করলো, ঈমান আনলো, নেক কাজ করলো, অতপর
হেদায়াতের পথে থাকলো। ৮৩. (মূসা এখানে আসার পর আমি তাকে বললাম,) হে মূসা, কোন জিনিস
তোমার জাতির লোকদের কাছ থেকে (এখানে আসার জন্যে) তোমাকে তাড়াতাড়ি করালো! ৮৪.
(সে বললো, না) তারা তো আমার পেছনেই রয়েছে, আমি তোমার কাছে আসতে তাড়াতাড়ি
করলাম যাতে করে হে মালিক, তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হও, ৮৫. তিনি বললেন, তোমার
(চলে আসার) পর আমি তোমার জাতিকে (আরেক) পরীক্ষায় ফেলেছি, 'সামেরী' (নামের এক
ব্যক্তি) তাদের গোমরাহ করে দিয়েছিলো। ৮৬. অতপর মূসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে
তার জাতির কাছে ফিরে এলো, (এসে তাদের) সে বললো, হে আমার জাতি (এ তোমরা কি
করলে), তোমাদের মালিক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি (যে, তোমাদের তিনি এ
যমীনের কর্তৃত্ব সমর্পণ করবেন), তবে কি আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি(র 'সময়')টি তোমাদের কাছে
খুব দীর্ঘ মনে হয়েছিলো (তোমরা আর অপেক্ষা করতে পারলে না), কিংবা তোমরা এটাই
চেয়েছো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের গযব অবধারিত হয়ে পড়ুক, অতপর
তোমরা আমার ওয়াদা ভংগ করে ফেললে! ৮৭. তারা বললো (হে মূসা), আমরা তোমার

بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى
السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ
وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۵ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ
بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ
رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ
بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ

প্রতিশ্রুতি নিজেদের ইচ্ছায় ভংগ করিনি (আসলে যা ঘটেছে তা ছিলো), জাতির (মানুষদের) অলংকারপত্রের বোঝা আমাদের ওপর চাপানো হয়েছিলো, আমরা তা (বইতে না পেরে আগুনে) নিক্ষেপ করে দেই (এ ছিলো আমাদের অপরাধ), এভাবেই সামেরী (আমাদের প্রতারণার জালে) নিক্ষেপ করলো; ৮৮. তারপর সে (অলংকার দিয়ে) তাদের জন্যে একটি বাছুর বের করে আনলো, (মূলত) তার (ছিলো) একটি (নিষ্প্রাণ) অবয়ব, তাতে গরুর (মতো) শব্দ ছিলো (মাত্র), তারা (এটুকু দেখেই) বলতে লাগলো, এ হচ্ছে তোমাদের মাবুদ, (এটি) মূসারও মাবুদ, কিন্তু মূসা (এর কথা) ভুলে (আরেক মাবুদের সন্ধানে 'তূর' পাহাড়ে চলে) গেছে। ৮৯. (ধিক তাদের বুদ্ধির ওপর,) তারা কি দেখেনা, ওটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না, না ওটা তাদের কোনো রকম ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে!

রুকু ৫

৯০. (মূসা তার জাতির কাছে ফিরে আসার) আগেই হারুন তাদের বলেছিলো, হে আমার জাতি, এ (গো-বাছুর) দ্বারা তোমাদের (ঈমানেরই) পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, তোমাদের মালিক তো হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা, তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো। ৯১. ওরা বললো, যতোক্ষণ পর্যন্ত মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসবে আমরা এর (পূজা) থেকে বিরত হবো না। ৯২. (মূসা এসে এসব না-ফরমানী কাজ দেখলো,) সে বললো, হে হারুন, তুমি যখন দেখলে ওরা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তোমাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো ৯৩. যে, তুমি আমার কথার অনুসরণ করলে না! তুমি কি আমার আদেশ (তাহলে) অমান্যই করলে? ৯৪. সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার দাড়ি ও মাথার (চুল) ধরো না, আমি (এমনি একটি) আশংকা

إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ
بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن
تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكَ
ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَآ
إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

করেছিলাম, তুমি (ফিরে এসে হয়তো) বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং তুমি আমার কথা পালনে যত্ন নাওনি।' ৯৫. সে বললো হে সামেরী (বলো) তোমার ব্যাপারটা কি (হয়েছিলো?) ৯৬. সে বললো, আসলে আমি যা দেখেছিলাম তা ওরা দেখেনি (ঘটনাটা ছিলো), আমি আল্লাহর বাণীবাহকের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো (মাটি) নিয়ে নিলাম, অতপর তা ওতে নিক্ষেপ করলাম, আমার মন (কেন জানি) এভাবেই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিলো। ৯৭. সে বললো, চলে যাও (আমার সম্মুখ থেকে), তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্যে এ (শাস্তিই নির্ধারিত) হলো, তুমি বলতে থাকবে- 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না', এ ছাড়া তোমার জন্যে আরো আছে (পরকালের আযাবের) ওয়াদা, যা কখনো তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না, তাকিয়ে দেখো তোমার বানানো মাবুদের প্রতি, যার পূজায় তুমি (এতোদিন) রত ছিলে; আমি ওকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেবো, অতপর তার ছাই বিক্ষিপ্ত করে (সমুদ্রে) নিক্ষেপ করবো। ৯৮. (হে মানুষ,) তোমাদের মাবুদ তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই, যিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই; তিনি তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরার শুরু ও সমাপ্তি দুটোই হয়েছে রসূল (স.)-কে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। বলা হয়েছে যে, তার ওপর কোনো দুর্ভাগ্যও চাপিয়ে দেয়া হয়নি, তাঁকে কোনো শাস্তিও দেয়া হয়নি। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত দেয়া ও স্মরণ করানো, সুসংবাদদান ও ভীতি প্রদর্শন, তারপর সমগ্র মানব জাতিকে একমাত্র সেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি সৃষ্টিজগতের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী, যিনি অন্তর্যামী, সমগ্র সৃষ্টি যার বশীভূত এবং অবাধ্য ও অনুগত নির্বিশেষে সকল মানুষ যার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য। রসূল (স.) এ দায়িত্ব পালন করার পরও যারা আল্লাহর অবাধ্য থাকবে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে, তাদের জন্যে তিনি দায়ী থাকবে না এবং তাদের মিথ্যা আরোপ ও অবাধ্যতার কারণে কোনো ভাগ্য বিপর্যয়ও ঘটবে না।

উক্ত সূচনা ও সমাপ্তির মাঝখানে কয়েকটা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর নবুওতলাভ থেকে শুরু করে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়া, বিশেষত আল্লাহ তায়ালা ও মূসা (আ.)-এর মাঝে কথোপকথন, মূসা ও ফেরাউনের বিতর্ক এবং মূসা ও যাদুকরদের মাঝে যাদুর প্রতিযোগিতার বিবরণ। এই কাহিনীর বিবরণের মধ্য দিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন তোমাকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করিয়েছি এবং নিজের জন্যেই করিয়েছি। তারপর তাকে ও তার ভাইকে বলেছেন, 'তোমরা দু'জন ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাথেই আছি, সব কিছুই দেখছি ও শুনছি।'

এ সূরায় হযরত আদমের কাহিনীও আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে ও ক্ষুদ্র আকারে। সেখানে দেখানো হয়েছে একটা ভুল কাজ করেও কিভাবে হযরত আদম আল্লাহর অনুগ্রহ ও হেদায়াত লাভ করলেন। সেই সাথে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা আদমের বংশধরকে সদুপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শনের পর হেদায়াত ও গোমরাহী– এই দুটোর যেটাই গ্রহণ করতে চাইবে, করার স্বাধীনতা দেবেন।

পুরো কাহিনীটা কেয়ামতের দৃশ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটা হযরত আদমের বেহেশতে থাকাকালীন কাহিনীর প্রাথমিক অংশের পরিশিষ্ট স্বরূপ। আল্লাহর অনুগত বান্দারা সে বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং অবাধ্যরা যাবে দোযখে। হযরত আদম যখন সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার পর পৃথিবীতে নেমে আসেন, তখন তাকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

এ জন্যে সূরাটা দুই অংশে বিভক্ত। রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে কথা সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে সেটা রয়েছে প্রথম অংশে, সে কথাটা হলো, 'আমি তোমার কাছে এ জন্যে কোরআন নাযিল করিনি যে, 'তুমি দুর্ভোগ পোহাবে; বরং আল্লাহভীরুদের উপদেশ দেয়ার জন্যে নাযিল করেছি।' এর অব্যবহিত পরই মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যাদের তার দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে নির্বাচিত করেন, তারা তার তত্ত্বাবধানেই থাকে। তাই তার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তারা দুর্ভোগ পোহায় না।

আর দ্বিতীয় অংশে কেয়ামতের দৃশ্যাবলী ও হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী সূরার প্রথমাংশ ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করছে। এরপর রয়েছে সূরার সমাপনী বক্তব্য, যা সূরার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সূরার পটভূমির সাথে সুসমন্বিত।

সূরার একটা বিশেষ তাৎপর্যময় প্রভাব রয়েছে। সে প্রভাব গোটা প্রেক্ষাপটক বেষ্টন করে রেখেছে। অতি উচ্চস্তরের এই প্রভাবের কাছে সকলের মনমস্তিষ্ক নতিস্বীকার করে রয়েছে। এই প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে পবিত্র তুয়া ময়দানে নিস্তব্ধ নিশীথে একাকী হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর সুদীর্ঘ একান্ত সংলাপে। কেয়ামতের মাঠেও মহান আল্লাহর অলৌকিক আবির্ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রভাব। 'দয়াময় আল্লাহর সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি ক্ষীণ পায়ের আওয়ায ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবে না। .... সেদিন সব মুখমন্ডলই সেই চির জীব চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকবে।' (আয়াত ১০৮-১১১)

সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আয়াতের শেষে 'আলিফ মাকসূরা' বিশিষ্ট শব্দের অবস্থানে এক সুমধুর ছন্দময় ঐকতান সৃষ্টি হয়েছে।

তাফসীর
আয়াত ১-৯৮
কোরআন মানুষের দূর্ভোগের জন্যে নাযিল হয়নি

'ত্ব-হা, আমি তোমার কাছে কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে.............।' (আয়াত ১-৮)

অত্যন্ত শ্রুতিমধুর সূচনা। শুরুতেই রয়েছে দুটো বর্ণ ত্ব-হা। এর অর্থ হলো, সমগ্র কোরআনের মতো এই সূরাটাও এই ধরনের আরবী বর্ণমালা দিয়েই রচিত। এর আগের কয়েকটা সূরার শুরুতে আমি এরূপ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। এখানে এমন দুটো বর্ণ চয়ন করা হয়েছে, যা সূরার সাথে এক সুরে গাঁথা হ্রস্ব তাল ও লয় বিশিষ্ট। এই দুটো বর্ণের অব্যবহিত পর রয়েছে কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা। বর্ণমালা দিয়ে শুরু হওয়া সূরাগুলোতে সাধারণত এভাবেই রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে কোরআন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে।

'ত্ব-হা, আমি তোমার কাছে কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে।' অর্থাৎ এ জন্যে কোরআন নাযিল করিনি যে, তা তোমার কষ্ট ও দুর্ভোগের কারণ হবে। কোরআন তেলাওয়াত ও তা দ্বারা এবাদাত করতে গিয়ে তোমাকে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কষ্ট করতে হবে, এ জন্যে কোরআন নাযিল করিনি; বরং কোরআন পাঠ করা ও তদনুসারে কাজ করা খুবই সহজ। মানবীয় শক্তি সামর্থের বাইরের কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তোমার সাধ্যাতীত কোনো কাজ করতে বাধ্য করেননি। সাধ্যমত কাজ করা কষ্ট নয় বরং নেয়ামত, আল্লাহর নৈকট্যলাভের সুযোগ; শক্তি ও শান্তি আহরণের উপায় এবং আল্লাহর সন্তোষ ও ভালোবাসা লাভের পথ।

কোরআন আমি এ জন্যেও নাযিল করিনি যে, জনগণ তার প্রতি ঈমান না আনলে তুমি দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হবে। তাদের ঈমান আনতে বাধ্য করা তোমার দায়িত্ব নয়। আক্ষেপ ও পরিতাপ করে নিজের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষকে সতর্ক করা ও স্মরণ করানো ছাড়া কোরআনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

'কেবল আল্লাহর ভয় ভীরুদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে নাযিল করেছি।' (আয়াত ৩)

যার মধ্যে আল্লাহর ভয় ভীতি আছে, তাকে যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সে স্মরণ করে এবং আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ পর্যন্তই রসূলের দায়িত্ব শেষ। মনের রুদ্ধ দ্বারগুলো খুলে দেয়া এবং মন জয় করা রসূলের কাজ নয়। এটা আল্লাহর কাজ, যিনি কোরআন নাযিল করেছেন। তিনিই সমগ্র বিশ্ব জগতের ওপর আধিপত্যশীল ও পরাক্রান্ত। তিনিই অন্তর্যামী।

'এই কোরআন সেই সত্ত্বার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি দয়াময় আল্লাহ, আরশের ওপর আসীন। আকাশে, পৃথিবীতে, এতদুভয়ের মাঝখানে ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে, তিনিই সেসবের অধিপতি।'

বস্তুত যিনি এই কোরআন নাযিল করেছেন, তিনিই সুউচ্চ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কোরআন আকাশ ও পৃথিবীর মতোই একটা জাগতিক বিষয়। উচ্চতর জগত থেকে এটা নাযিল হয়েছে। এখানে আয়াতে প্রাকৃতিক বিধান ও কোরআন নাযিলের বিধানের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, যেমনটি সমন্বয় সাধন করা হয়েছে পৃথিবীর সাথে উচ্চ আকাশের এবং আল্লাহর কাছ থেকে পৃথিবীতে নাযিল হওয়া কোরআনের।

যিনি ঊর্ধ্বজগত থেকে কোরআন নাযিল করেছেন এবং পৃথিবী ও উচ্চ আকাশকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি হচ্ছেন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং তিনি তার বান্দার দুর্ভোগ সৃষ্টি করার জন্যে তার কাছে কোরআন নাযিল করেননি। এখানেই দয়া নামক গুণটির নিগূঢ় অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। তিনি সমগ্র বিশ্বের ওপর পরাক্রান্ত। 'আরশের ওপর আসীন।' আরশে আসীন হওয়ার অর্থ সর্বময় কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও সর্বোচ্চ আধিপত্য। সুতরাং মানব জাতির চূড়ান্ত দায় দায়িত্ব তার হাতেই নিবদ্ধ। আল্লাহভীরু মানুষকে সুপথ দেখানো ও পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া রসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই। আর অধিকার ও আধিপত্য যে সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের সাথেই সংশ্লিষ্ট, সে কথা বলা হয়েছে ৬ নং আয়াতে,

'আকাশে, পৃথিবীতে, এতদুভয়ের মধ্যে ও ভূগর্ভে যা কিছু আছে, তিনিই সে সবের মালিক।'

আর বিশ্ব প্রকৃতির দৃশ্যাবলীকে সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা বুঝানোর জন্যে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যাতে মানবীয় কল্পনাশক্তি তা উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এর চেয়েও অনেক বড়ো। সমগ্র সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে, সে সবেরই মালিক আল্লাহ। আর এই সৃষ্টি জগত, আকাশ, পৃথিবী, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু এবং ভূগর্ভস্থ সব কিছুর সমষ্টির চেয়েও বড়ো। আল্লাহর মালিকানা যতখানি ব্যাপক, তার জ্ঞানও ততোই ব্যাপক।

'তুমি যদি প্রকাশ্যে কথা বলো, তবে তিনি গোপন ও অধিকতর গোপন সবই জানেন।'

এই আয়াতের বক্তব্য ও এর পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্য বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রকাশ্য বস্তুরাজি ও প্রকাশ্য কথার মাঝে এবং ভূগর্ভস্থ গোপন বিষয় ও মনের গোপন বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে। 'গোপন' ও 'অধিকতর গোপন' দ্বারা যথাক্রমে শেষোক্ত দুটো গোপন বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে। বস্তুত গোপন ও অধিকতর গোপনের ভেতরে গোপনীয়তার যেমন স্তরভেদ রয়েছে, ভূগর্ভের স্তরসমূহের মধ্যেও তেমনি গোপনীয়তার স্তরভেদ রয়েছে।

এখানে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথেই রয়েছেন, তাঁর সব কথা শুনছেন, তাঁকে একাকী অসহায় ছেড়ে দেননি যে, এই কোরআন নিয়ে দুর্ভোগ পোহাবেন এবং কোনো প্রমাণ ছাড়া কাফেরদের মোকাবেলা করবেন। তিনি যখন আল্লাহকে প্রকাশ্যে ডাকেন, তখন সেটা তো তিনি শোনেনই, উপরন্তু গোপনে ও অধিকতর গোপনে ডাকলেও শোনেন। তাঁর মন যখন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছেই আছেন এবং তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য সকল তৎপরতারই খবর রাখেন, তখন আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীতে কাফেরদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করবেন না।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আধিপত্য ও সর্বব্যাপী জ্ঞান সংক্রান্ত ঘোষণার পর আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিয়ে সূরার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সমাপ্তি টানা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তার রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।' (আয়াত ৮)

এখানে আয়াতের শেষে 'আল হুসনা' শব্দটার সুর ও মর্ম দুটোই সুসমন্বিত। এর মর্ম হলো দয়া, নৈকট্য ও তদারকী, যা এই প্রারম্ভিক বক্তব্য ও গোটা সূরার পরিবেশকেই বেষ্টন করে রেখেছে।

কোরআন জুড়ে মূসা নবীর কাহিনী

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শোনান। তিনি তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের জন্যে বাছাই করা লোকদের কিভাবে তদারক ও তত্ত্বাবধান করেন, তার একটা দৃষ্টান্ত এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীই কোরআনে সবচেয়ে বেশী আলোচিত। যে যে সূরায় তা আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে, সেই সেই সূরায় তার ঠিক সেই অংশই আলোচিত হয়েছে, যা সে সূরার সামগ্রিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে এ কাহিনী আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে সূরা বাকারায়, মায়েদায়, আ'রাফে, ইউনুসে, বনী ইসরাইলে, কাহফে। এ ছাড়া অতি সংক্ষেপে অন্যান্য সূরায়ও আছে।

সূরা মায়েদায় এ কাহিনীর একটা অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা হলো বনী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমির কাছে অবস্থান এবং সে ভূমিতে একদল দুর্ধর্ষ লোক বাস করে এই অজুহাতে সেখানে প্রবেশ করতে অসম্মতি সংক্রান্ত। সূরা কাহফেও অনুরূপ একটা অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে আল্লাহর এক বান্দার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এরর সাক্ষাত ও তাঁর সাহচর্যে কিছু সময় কাটানো সংক্রান্ত, কিন্তু সূরা বাকারা, আরাফ, ইউনুস ও এই সূরায় এই কাহিনীর অনেকগুলো অংশ বর্ণিত হয়েছে। তবে এইসব অংশ এক সূরা থেকে অন্য সূরায় খানিকটা ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই কাহিনী অংশে এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সূরা বাকারায় হযরত মূসা ও বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত কাহিনীর আগে হযরত আদম ও ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁর সম্মানজনক অবস্থানের কাহিনী এবং তাঁর ভুল ত্রুটি ক্ষমা করার পর তাঁকে পৃথিবীর খলিফা পদে অভিষিক্তকরণ ও তাঁকে বিপুল নেয়ামত প্রদানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর এসেছে হযরত মূসা ও বনী ইসরাঈলের কাহিনী। এ কাহিনীতে বনী ইসরাঈলকে স্মরণ করানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কত নেয়ামত দান করেছেন, কত অংগীকার তাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, কিভাবে ফেরাউন ও তার দলবলের হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছেন, হযরত মূসা (আ.) কিভাবে তাদের জন্যে পানি চেয়েছেন, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মরুভূমিতে পানির ঝর্ণা তৈরী করে দিয়েছেন এবং অলৌকিকভাবে মান্না ও সালওয়া নামক খাদ্য পরিবেশন করেছেন। এ সাথে মূসা (আ.)-কে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তূর পর্বতে ডেকে নিলে সেই সুযোগে বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজায় লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সেই পাপ ক্ষমা করা, পাহাড়ের নীচে তাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ, শনিবারের আইন লংঘন এবং গাভী সংক্রান্ত ঘটনাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে সূরা বাকারায়।

সূরা আ'রাফে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর আগে সতর্কবাণী উচ্চারণ ও ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যখন হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে, তখন তা তাঁর নবুওতের প্রাথমিক দায়িত্ব

পালনের বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর লাঠি, হাত উজ্জ্বল হওয়া, ঝড় বন্যা, ফসল খেকো কীটপতংগ, উকুন, ব্যাঙ ও রক্তের বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যাদুকরদের কর্মকান্ডের, ফেরাউনের জীবনাবসানের এবং তার সাংগ-পাংগদের ধ্বংসপ্রাপ্তিরও। এরপর এসেছে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার বিবরণ। অতপর এ কেসসার সমাপ্তি টানা হয়েছে এই মর্মে ঘোষণা দানের মাধ্যমে যে, যারা এই নিরক্ষর শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর অনুসারী হবে, তারাই হবে আল্লাহর রহমত ও হেদায়াতের উত্তরাধিকারী।

সূরা ইউনুসেও এই কাহিনীর আগে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী পূর্বতন জাতিগুলোর ধ্বংসের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এরপর এসেছে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী। প্রথমে আলোচিত হয়েছে তাঁর রসূলসুলভ কর্মকান্ড, তারপর এসেছে যাদুকরদের দৃশ্য, ফেরাউন ও তার দলবলের ধ্বংসের বিশদ বিবরণ।

কিন্তু আলোচ্য সূরা ত্বা-হায় এ কাহিনীর আগেই আলোচিত হয়েছে দ্বীনের দাওয়াতের বাহক হিসাবে আল্লাহর নির্বাচিত নবী রসূলদের ওপর আল্লাহর রহমত ও তদারকীর বিষয়টি। তাই কাহিনীতেও এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর প্রথম দিকেই হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর গোপন আলাপ আলোচনা, তার সমর্থন ও সাহায্যের কিছু দৃষ্টান্ত এবং ইতিপূর্বে তাঁর শৈশবকালেও তাঁকে যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি তোমার জন্যে আমার পক্ষ থেকে স্নেহ মমতা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।'

মূসা (আ.)—এর নবুওতপ্রাপ্তি ও আল্লাহর সাথে কথপোকথনের ঘটনা

এবার আমি সূরায় আলোচিত কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

'তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? সে যখন আগুন দেখতে পেলো, তখন নিজ পরিবারবর্গকে বললো, তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও। আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। .... ' (আয়াত ৯-১০)

'তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে নবী হিসেবে বরণ করে নেন, তাকে কিভাবে তত্ত্বাবধান ও পথ প্রদর্শন করেন, সেটা কি তুমি সে বৃত্তান্তের মাধ্যমে জানতে পেরেছো?

তিনি তূর পর্বতের কাছ দিয়ে মিসর থেকে মাদইয়ানের দিকে যাত্রা করেন। মাদইয়ানে তিনি আল্লাহর নবী হযরত শোয়ায়বের সাথে এই মর্মে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, কমের পক্ষে আট বছর এবং উর্ধ্বপক্ষে দশ বছর তার গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করলে তার দু'মেয়ের একটাকে তার সাথে বিয়ে দেবেন। এই চুক্তি অনুসারে তিনি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য মতে পুরো দশ বছর তাঁর বাড়ীতে কাজ করেন, তারপর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে হযরত শোয়ায়বের কাছ থেকে আলাদাভাবে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি মিসরে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেন, যেখানে তাঁর স্বগোত্র বনী ইসরাঈল ফেরাউনের নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো।(১)

তিনি মিসরে কেন ফিরে গেলেন? অথচ তিনি তো সেখান থেকে বিতাড়িত। জনৈক ইসরাঈলীর সাথে সংঘর্ষরত এক কিবতীকে হত্যা করে তিনি মিসর থেকে যখন পলায়ন করেন

(১) সূরা 'ত্বা-হার' পূর্বে অবতীর্ণ সূরা কাসাসে হযরত মূসার জীবনের এই প্রাথমিক ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার

তখন বনী ইসরাঈল সেখানে ফেরাউনের শাসনাধীনে হরেক রকম নির্যাতন ভোগ করছিলো। তিনি মাদইয়ানে হযরত শোয়ায়বের কাছে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন।

এই ফিরে যাওয়ার মূলে ছিলো নিজ দেশ ও স্বজনদের আকর্ষণ। মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে নানা ধরনের ভূমিকা পালনের জন্যে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর মনে এই আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। আমরাও এভাবে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন আবেগ ও আকর্ষণ, আশা ও আকাংখা এবং সুখ ও দুঃখের টানাপড়েনে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে থাকি। আসলে এগুলো মহান আল্লাহর সুপ্ত ও অদৃশ্য উদ্দেশ্যকে সফল করার বাহ্যিক উপকরণ ও উপলক্ষ মাত্র। মহা পরাক্রমশালী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কেউ দেখতে, জানতে ও বুঝতে পারে না। দেখতে পায় শুধু বাহ্যিক উপলক্ষকে।

এভাবে হযরত মূসা (আ.) ফিরে চললেন। ফিরে যাওয়ার সময় রাতের আধারে মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেললেন। এ বিষয়টা আমরা জানতে পারি স্বীয় পরিবারবর্গকে সম্বোধন করে উচ্চারিত তাঁর এই উক্তি থেকে, 'তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। হয়তো আমি তোমাদের জন্যে একটা জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসতে পারবো, অথবা আগুনের জায়গা থেকে পথের সন্ধান পাবো।' এ কথা সুবিদিত যে, মরুবাসীরা সাধারণত একটু উঁচু জায়গায় আগুন জ্বালায়, যাতে মরুচারীরা রাতের অন্ধকারে তা দেখে পথের সন্ধান পায়, অথবা সেখানে রাত্রি যাপন ও খাবার দাবারের সুবিধা পেতে পারে। মূসা (আ.) এই মরুভূমিতে আগুন দেখে খুশী হলেন এবং পরিবার পরিজনের শীত নিবারণের জন্যে সেখান থেকে আগুন নিয়ে আসতে পারবেন ভেবে সেখানে গেলেন। কেননা মরুভূমিতে রাতের বেলা শীত অনুভূত হয়ে থাকে। তিনি এ আশাও পোষণ করছিলেন যে, সে আগুন দ্বারা নিজেই পথ চিনে নিতে পারবেন অথবা ওখানে পথের সন্ধান দিতে পারে এমন কাউকে পাওয়া যাবে।

হযরত মূসা (আ.) একটু আগুনের অংগার অথবা পথের সন্ধানদাতার খোঁজে সেখানে গেলেন বটে, তবে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। সেখানে তিনি পেলেন সেই আগুন, যা দিয়ে দেহ নয়, আত্মাকে উদ্দীপিত করা যায়, যা দিয়ে মরুপথের নিশীথ যাত্রা নয়! বরং মানব জীবনের কঠিনতম ও বৃহত্তম সফরের পথনির্দেশ লাভ করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'মূসা যখন আগুনের কাছে গেলো, তাকে সম্বোধন করা হলো, ওহে মূসা, আমি তোমার প্রভু। অতএব তোমার জুতো খোলো, তুমি তো পবিত্র তুয়া ময়দানে উপস্থিত। আমি তোমাকে (নবী হিসাবে) মনোনীত করেছি। সুতরাং তুমি ওহীর মাধ্যমে যা বলা হচ্ছে তা শোনো। আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। কাজেই আমার এবাদাত করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।..........' আয়াত ১১-১৬)

সেই সময়কার দৃশ্যটা নিছক কল্পনা করতেও মানুষের মন কেঁপে ওঠে এবং শুকিয়ে যায়। মূসা (আ.) একাকী মরুপ্রান্তরে ধাবমান। রাত গভীর। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশ। এই পরিবেশে তিনি এগিয়ে চলেছেন আগুন আনতে, যা তিনি তূরের কাছ থেকে দেখতে পেয়েছেন। সহসা তার চার পাশের জগত ঐশীধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'আমি তোমার প্রভু। তুমি জুতা খোলো। তুমি পবিত্র তুয়া ময়দানে উপস্থিত। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। ....' চোখ দিয়ে দেখা যায় না এমন মহা প্রতাপশালী বিশ্ব প্রভুর মুখোমুখি হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, দুর্বল, সীমাবদ্ধ একটা কণা। সেই মহাপ্রতাপশালী প্রভুর প্রতাপের সামনে আকাশ ও পৃথিবী নস্যি মাত্র। তাঁর সেই মহা প্রতাপান্বিত আহ্বানটি পৌঁছে মানবীয় সত্ত্বার কাছে। মানবীয় সত্ত্বা এ আহ্বানে কিভাবে সাড়া দেবে যদি আল্লাহর কৃপা তার সহায় না হয়?

এটা এমন এক মুহূর্ত, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে গোটা মানব জাতি এতো উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিলো যে, এই আহ্বান সে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। মানুষের পক্ষে এই আহ্বান গ্রহণ করা ও তাতে সাড়া দেয়ার যোগ্যতা ও সামর্থ কম গৌরবের ব্যাপার নয়, চাই যেভাবেই সে সাড়া দিক। কিভাবে সাড়া দিয়েছিলো তা আমরা জানি না। এ ব্যাপারে রায় দেয়া ও এ বিষয়টা উপলব্ধি করা মানবীয় বিবেক বুদ্ধির সাধ্যাতীত। তবে না বুঝে হলেও এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া ও এর প্রতি ঈমান আনাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

'তাকে সম্বোধন করা হলো' এই কর্মবাচ্যসূচক ক্রিয়া ব্যবহারের কারণ, এই সম্বোধনের উৎস, দিক, পদ্ধতি ও স্বরূপ কী ছিলো এবং হযরত মূসা (আ.) তা কিভাবে শুনেছেন ও সাড়া দিয়েছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। সুতরাং কথাটা দাঁড়ালো এ রকম যে, যেভাবেই হোক সম্বোধন করা হয়েছে এবং যেভাবেই হোক তাতে সাড়া দেয়া হয়েছে। এটা আল্লাহর এমন একটা কাজ, যা সংঘটিত হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তা জানতে চাই না। কেননা কিভাবে হয়েছে সেটা মানুষের বুঝা ও কল্পনা করার ক্ষমতার বাইরে।

'হে মূসা আমি তোমার প্রভু। কাজেই তোমার জুতো খোলো। তুমি পবিত্র তুয়া ময়দানে উপস্থিত।(১)

অর্থাৎ তুমি মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত। কাজেই খালি পায়ে এসো। তুমি সেই ময়দানে উপস্থিত, যেখানে পবিত্র দৃশ্য দেখা যায়। তাই এটাকে জুতো দ্বারা দলিত করো না।

'আমি তোমাকে মনোনীত করেছি।' বস্তুত এ এক অভাবনীয় গৌরব ও সম্মান যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং লক্ষ কোটি মানুষের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন। আল্লাহর অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে একটা গ্রহে অবস্থানরত এমন একটা সৃষ্টিকে তিনি বাছাই করেন, যার আকৃতি এই মহাবিশ্বের তুলনায় একটা বিন্দু বা কণার সমান। এতো বড়ো ও বিশাল সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ তায়ালা শুধু একটা শব্দ 'হও' বলে সৃষ্টি করেছেন। এহেন বিশাল সৃষ্টিজগতের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ মানুষকে তিনি মনোনীত করে যে সম্মান দিয়েছেন, সেটা মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ কৃপাদৃষ্টির ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

এই সম্মানজনক মনোনয়নের ঘোষণা দান এবং জুতো খোলার নির্দেশ দিয়ে প্রস্তুতকরণের পর ওহীর বাণী গ্রহণের জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে,

'অতএব ওহীর বাণী শোনো।'

এই ওহীর বাণীর সার সংক্ষেপ হচ্ছে পরস্পর সুসমন্বিত ও সংযুক্ত তিনটে জিনিস, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তার এবাদাত ও আনুগত্য এবং কেয়ামতে বিশ্বাস। এই তিনটিই আল্লাহর রসূলদের রেসালাতের মূল কথা।

'আমিই আল্লাহ' আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার এবাদাত করো ....' (আয়াত ১৪-১৬)

আল্লাহর একত্ব হচ্ছে ঈমানের মূল। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলার সময় এ বিষয়টার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে 'আমিই আল্লাহ' এবং তারপর আবার 'আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই' বলেছেন। প্রথমটায় আল্লাহকে 'ইলাহ' বলা হয়েছে। আর শেষেরটায় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ইলাহ হওয়া অস্বীকার করা হয়েছে। এই ইলাহত্ব বা

---

(১) তুয়া কারো মতে ময়দানে নাম, আবার কারো মতে ময়দানের বিশেষণ।

প্রভুত্ব থেকেই এবাদাতের উদ্ভব হয়। আর এবাদাত হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ ও তাঁর হুকুম মানার নাম। তবে এর বিশেষ রূপ হলো নামায। 'আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।' কারণ নামায এবাদাতের সবচেয়ে পূর্ণাংগ রূপ ও স্মরণের সবচেয়ে পূর্ণাংগ পদ্ধতি। কেননা এটাই নামাযের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যসব উদ্দেশ্য থেকে তা মুক্ত। নামাযে মানুষ শুধু আল্লহর হুকুম পালনের জন্যেই প্রস্তুত হয় এবং তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্যেই নিবেদিত হয়।

আর কেয়ামত ও পরকাল হলো পরিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত কর্মফল লাভের জন্যে নির্ধারিত সময়। এর প্রতি সবার মন উন্মুখ থাকে এবং এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জীবনপথে চলার সময় প্রতি মুহূর্তে পদস্খলন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে চলে। সেই সময়টা যে একদিন আসবেই, তা আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে এও বলেছেন যে, 'আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।' বস্তুত কেয়ামত সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই কম ও সীমিত। তিনি নিজে যতোটুকু ভালো মনে করেন ততোটুকুই তাদেরকে জানান। অজ্ঞতাই মানব জীবনে ও মানব সত্ত্বার গঠনে মৌলিক উপাদান। মানব জীবনে কিছু জিনিস অজানা থাকা জরুরী, যেন তার জন্যে তারা অনুসন্ধান চালাতে থাকে। মানুষের বর্তমান স্বভাব প্রকৃতি বহাল থাকা অবস্থায়, সব কিছুই যদি তার জানা হয়ে যেতো, তাহলে তার সমস্ত তৎপরতা বন্ধ হয়ে যেতো এবং তার জীবন একঘেয়ে হয়ে যেতো। অজানা জিনিসের পেছনেই সে ঘুরপাক খায়, আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান থাকে, সতর্কতা অবলম্বন করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে, শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজের ও আশপাশের সৃষ্টিজগতের অজানা শক্তি ও ক্ষমতা জানতে চেষ্টা করে, নিজের সত্ত্বায় প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা ও সুযোগ দেন, পৃথিবীতে ততোটুকু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। যে কেয়ামতের আগমনের সময় কারো জানা নেই, তার জন্যে মানুষের মনমগয ও চেতনাকে অপেক্ষমাণ ও সচকিত রাখার যে ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করেছেন, তা তাকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে রক্ষা করে। যেহেতু কেয়ামতের সময় অজ্ঞাত, তাই তার জন্যে সদাসতর্ক ও সদাপ্রস্তুত থাকা প্রত্যেক সুস্থ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যার বিবেক বিকৃত হয়ে গেছে এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে শিথিল ও উদাসীন থাকে এবং তার পতন ও ধ্বংস অনিবার্য,

'অতএব যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকেও কেয়ামত সম্পর্কে উদাসীন করে না দেয়। তাহলে তো তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এর কারণ, প্রবৃত্তির অনুসরণই মানুষকে কেয়ামত ও আখেরাত অবিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে থাকে। সুস্থ প্রকৃতির মানুষ আপনা থেকেই বিশ্বাস করে যে, পার্থিব জীবনে মানুষ কোনো দিক দিয়েই পূর্ণতা লাভ করে না এবং এখানে পূর্ণ ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এমন একটা ভিন্নতর জগত থাকতেই হবে, যেখানে মানুষ তার প্রাপ্য পূর্ণতা ও কর্মফলের পূর্ণ ন্যায়বিচার পাবে।

এটা ছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি উচ্চারিত ঐশী সম্বোধনের প্রথমাংশ। এই সম্বোধনে তার সমগ্র সত্ত্বা সচকিত হয়ে ওঠলো। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তার মনোনীত বান্দাকে তাওহীদের মূলনীতিগুলো শিখিয়ে দিলেন। মূসা (আ.) যে এতে হতচকিত ও হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন এবং তিনি যে আগুন নিতে এসেছিলেন সে কথা ভুলে যাবেন, সেটা ছিলো অবধারিত। এই অদৃশ্য আহ্বান কোথা থেকে আসছে, এই ভাবনায় যখন তিনি একান্তভাবেই মশগুল এবং অন্য কোনো

দিকে তার ঘুণাক্ষরেও মনোযোগ দেয়ার সুযোগ নেই, তখন সহসা তার কাছে এমন এক প্রশ্ন করা হলো, প্রশ্নকর্তা যার জবাবের মুখাপেক্ষী নন। প্রশ্নটা হলো,

'হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কী?'

তাঁর হাতে তার লাঠি ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু লাঠি দিয়ে তিনি কী করেন? তিনি এর জবাবে লাঠির উপকারিতার উল্লেখ করলেন,

'মূসা বললো, ওটা আমার লাঠি। আমি ওর ওপর ভর দেই, ওটা দিয়ে আমার মেষপালকে গাছের পাতা পেড়ে দেই এবং ওতে আমার আরো অনেক উপকার হয়।'

মূলত তাঁর হাতের লাঠির উপকারিতা কী কী, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি। প্রশ্নটা ছিলো শুধু এই যে, তাঁর হাতের জিনিসটা কী, কিন্তু মূসা (আ.) উপলব্ধি করলেন যে, তাকে বোধ হয় সে জিনিসটার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়নি। কেননা তা তো সুস্পষ্ট। তাকে নিশ্চয়ই সে জিনিসটার উপকারিতা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তাই তিনি এরূপ জবাব দিলেন।

মূসা (আ.) যে জবাব দিলেন তা ছিলো লাঠি সম্পর্কে তাঁর জানা সর্বশেষ ও সর্বাধিক তথ্য। সে লাঠিতে তিনি ভর দেন, তা দিয়ে তিনি হযরত শোয়ায়বের মেষপালের রাখালগিরি করতে গিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তাদেরকে খেতে দেন এবং আরো অনেক প্রয়োজনে লাঠিটা ব্যবহার করেন, যা তিনি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি এগুলোর বিশদ বিবরণ দেননি; বরং নমুনাস্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেন যে, শ্বশুরালয় থেকে স্বদেশে যাওয়ার সময় তিনি মেষপালের একটা অংশ সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তাঁর প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু মহাশক্তিধর আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে এমন কাজ সংঘটিত করলেন, যা কেউ ভাবতেও পারেনি। এর উদ্দেশ্য ছিলো হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুত করা।

মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালার মোযেজা দান

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, লাঠিটা ফেলে দাও। মূসা ফেলে দিলো। সংগে সংগেই তা এক ধাবমান সাপ হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এবার সাপটাকে ধরো, ভয় পেয়ো না, আমি ওটাকে আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে নেবো।'

এ সময় সেই অলৌকিক মোজেযা সংঘটিত হলো, যা প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে। অথচ মানুষ সে সম্পর্কে সচেতন নয়। মোজেযা সংঘটিত হলো এভাবে যে, একটা লাঠি চলন্ত সাপে পরিণত হলো। অথচ প্রতি মুহূর্তে কত লক্ষ কোটি মৃত বা জড় কোষ যে জীবন্ত কোষে পরিণত হচ্ছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে? এটা মানুষকে এতোটা হতচকিত করে না, যতোটা মূসা (আ.)-এর লাঠি সাপে পরিণত হয়ে করেছিলো। কেননা মানুষ তার ইন্দ্রিয়র এবং তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার হাতে বন্দী। তাই তার ইন্দ্রিয় যা কিছু অনুভব করে, তার কল্পনা তা থেকে খুব বেশী পৃথক হয় না। লাঠির সাপে পরিণত হওয়া একটা ঐন্দ্রিক ঘটনা, যা অনুভূতিকে আঘাত করে। তাই সে তার প্রতি প্রচন্ডভাবে সচকিত ও সচেতন হয়, কিন্তু জীবনের সুপ্ত মোজেযাগুলো, যা প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে, সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না। বিশেষত গতানুগতিকতা তার স্নায়ুকে নতুনত্বের শিহরণ থেকে বঞ্চিত করে। তাই সে উদাসীন ও অবচেতনভাবে তাকে অতিক্রম করে।

মোজেযাটি সংঘটিত হলে মূসা (আ.) ঘাবড়ে গেলেন ও ভয় পেলেন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'তুমি ওটা ধরো এবং ভয় পেয়ো না। আমি ওকে আগের আকৃতিতে ফিরিয়ে নেবো।' অর্থাৎ লাঠি বানিয়ে দেবো।

এখানকার আয়াতে অন্য সূরার মতো বলা হয়নি যে, মূসা (আ.) পেছন ফিরে পালালেন এবং ফিরেও তাকালেন না। সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত করা হয়েছে যে, মূসা (আ.) ভয় পেলেন। কারণ এই

সূরার সামগ্রিক পটভূমি হচ্ছে প্রশান্তির পটভূমি। তাই এ বিবরণ পেছন ফিরে পালানো ও আতংকিত হওয়া সম্বলিত বিবরণ থেকে তেমন পৃথক ও ভিন্নতর নয়।

এরপর মূসা (আ.) শান্ত হলেন এবং সাপটাকে ধরে ফেললেন। ধরা মাত্রই তা আগের মতো লাঠির আকৃতি লাভ করলো। সংঘটিত হলো আরেক ধরনের মোজেযা।

একটা জীবন্ত সাপের জীবন ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মৃত ও জড় পদার্থে পরিণত করা হলো, যেমনটি তা প্রথম মোজেযার আগে ছিলো।

পুনরায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দা মূসা (আ.)-কে আদেশ দিলেন–

'তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তখন তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে, কোনো অমংগল ব্যতিরেকেই। সেটা হবে আরেকটা নিদর্শন।' মূসা (আ.) তাঁর হাত তাঁর বগলের নীচে স্থাপন করলেন। আয়াতে বগল ও বাহুকে ডানা বলার কারণ এ অংশটা পাখীর ডানার মতোই হালকা ও মুক্ত। এতে শরীরের বা মাটির ভার পড়ে না। হাত বগলে রাখতে বলা হয়েছে, যাতে তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু এই সাদা হওয়াটা কোনো রোগ ব্যাধি বা বিপদের লক্ষণ নয়; বরং লাঠির সাপে পরিণত হওয়ার মতো এটাও আরেকটা স্বতন্ত্র মোজেযা। 'যেন তোমাকে আমার বৃহত্তম নিদর্শনগুলো দেখাই।' তাহলে তুমি সেই মোজেযা সংঘটিত হওয়া স্বচক্ষে দেখতে পাবে, নিজ ইন্দ্রিয় ও স্নায়ু দ্বারা অনুভব করতে পারবে। তাহলে তুমি এর বৃহত্তম সুফল বহনে নিশ্চিতভাবে সক্ষম হবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার মিশনে মূসা (আ.)–কে আল্লাহর সর্বাত্মক সাহায্য

'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। সে বিপথগামী হয়ে গেছে।' (আয়াত ২৪)

এ সময় পর্যন্তও হযরত মূসা (আ.) জানতেন না যে, তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। অথচ ফেরাউন কেমন মানুষ, তা বিলক্ষণ জানতেন। কেননা তিনি তারই প্রাসাদে লালিত পালিত হয়েছেন, তার স্বৈরাচারী কর্মকান্ড দেখেছেন এবং তাঁর গোত্রের ওপর সে কিরূপ নির্যাতন চালিয়েছে তাও দেখেছেন। এখনো তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত আদর সম্মান ও সন্তোষ উপভোগ করছেন। তাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁর কাছ থেকে এমন শক্তি চেয়ে নেয়া খুবই জরুরী মনে করলেন, যাতে করে এই কঠিন দায়িত্ব পালন করা তাঁর জন্যে সহজ হয়ে যাবে এবং রসূলসুলভ দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা প্রদর্শনে তিনি সক্ষম হবেন।

'তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার বুক খুলে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহবার আড়ষ্টতা দূর করে দাও যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।' .... (আয়াত ২৫-৩৪)

হযরত মূসা (আ.) স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দোয়া করলেন যেন তাঁর বুক খুলে দেন। বুক খুলে দেয়ার ফল এই হয় যে, দায়িত্ব পালনের কষ্টটা আনন্দে পর্যবসিত হয় এবং ওটা জীবনকে ভারাক্রান্ত করার পরিবর্তে সামনে এগিয়ে দেয়।

তিনি আল্লাহর কাছে নিজের দায়িত্ব পালন সহজ করে দেয়ার দোয়াও করলেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যদি বান্দার কাজ সহজ করে দেন, তবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। আল্লাহ তায়ালা সহজ করে না দিলে বান্দা বড়োই অসহায় হয়ে পড়ে। কেননা তার শক্তি ও জ্ঞান সীমিত এবং পথ দীর্ঘ, দুর্গম ও অচেনা।

তিনি আল্লাহর কাছে জিহ্বার জড়তা ও আড়ষ্টতা দূর করারও অনুরোধ জানান, যাতে মানুষ তার কথা বুঝতে পারে। বর্ণিত আছে যে, তাঁর জিহ্বায় তোতলামি ছিলো এবং খুব সম্ভবত এটা থেকেই তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন। সূরা 'কাসাসে' উদ্ধৃত হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকেও সেটাই বুঝা যায়, 'আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী।' হযরত মূসা (আ.) এখানে আল্লাহর কাছে যে দোয়া করেছেন, তাতে প্রথমে বক্ষদেশ প্রশস্ত করে দেয়া ও কাজ সহজ করে দেয়া এই দুটো জিনিসই চেয়েছেন। তারপর সুনির্দিষ্টভাবে যেসব জিনিস তার সহায়ক হতে পারে, সেগুলো প্রার্থনা করেছেন।

তিনি নিজের ভাই হারুনকেও তাঁর কাজের সহযোগী হিসেবে চেয়েছেন। কেননা তিনি তার বাগ্মিতা, বাকপটুতা, মনের দৃঢ়তা ও ঠান্ডা মাথার কথা জানতেন। মূসা (আ.) নিজে ছিলেন কিছুটা রাগী, আবেগ-প্রবণ, ত্বরিত উত্তেজিত ব্যক্তি। তাই তিনি দোয়া করলেন যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাইকে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে মনোনীত করেন। যিনি তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করবেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর আরব্ধ কাজ সফল করতে আল্লাহর প্রচুর তাসবীহ, যেকের ও তাঁর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা আবশ্যক ছিলো। হযরত মূসা (আ.)-এর বক্ষদেশ প্রশস্ত করে দেয়া, তাঁর কাজ সহজ করে দেয়া ও তাঁর জিহবার আড়ষ্টতা দূর করার জন্যে যে দোয়া করেছেন, তা সরাসরি তার দায়িত্ব পালনের জন্যে নয় বরং তিনি ও তাঁর ভাই যাতে বেশী করে আল্লাহর তাসবীহ ও যেকের করতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে আল্লাহর এবাদাতের প্রেরণা লাভ করতে পারেন সে জন্যে। দোয়ার শেষ ভাগে তিনি বলেছেন, 'তুমি তো আমাদের সব কিছুই দেখতে পাও।' অর্থাৎ তুমি আমাদের অবস্থা জানো, আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে তুমি অবহিত এবং আমাদের জন্যে সাহায্যের প্রয়োজন কতখানি তাও তুমি জানো।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রার্থনা অনেক দীর্ঘায়িত করলেন, তার প্রয়োজন ব্যক্ত করলেন, নিজের দুর্বলতাগুলো জানালেন এবং আল্লাহর সাহায্য, কাজ সহজ করে দেয়া এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা ও প্রেরণা প্রার্থনা করলেন। এ প্রার্থনা করার সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রার্থনা শুনছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তখনকার জন্যে তাঁর দরবারে একজন অতিথি। আল্লাহ তায়ালা তার এ প্রার্থনা কিভাবে অগ্রাহ্য করবেন? তিনি স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। তিনি তাঁর মেহমানকে লজ্জা দেন না এবং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন না। তাই পরিপূর্ণভাবে দোয়া কবুল করতেও তিনি বিলম্ব করলেন না।

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেয়া হয়েছে।'

এভাবে একবারে এক বাক্যেই দোয়া মঞ্জুর করা হলো। এটা সংক্ষিপ্ত বাক্য হলেও এর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এতে কোনো ওয়াদা করা হয়নি; বরং তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই সাথে 'হে মূসা' বলে সম্বোধন করে তাঁকে সম্মানিতও করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে নাম ধরে ডাকলেন, এর চেয়ে বড়ো সম্মান ওই বান্দার জন্যে আর কিছুই হতে পারে না।

জীবনব্যাপি মূসা (আ.)-এর ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ ও সম্মান এখানে দেখানো হয়েছে, তা পর্যাপ্ত ছিলো, কিন্তু এরপরও তার সাথে আলাপ ও তাঁর প্রতি আরো অনুগ্রহ প্রদর্শন অব্যাহত রাখা হয়েছে। বস্তুত তাঁর কৃপা অনুগ্রহ সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আর কারো নেই। তিনি ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তাঁর মন অধিকতর আশ্বস্ত হয়।

'আমি তোমার ওপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন তোমার মাকে বলেছিলাম.............।' (আয়াত ৩৫-৪১)

হযরত মূসা (আ.) সে কালের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী পরাক্রমশালী এবং সবচেয়ে স্বৈরাচারী বাদশার কাছে যাত্রা করলেন, যাত্রা করলেন কুফুরের সাথে ঈমানের সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে। প্রথমে ফেরাউনের সাথে এবং পরে নিজ গোত্র বনী ইসরাঈলের সাথে তার অনেক ঘটনা ঘটে ও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। বনী ইসরাঈলের সাথে সমস্যা সৃষ্টির কারণ ছিলো, ফেরাউনের সুদীর্ঘ দাসত্ব তাদের বিবেক ও চেতনা নিষ্ক্রিয় এবং তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজ বিকৃত করে দিয়েছিলো। ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত ছিলো, সে দায়িত্ব পালনে তাদের মানসিক প্রস্তুতি ওই গোলামীর কারণেই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে জানাচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাঠাবেন না বরং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত করেই পাঠাবেন। তাকে তিনি শৈশব থেকেই নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালন পালন করেছেন, দুধ খাওয়ার সময় থেকেই তাঁকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, শিশুকালে তিনি ফেরাউনের মুঠোর মধ্যেই ছিলেন, তখন তাঁর হাতে আদৌ কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা বা সাজসর াম ছিলো না। তথাপি ফেরাউন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। কেননা মহান আল্লাহর অদৃশ্য হাত তাকে প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করে বলছিলো; সুতরাং আজ যখন মূসা বড়ো হয়েছেন, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে রয়েছেন এবং তাঁকে নিজের রসূল রূপে মনোনীত করেছেন, তখন মূসা (আ.)-এর এখন আর কোনো দুশ্চিন্তার কারণই থাকতে পারে না।

'আমি তোমাকে ইতিপূর্বে আরো একবার অনুগ্রহ করেছি।' অর্থাৎ তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, বিশেষত রেসালাতের দায়িত্বে নিযুক্তির পর এখন তা অব্যাহত না থেকেই পারে না।

যখন তোমার মাকে যা ওহী করা প্রয়োজন তা ওহী করেছিলোম এবং সে ধরনের পরিস্থিতিতে তাকে যে নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন তা দিয়েছিলাম, তখন তোমার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। সেই নির্দেশ ছিলো, 'ওকে (মূসাকে) সিন্দুকে রাখো, অতপর সেই সিন্দুক সমুদ্রে নিক্ষেপ করো। অতপর সমুদ্র তাকে তীরে নিক্ষেপ করুক।'............... লক্ষণীয়, এখানে উল্লিখিত প্রতিটি কাজ নির্মম ও নিষ্ঠুর ধরনের। একটা শিশুকে সিন্দুকে পুরে সে সিন্দুক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা অতপর সমুদ্র কর্তৃক সিন্দুককে তীরে ঠেলে দেয়া। এরপর কী? কে গ্রহণ করবে ওই সিন্দুক? সেই ব্যক্তি গ্রহণ করবে যে আমার (আল্লাহর) শত্রু এবং তার (মূসার) শত্রু।'

এতোসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ভিড়ে এবং এতোসব ঘাত প্রতিঘাতের পর, এই দুর্বল ও অক্ষম শিশুর ভাগ্যে কী ঘটলো? যে সিন্দুকটির আদৌ কোনো সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিলো না, তার কী হলো! এর জবাব হলো, 'আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি স্নেহ মমতা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনেই লালিত পালিত হও।'

মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কী বিস্ময়কর কীর্তি! পেলব কোমল স্নেহ মমতা ও ভালোবাসকে তিনি এমন হাতিয়ারে পরিণত করলেন, যার সামনে সকল আঘাত ব্যর্থ ও সকল তরংগ ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই স্নেহ মমতা ও ভালোবাসার অধিকারী হয়, কোনো অপশক্তিই তার ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি সে যদি দুধ খাওয়া, অচল, অক্ষম ও অবলা শিশুও হয়।

মূসা (আ.)—এর প্রতিপালক

দৃশ্যপটের এ এক বিস্ময়কর পরস্পর বিরোধী চিত্র। একদিকে রয়েছে ক্ষুদ্র শিশুকে ঘিরে থাকা স্বৈরাচারী শক্তি ও নিষ্ঠুরতার পরিবেশ। অপরদিকে রয়েছে পেলব কোমল স্নেহ মমতা, যা তাকে যাবতীয় ভয়ভীতি, দুঃখ-কষ্ট ও নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করে।

'যাতে তুমি আমার চোখের সামনে বেড়ে ওঠো।' কোরআনের এই অপূর্ব বাচনভংগিতে যে কোমলতা ও মমত্বের ভাব ফুটে ওঠে, কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই তার চেয়ে বেশী কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর চোখের সামনে লালিত পালিত হয়, তার যথার্থ রূপ বর্ণনা করা কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ বড়ো জোর তা শুধু কল্পনাই করতে পারে। এক মুহূর্তের জন্যে মহান আল্লাহর সুদৃষ্টি লাভ করাই যেখানে মানুষের পক্ষে বিরাট সম্মান মর্যাদার বিষয়, সেখানে আল্লাহর চোখের সামনে লালিত পালিত হওয়া যে কত বড়ো মর্যাদার ব্যাপার, তা ভাষায় বর্ণনা করা দুসাধ্য। এই কারণেই মূসা (আ.)-এর সত্ত্বায় সেই ঐশী উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, যার বদৌলতে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আল্লাহর শত্রু ও হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু ফেরাউনের চোখের সামনে এবং তার মুঠোর মধ্যে থেকেই কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই মূসা বেড়ে ওঠলেন। এ সময়ে মূসা (আ.)-এর দিকে ফেরাউন একটা ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিও আরোপ করতে পারেনি। কেননা তার মনে মূসা (আ.)-এর প্রতি স্নেহ জন্মে গিয়েছিলো। আর আল্লাহর চোখের সামনে যে লালিত পালিত হয়, কার সাধ্য যে তার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে?

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে যেমন ফেরাউনের প্রাসাদে নিরাপত্তা হেফাযতে বন্দী করে রাখেননি, তেমনি তাঁর মাকেও নিজ বাড়ীতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সহকারে আবদ্ধ করে রাখেননি; বরং উভয়কে একত্রিত করেছেন।

'যখন তোমার বোন গিয়ে বললো, এই শিশুকে লালন পালন করতে পারে আমি এমন একজনের সন্ধান দেবো কি? তারপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ ঠান্ডা হয় এবং সে উদ্বিগ্ন না হয়।

শিশু মূসা (আ.) যাতে তার মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারেন সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি শিশুকে এমন জেদী বানিয়ে দিলেন যে, সে কোনো ধাত্রীরই দুধ গ্রহণ করলো না। অথচ ফেরাউন ও তার স্ত্রী সমুদ্রে ভেসে আসা শিশুটিকে সন্তান হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো। এ বিষয়টা এ সূরায় না হলেও অন্য সূরায় আলোচিত হয়েছে। তারা একজন ধাত্রীর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলো এবং সে কথা ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে পড়েছিলো। মূসা (আ.)-এর বোন তাঁর মায়ের নির্দেশে ফেরাউনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদেরকে বলে, এই শিশুর লালন পালনের ভার নিতে পারে এমন একজনের সন্ধান দেবো কি? অতপর সে ফেরাউনের সম্মতি পেয়ে তার মাকে নিয়ে আসে এবং মা তাকে দুধ খাওয়ায়। এভাবেই আল্লাহর কৌশল সফল হয় এবং শিশু তার মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। এই মাতাই গায়েবী নির্দেশ শুনে নিজের কলিজার টুকরোকে বাক্সবন্দী করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আর পরবর্তীতে সে বাক্সবন্দী শিশু নদীতে ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের প্রাসাদের অদূরে তীরে ভিড়েছিলো। সেখান থেকে তাকে সেই ফেরাউনই কুড়িয়ে নিলো, যে আল্লাহরও শত্রু এবং মূসা (আ.)-এরও ভবিষ্যতের শত্রু। এভাবে প্রতি মুহূর্তে যেখানে মৃত্যুর আশংকা; সেই অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েও মূসা (আ.) নিরাপত্তা লাভ করলেন এবং বনী ইসরাঈলের শিশুদের পাইকারী হারে হত্যাকারী ফেরাউনের কাছে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অসহায় অবস্থায় নীত হয়েও তিনি তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেলেন।

মূসা (আ.)—এর হিজরত

হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর আল্লাহর আরেকটা অনুগ্রহ ছিলো এরূপ, 'তুমি একজন মানুষকে হত্যা করেছিলো। তখন আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম এবং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ করলাম। তারপর তুমি বহু বছর মাদইয়ানবাসীর কাছে অবস্থান করলে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে তুমি ফিরে এলে হে মূসা। আর আমি তোমাকে আমার জন্যেই গড়ে তুলেছি।'

ফেরাউনের প্রাসাদে লালিত পালিত হয়ে বয়োপ্রাপ্ত হবার পর মূসা (আ.)-এর হাতে এ হত্যাকান্ডটা ঘটে। একদিন যুবক মূসা শহরে বেরিয়ে দেখেন, দুই ব্যক্তি মারামারিতে লিপ্ত। তাদের একজন ইসরাঈলী এবং অপরজন মিসরীয়। ইসরাঈলী লোকটা মূসা (আ.)-এর কাছে সাহায্য চাইলো। মূসা (আ.) মিসরীয় লোকটাকে একটা চপেটাঘাত করতেই সে মারা গেলো। কিন্তু তাকে হত্যা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো কেবল তার আক্রমণ প্রতিহত করা। যা হোক, লোকটা মারা যাওয়াতে ভীষণ দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। জন্মের পর থেকেই যিনি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়ে এসেছেন, তিনি কিনা এমন একটা কাজ করে বসলেন! তাঁর বিবেক ভীষণ বিব্রতবোধ করতে লাগলো এবং নিজের আকস্মিক উত্তেজনা সংযত করতে না পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সে সময় তিনি তাঁর ওপর কতো বড়ো অনুগ্রহ করেছেন, তাঁকে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন, অতপর এ দ্বারা তাঁকে সংকোচ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁকে পরীক্ষা না নিয়ে ছেড়ে দেননি। হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ড লাভের আশংকায় বাধ্য হয়ে দেশ থেকে পালানো, দেশ ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে বিদেশে বসবাস করতে বাধ্য হওয়া, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে বিলাসী সম্রাটের প্রাসাদে লালিত পালিত হয়েও এ অনিচ্ছাকৃত দূর্ঘটনার পর মেষপালক ও গৃহভৃত্যরূপে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। এসব পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মতো কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে তাঁকে প্রস্তুত করা।

ফেরাউনের দরবারে যাওয়ার নির্দেশ

তারপর যখন তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন, পরিপক্কতা অর্জন করলেন, বিপদ মসিবতে ধৈর্যধারণ করে টিকে থাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, মিসরের পরিবেশ পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হলো এবং বনী ইসরাঈলের ওপর নির্যাতন নিপীড়নও থামলো, তখনই মূসাকে মাদইয়ান থেকে ফিরিয়ে আনা হলো। যদিও মূসা (আ.) মনে করছিলেন যে, তিনি নিজেই এসেছেন। .... 'তারপর তুমি নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এলে ....' অর্থাৎ সেই সময়ে ফিরে এলে, যে সময়টাকে আমি তোমার ফিরে আসার সময় হিসেবে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। 'আর আমি তোমাকে নিজের জন্যেই গড়ে তুলেছি।' অর্থাৎ নির্ভেজাল ও একান্তভাবে আমার রেসালাত এবং দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্যেই আমি তোমাকে গড়ে তুলেছি। দুনিয়ার আর কোনো কাজের জন্যে তোমাকে গড়ে তোলা হয়নি। সুতরাং তোমাকে যে কাজের জন্যে তৈরী করা হয়েছে সেই কাজে এগিয়ে যাও।

'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে এগিয়ে যাও। আমার শিক্ষা প্রচার করতে সংকোচ বোধ করো না। ফেরাউনের কাছে চলে যাও। সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলো, হয়তো সে শিক্ষা গ্রহণ করবে কিংবা ভয় পাবে।'

অর্থাৎ আমার নিদর্শনাবলী সম্বল করে তুমি ও তোমার ভাই চলে যাও। ইতিপূর্বে হযরত মূসা আল্লাহর এই নিদর্শনাবলীর মধ্য থেকে দুটো হাত ও লাঠি দেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

সংলাপের স্থানে বসে দেয়া হয়নি। শুধু কোরআনের বাচনভংগিতেই এভাবে স্থান ও কালের ব্যবধান গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। কাহিনী বর্ণনাকালে তা বিভিন্ন পর্যায়ের দৃশ্যের মাঝে শূন্যতা রেখে দেয়া হয়। এই শূন্যতার অস্তিত্ব আয়াতের ভাষা থেকেই বুঝা যায়। এ শূন্যতা রাখার উদ্দেশ্য হলো সরাসরি আসল বক্তব্যে উপনীত হওয়া, যা বলার জন্যে ও যার শিক্ষায় মানুষের চেতনা উজ্জীবিত করার জন্যে কাহিনীর অবতারণা।

সুতরাং হযরত মূসা তূর পর্বতের পার্শ্ববর্তী নির্জন মরু প্রান্তরের দীর্ঘ সংলাপ শেষে ফিরে আসার পরই হারুন ও মূসা (আ.) একত্রিত হন। ওদিকে হারুন (আ.)-কেও আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনকে দাওয়াত দেয়ার কাজে অংশ গ্রহণের আদেশ ওহীর মাধ্যমে দিয়ে ছিলেন। তারপর উভয়ে একত্রিত হয়ে তাদের আশংকার কথা জানালেন যে, ফেরাউন তাদের কথাবার্তা শোনার কোনো পরোয়া না করেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে বসতে পারে।

'ইয়াফরুতা' ক্রিয়ার মূল হচ্ছে 'ফারতুন'। এর অর্থ দেখামাত্রই কারো ওপর ত্বরিত আঘাত হানা বা ক্ষতিকর কিছু করা। 'ইয়াতগা' ক্রিয়ার মূল হচ্ছে 'তুগইয়ান'। এর অর্থ 'ফারতুন'-এর চেয়েও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ বা আচরণ। সে সময় ফেরাউন এতো প্রতাপশালী ছিলো যে, তার কাছে মূসা ও হারুন (আ.) যৌথভাবে গেলেও সে তাদের কোনো রকম সমীহ করতো না।

এই পর্যায়ে তাঁদের কাছে আল্লাহর সেই চূড়ান্ত জবাব এলো, যার পরে আর কোনো ভয় বা শংকার প্রশ্নই উঠে না।

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, সব কিছু শুনছি ও দেখছি।'

'আমি তোমাদের সাথে আছি'- এই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যই যথেষ্ট ছিলো। কেননা এ কথাটা সেই মহাশক্তিধর, সর্বোচ্চ ও সর্বময় কর্তা এবং সমগ্র সৃষ্টির ওপর সর্বাত্মক আধিপত্যশীল আল্লাহর- যার যাবতীয় জীব ও জড়ের সৃষ্টিতে একটি মাত্র শব্দ 'হও' ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করতে হয়নি। তথাপি তিনি তাঁর বান্দাদ্বয়কে তাঁর সাহায্য সম্পর্কে আরো নিশ্চিত করার জন্যে বললেন, 'আমি সব কিছু শুনছি ও দেখছি।' কাজেই আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁদের সাথে থাকেন এবং তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন, তাহলে ফেরাউন যতোই বাড়াবাড়ি করুক বা সীমা অতিক্রম করুক, তাদের দু'জনের কিছুই করতে পারবে না।

সাহায্য ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা দাওয়াত বিতর্ক বিতন্ডার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিলেন।

'তোমরা উভয়ে তার কাছে পৌঁছে যাও, অতপর বলো, আমরা তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত। আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও, তাদের ওপর আর নির্যাতন চালিও না। আমরা তোমার প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসরণ করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের কাছে ওহী এসেছে, যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করে ও প্রত্যাখ্যান করে, তার ওপর আযাব আসবে।'

'আমরা তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত'- এই কথার মাধ্যমে তারা নিজেদের মূল বক্তব্যটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন। প্রথম মুহূর্তেই তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, একজন ইলাহ আছেন যিনি ফেরাউনেরও মনিব, সারা দুনিয়ার মানুষেরও মনিব। শুধু মূসা, হারুন ও বনী ইসরাঈলের জাতি

বা গোত্রের এক বা একাধিক ইলাহ বা দেবতা থাকে। এক সময়ে এ ধারণাও চালু ছিলো যে, মিসরের ফেরাউন একজন দেবতা যাকে মিসরে উপাসনা করা হয়। কেননা সে দেবতাদের বংশধর।

এরপরের বাক্যটিতে তাঁরা তাঁদের দূত হিসেবে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন এভাবে, 'অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিও না।' এটাই ছিলো তাঁদের ফেরাউনের কাছে গমনের মূল উদ্দেশ্য। বনী ইসরাঈলকে তারা ফেরাউনের নির্যাতন নিপীড়ন থেকে মুক্ত করতে, বিশুদ্ধ তাওহীদের আদর্শে পুনর্বহাল করতে এবং তাদের আবাসভূমি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছিলেন (যতো দিন তারা নৈতিক ও আদর্শিকভাবে বিপথগামী না হয়। বিপথগামী হলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দেবেন)।

এরপরের বাক্যে তাঁরা তাঁদের রেসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করলেন, 'আমরা তোমার প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি।' অর্থাৎ আমরা যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে তোমার কাছে এসেছি, তার অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছি।

পরবর্তী বাক্যটায় তারা ফেরাউনকে দাওয়াত গ্রহণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক পথ অনুসারী, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যেন তারা প্রত্যাশা করছেন যে, ফেরাউন সঠিক পথের অসুনারী হোক এবং শান্তি লাভ করুক।

এরপরের আয়াতে ফেরাউনকে অত্যন্ত সতর্ক ভাষায় ও পরোক্ষভাবে সাবধান করে হুমকি দেয়া হয়েছে, যাতে তার দাম্ভিক মেযাজ উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত না হয়, 'আমাদের কাছে ওহীর মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আমাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার ওপর আযাব আসবে।' যেন তারা আশা করছেন, ফেরাউন এ ধরনের প্রত্যাখ্যানকারী হবে না।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মূসা ও হারুন (আ.)-কে আশ্বস্ত করলেন, পথ নির্দেশ দিলেন ও কৌশল বুঝিয়ে দিলেন, যাতে তারা নিশ্চিন্ত মনে বুঝে শুনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বক্তব্য পেশের প্রশিক্ষণের পালা এখানে শেষ। এবার শুরু হচ্ছে বিদ্রোহী ফেরাউনের সামনে উপস্থিতি ও বিতর্কের বিবরণ।

ফেরাউনের প্রতি মূসার আহবান

হযরত মূসা ও হারুন (আ.) ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হলেন। তবে কিভাবে উপস্থিত হলেন তা আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। তারা যখন এলেন, তখন যথারীতি আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ছিলেন এবং তাদের সব কিছু শুনছিলেন ও দেখছিলেন।

তা না হলে ফেরাউনের প্রতাপ ও পরাক্রমের পরোয়া না করে এসব কথাবার্তা বলার শক্তি ও সাহস তাঁরা দুজন কোথা থেকে পেলেন? আল্লাহ তাদের ফেরাউনের কাছে যে দাওয়াত দিতে বলেছিলেন, অবিকল সেই দাওয়াত তাঁরা দিয়েছিলেন। এখানে যে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে, তাতে ফেরাউন ও মূসা (আ.)-এর সংলাপের সূচনা দৃশ্যমান।

'ফেরাউন বললো, হে মূসা, তোমাদের দু'জনের প্রভু কে? মূসা বললো, আমাদের প্রভু তিনিই, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার যথোচিত অবয়ব দান করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।'

ফেরাউনের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, মূসা ও হারুন 'আমরা তোমার প্রভুর দূত হয়ে এসেছি' বলে তাদের প্রভুকে যেভাবে ফেরাউনেরও প্রভু বলে মানিয়ে নিতে চেয়েছেন, ফেরাউন তা

মানতে রাযি নয়। মূসা (আ.)-কে দাওয়াতের আসল উদ্যোক্তা ভেবে সে তাই প্রশ্ন করলো, 'হে মূসা, তোমাদের প্রভু কে?' অর্থাৎ যে প্রভুর দোহাই দিয়ে তোমরা কথা বলছো এবং বনী ইসরাঈলের মুক্তি চাইছো, তিনি কে?

হযরত মুসা (আ.)-এর জবাবে আল্লাহর সৃষ্টি সংক্রান্ত গুণের উল্লেখ করে বললেন, 'আমাদের প্রভু তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যথোপযুক্ত গঠন দান করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।' অর্থাৎ আমাদের প্রভু প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যক বস্তুকে তার সৃজনকালীন আকৃতিতে অস্তিত্ব দান করেছেন, অতপর যে কাজের জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার পথ ও পন্থা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং এই কাজ সম্পাদনে যা যা সহায়ক, তা তাকে সরবরাহ করেছেন। 'ছুম্মা' অব্যয়টি দ্বারা সাধারণত কালগত বিলম্ব বোঝানো হলেও এখানে ওটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করার সাথে সাথেই জন্মগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে তাকে তার সেই অভীষ্ট কাজের পথ ও পন্থা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, যার জন্যে তা সৃজিত হয়েছে। কোনো বস্তু বা প্রাণীর সৃষ্টি ও তার অভীষ্ট কাজের সৃষ্টির মাঝে কোনো কালগত ব্যবধান নেই। ব্যবধান যেটুকু রয়েছে, তা তার নিজের সৃষ্টি ও তার কাজের পথ প্রাপ্তির মধ্যে মানগত তারতম্য ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত প্রত্যেক বস্তুকে তার অভীষ্ট পথ প্রদর্শন করা তাকে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লাহর এই গুণ যা পবিত্র কোরআনে হযরত মূসা (আ.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা সৃষ্টি জগতের পরিকল্পনা ও নির্মাণে প্রতিফলিত আল্লাহর সর্বোত্তম গুণাবলীর সার নির্যাস। এ গুণটা হলো, প্রত্যেক বস্তু বা প্রাণীকে অস্তিত্ব দান করার গুণ তার সৃজনকালীন আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করার গুণ এবং যে কাজের জন্যে সৃষ্টি, তার পথ দেখানোর গুণ, মানুষ যখন এই মহাবিশ্বের চারদিকে দৃষ্টি দেয়, তখন তার কাছে ছোট বড়ো প্রত্যেক সৃষ্টির ভেতরে প্রতিফলিত আল্লাহর সেই অতুলনীয় সৃজন ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু থেকে নিয়ে বৃহত্তম অবয়বধারী বস্তু পর্যন্ত এবং ক্ষুদ্রতম কোষ থেকে নিয়ে মানুষের জীবনের উন্নততম স্তর পর্যন্ত সব কিছুতেই তা দৃশ্যমান।

অগণিত অণুপরমাণু, কোষ, প্রাণীর সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল বিশ্বে প্রতিটি অণুপরমাণু সচল, প্রতিটি কোষ সজীব, প্রতিটি জীবন সক্রিয় এবং প্রতিটি সৃষ্টি অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মিলিত হয়ে কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত রয়েছে। জন্মগতভাবে শেখানো প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণী একাকী ও সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে। এই কাজে এক মুহূর্তের জন্যেও তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, বিরোধ নেই এবং বিকৃতি ঘটে না। প্রতিটি সৃষ্টি এককভাবে এক একটা স্বতন্ত্র জগত। তার অভ্যন্তরে অসংখ্য অনুপরমাণু, কোষ, অংগ-প্রত্যংগ ও সাজ-সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্বভাবগত নিয়মে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সুশৃংখল ও সুসমন্বিত পন্থায় কাজ করে থাকে।

মহাবিশ্বের কথা দূরে থাক, একটি সাধারণ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, প্রকৃতি, কার্যকলাপ, রোগব্যাধি ও তার চিকিৎসা এতো ব্যাপক ও বহুমুখী এক জগত যে মানুষ তার সমস্ত জ্ঞান ও চেষ্টা সাধনা খাটিয়েও এর সমুদয় তথ্য আহরণে অক্ষম। এখানে শুধু তথ্য আহরণের কথাই বলা হচ্ছে, এগুলোর নির্মাণ এবং এগুলোর স্বাভাবিক কার্যকলাপের পথনির্দেশদান তো মানুষের একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। মানুষ নিজেও আল্লাহর এক সৃষ্টি। তিনিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং অন্য সকল সৃষ্টির মতোই তারও সৃষ্টির একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের জন্যেই তার সৃষ্টি।

এরপর ফেরাউন পুনরায় প্রশ্ন করলো,

'সে বললো, পূর্বতন জাতিগুলোর কী অবস্থা হয়েছে?'

অর্থাৎ অতীত জাতিগুলোর পরিণাম কী হয়েছে? তারা কোথায় গেছে? তাদের মাবুদ কে ছিলো? তারা যখন তোমাদের কথিত এই মাবুদ না চিনেই মারা গেছে, তখন তাদের কী হবে?

'মূসা (আ.) বললো, তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার প্রতিপালকের কাছে একটা পুস্তকে সংরক্ষিত আছে। আমার প্রতিপালক বিপথগামীও হন না, ভুলেও যান না।'

এভাবে হযরত মূসা (আ.) সুদূর অতীতের সেই অজানা বিষয়কে তাঁর সেই সর্বজ্ঞ প্রভুর কাছে সমর্পণ করলেন যিনি সব রকম ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে। একমাত্র তিনিই সেই জাতিগুলোর ভূত ভবিষ্যত অবস্থা জানেন। যাবতীয় অদৃশ্য ও অজানা বিষয় আল্লাহর হাতে এবং মানুষের ব্যাপারে সর্ববিষয়ে তিনিই ক্ষমতাবান।

এরপরও হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তৃতা অব্যাহত থাকে। তিনি মহাবিশ্বে আল্লাহর ব্যবস্থাপনার যে নিদর্শনাবলী এবং মানব জাতির ওপর আল্লাহর যে নেয়ামতসমূহ বিরাজমান, তার উল্লেখ করেন। বিশেষভাবে ফেরাউনের চারপাশের এমন কয়েকটা নেয়ামতের তিনি উল্লেখ করেন, যা মিসরের উর্বর ভূমিতে বিরাজমান। তন্মধ্যে পানির প্রাচুর্য, কৃষি সম্পদ ও পশু সম্পদের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

'যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্যে দোলনা বানিয়েছেন. ....।' (আয়াত ৫৩-৫৪)

শিশুদের দোলনার মতোই পৃথিবী মানব জাতির জন্যে সর্বকালে ও সর্বত্র একটা দোলনা। মানুষ এ পৃথিবীর শিশু সন্তান স্বরূপ। পৃথিবী তাদেরকে নিজের কোলে জাপটে ধরে রাখে এবং আহার যোগায়। তাদের চলাফেরা, কৃষি কাজ ও জীবন যাপনের জন্যে পৃথিবী উন্মুক্ত। মহান স্রষ্টা যেদিন প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই পৃথিবীকেও সৃষ্টি করেছেন বসবাসের উপযোগী করে, আর মানুষকেও এই পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্য বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দুটো অর্থই পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী।

মিসর যতটা দোলনার ন্যায় আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীর আর কোনো ভূখন্ড ততোটা নয়। উর্বর, শস্য শ্যামল এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি যতো সহজে চাষ করা যায় এবং যতো সহজে এতে ফসল ফলানো যায়, ততোটা আর কোথাও ফলানো যায় না। যথার্থই তা যেন শিশুকে কোলে নিয়ে পরম আদরে লালন পালনকারী দোলনা।

মহাকুশলী ও সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে দোলনার মতো বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি; বরং এর ভেতরে মানুষের জন্যে রাস্তাঘাটও তৈরী করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিও বর্ষণ করেছেন। এই বৃষ্টির পানি থেকেই নদনদী ও খালবিল তৈরী হয় এবং তাতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর এসব নদনদী ও খালবিলের কল্যাণে সৃষ্টি হয় বিচিত্র রকমের গাছপালা ও তরুলতা। ফেরাউনের কাছে দিয়ে বয়ে যাওয়া নীলনদও এসব নদনদীর অন্যতম। মানুষের খাদ্য উৎপাদন এবং পশু পালনের জন্যে মিসরও একটা আদর্শ ভূখন্ড।

অতুলনীয় কুশলী স্রষ্টা সকল প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদকেও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং করেছেন। প্রাণী জগতে এটা একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদ্যমান। অধিকাংশ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একই উদ্ভিদে নারী ও পুরুষ উভয় কোষ সহাবস্থান করে। আবার কখনো কখনো পুরুষ বীজ উদ্ভিদে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে, যেমনি হয়ে থাকে জীব জগতে। এভাবেই জীবন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়মে সমন্বয় সাধিত হয়। আর এই সমন্বয় অব্যাহত

থাকে সকল শ্রেণীর সৃষ্টিতে। .... 'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। বস্তুত প্রাকৃতিক জগতের এই বিস্ময়কর নিয়ম শৃংখলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে কোনো সুস্থ বিবেকের অধিকারী মানুষ তা থেকে সেই মহাকুশলী স্রষ্টার সন্ধান না পেয়ে পারে না, যিনি প্রতিটি জিনিসকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে পথনির্দেশ ও বিধান দান করেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতির সমাপ্তি টেনেছেন নিজের প্রত্যক্ষ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন,

'এই মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, এই মাটিতেই আবার তোমাদেরকে পাঠাবো এবং পুনরায় তা থেকে তোমাদের বের করবো। আমি ফেরাউনকে আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে।'

অর্থাৎ যে ভূমিকে আমি দোলনা বানিয়েছি, তাতে রাস্তাঘাট তৈরী করেছি এবং বৃষ্টি বর্ষণ করে তাতে জোড়ায় জোড়ায় রকমারি উদ্ভিদ সৃষ্টি করে খাদ্য ও পশু চারণের উপকরণ উৎপন্ন করেছি, সেই ভূমি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, সেই ভূমিতেই তোমাদের ফেরত পাঠাবো এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় তা থেকে তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করে বের করবো।

মানুষ এই ভূমির উপাদান থেকেই তৈরী। তার দেহের উপাদানগুলোর সবই মোটামুটি এই পৃথিবীর মাটিরই উপাদান। এরই ফসল সে খায়, এরই পানি সে পান করে, এরই বাতাসে সে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। মানুষ এই মাটিরই সন্তান এবং এই মাটি তার জন্যে দোলনা স্বরূপ। এই মাটিতেই সে লাশ হয়ে ফিরবে, এই মাটিতেই মিশে যাবে তার হাড়গোড় এবং এর বাতাসেই সে গ্যাসে পরিণত হয়ে মিশে যাবে, অতপর পরকালীন জীবনের জন্যে এই মাটি থেকেই সে উত্থিত হবে, যেমনটি তার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিলো।

মাটি ও ভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে দাম্ভিক হঠকারী ফেরাউনের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনার একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই মাটির তৈরী হয়েও এবং এই মাটিতেই ফিরে যেতে বাধ্য হওয়া সত্তেও সে মাবুদের আসনে আসীন হতে চায়। অথচ সে আল্লাহর অগণিত সৃষ্টিরই একটি, যাকে তিনি এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন যাপনের নিয়মবিধিও তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমি তাকে আমার সকল নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু সে অস্বীকার করেছে।' অর্থাৎ মূসা তার চারপাশের যে সব প্রাকৃতিক নিদর্শন তার সামনে তুলে ধরেছে, তা আমিই তাকে দেখিয়েছি। মূসা (আ.)-এর লাঠি হাতও এই সব নিদর্শনের আওতাভুক্ত। তবে প্রকৃতিতে বিরাজমান নিদর্শনাবলী আরো বড়ো ও স্থায়ী, এ জন্যে এই দুটো নিদর্শনও যে ফেরাউনকে দেখানো হয়েছিলো, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, ওটা অনুষংগিকভাবেই এর আওতাভুক্ত। তবে সকল নিদর্শনের ওপর ফেরাউন যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, তা থেকে বোঝা যায়, ফেরাউন সে দুটো অলৌকিক নিদর্শনের দিকে ইংগিত দিচ্ছে,

'ফেরাউন বললো, হে মূসা, তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়ানোর জন্যে এসেছো? ঠিক আছে, আমিও তোমার সামনে অনুরূপ যাদু পেশ করবো। তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে এ জন্যে একটা দিন নির্ধারণ করো, যা আমিও লংঘন করবো না, তুমিও করবে না। সেটা হবে একটা মধ্যবর্তী স্থানে। মূসা বললো, তোমাদের নির্ধারিত দিন হচ্ছে 'উৎসবের দিন' এবং লোকজন যেন দুপুরের আগেই সমবেত হয়।' (আয়াত ৫৭-৫৯)

এভাবে বিতর্কে ফেরাউন আর অগ্রসর হলো না। কেননা এ বিষয়ে মূসা (আ.)-এর যুক্তি ছিলো সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। তিনি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীকে এবং নিজের মোজেযাকে তার বক্তব্যের

পক্ষে অকাট্য ও অখন্ডনীয় প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিলেন। ফেরাউন শুধু হযরত মূসা (আ.)-কে দোষারোপ করলো যে, তিনি যাদু প্রয়োগ করে লাঠিকে সাপ ও হাতকে সাদা বানিয়েছেন। অথচ এটা কোনো দূষণীয় কাজ ছিলো না। ফেরাউনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে যাদুই সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিলো। কেননা সে সময়ে যাদুর ব্যাপক প্রচলন ছিলো। মূসা (আ.)-এর এ দুটো মোজেযা প্রকৃতিগতভাবে পরিচিত যাদুর নিকটতম ছিলো। যাদু কোনো বাস্তব ব্যাপার নয়; বরং নিছক দৃষ্টি ও অনুভূতিকে ধোঁকা দেয়ার শামিল। এতে দর্শকের অনুভূতি এতোটা প্রতারিত হয় যে, কিছু অবাস্তব জিনিসকেও সে বাস্তব বলে অনুভব করতে থাকে, যেমন মানুষ বাস্তবে যার আদৌ অস্তিত্ব নেই সেই জিনিসও স্বপ্নে দেখে, অথবা ভিন্নরূপে দেখে থাকে। যাদুকৃত ব্যক্তি যে সব জিনিস দেখতে পায় তা সাধারণত তার দৈহিক ও স্বায়ুবিক বৈকল্যের প্রতিক্রিয়া। মূসা (আ.)-এর নিদর্শন দুটো এ ধরনের ছিলো না। ওই দুটো নিদর্শন ছিলো আল্লাহর সৃজন শক্তির বলে ঘটিত যথার্থ সাময়িক বা স্থায়ী রূপান্তর।

'ফেরাউন বললো, ওহে মূসা, তুমি কি তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে এসেছো?'

এটা স্পষ্ট যে, বনী ইসরাঈলকে কেবল এই ভয়ে গোলামে পরিণত করে রাখা হয়েছিলো যে, পাছে তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। স্বৈরাচারী শাসকরা তাদের রাজত্ব ও প্রভুত্ব নিষ্কন্টক করার জন্যে এমন সব অপরাধ ঘটাতেও দ্বিধা করে না, যা চরম পৈশাচিক, নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত এবং মানবতা, নৈতিকতা, সভ্যতা ও বিবেক বিরোধী। এ কারণেই ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে নিশ্চিহ্ন ও নির্বংশ করার লক্ষ্যে তাদের সকল পুরুষ সন্তানকে হত্যা করতো, নারীদের বাঁচিয়ে রাখতো এবং বৃদ্ধদের এতো কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করতো, যার ফলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই মূসা ও হারুন যখন তাকে বললেন যে, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও এবং নির্যাতন করো না। তখন সে তার জবাবে বললো, 'হে মূসা, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে এসেছো?' কারণ বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়ার অর্থই ছিলো মিসরের ওপর তাদের শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা।

আর মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলের মুক্তি দাবী করলেন, তখন ফেরাউনের দৃষ্টিতে সে দাবীর উদ্দেশ্য ছিলো মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের মিসর দখল এবং তিনি যে নিদর্শনগুলো দেখাচ্ছিলেন তা ছিলো তার দৃষ্টিতে নিছক যাদু। এ কারণেই সে অনায়াসেই হুমকি দিলো, 'আমিও এ রকমের যাদু দেখাবো।' স্বৈরাচারীরা এভাবেই আদর্শিক আন্দোলনকারীদের দুনিয়াবী স্বার্থের পূজারী বলে মনে করে এবং ক্ষমতালোভী ও রাজত্বলোভী ভাবে। তারপর তারা আদর্শিক আন্দোলনকারীদের ভেতরে কিছু নিদর্শন দেখতে পায়। কখনো তা হয় অলৌকিক, যেমন মূসা (আ.)-এর নিদর্শনাবলী, আবার কখনো তা হয়ে থাকে লৌকিক, কিন্তু মানুষের হৃদয় জয়কারী ও অপ্রতিরোধ্য। উভয় ক্ষেত্রেই তারা তা প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হয়। অলৌকিক নিদর্শনের প্রতিরোধে প্রয়োগ করে যাদু আর যেসব নিদর্শন অলৌকিক নয়, তার মোকাবেলায় তারা একই ধরনের অস্ত্র প্রয়োগ করে। যদি তা সাহিত্য হয়, তবে অনুরূপ সাহিত্য দিয়ে তার মোকাবেলা করে। সংস্কারমূলক কিছু হলে পাল্টা সংস্কার দিয়ে তার মোকাবেলা করে। ভালো কাজ হলেও অন্তত প্রদর্শনমূলক ভালো কাজ দিয়ে তার মোকাবেলা করতে সচেষ্ট হয়। অথচ আদর্শ যে মানুষের বিশ্বাস ও আল্লাহর সাহায্য পেয়ে বিজয়ী হয়ে থাকে তা তারা বুঝতে পারে না।

মূসা (আ.)—এর মোজেযার প্রতি ফেরাউনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা

এভাবে ফেরাউন মূসা (আ.)-কে যাদুর প্রতিযোগিতার তারিখ ধার্য করার আহ্বান জানালো এবং সে তারিখ যাতে লংঘিত না হয় সে জন্যে কঠোরভাবে সতর্ক করলো। এভাবে সে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে। আর চ্যালেঞ্জ আরো জোরদার করলো এই বলে যে, প্রতিযোগিতাটা একটা উন্মুক্ত মাঠে হওয়া চাই।

ফেরাউন মূসা (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ করলো এবং তার রাজ্যের যাদুকদের সাথে- পাল্লা দেয়ার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানালো। এ প্রতিযোগিতার জন্যে সে এমন একটা বড়ো উৎসবের দিন ধার্য করলো যেদিন সাধারণভাবে বিরাট সমাবেশ হয়ে থাকে এবং সর্বপর্যায়ের লোকেরা সাধ্যানুযায়ী সেজেগুজে সেদিন জমায়েত হয় উন্মুক্ত এক প্রান্তরে, উজ্জ্বল দিবালোকে সবাইকে ডেকে ফেরাউন বললো, উৎসবের একটি বড়ো দিনেই এ সমাবেশ হবে।' এরপর সে এক মেঘমুক্ত রৌদ্রপূর্ণ দিনে সবাইকে জমায়েত হতে আহ্বান জানালো। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সাগ্রহে মূসা (আ.) প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তবে তিনি একটা শর্ত জুড়ে দিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি সর্বান্তকরণে তোমাদের প্রস্তাবে রাযি এবং দিনের আলো যখন সর্বাধিক উজ্জ্বল থাকবে এবং যখন সর্বাধিক লোক হাযির থাকবে তখনই আমি তোমাদের সাথে পাল্লা দেবো, একেবারে ভোর সকালে যেন না হয়, যে ঘর ছেড়ে সবাই হাযির হতে পারবে না, আর ভর দুপুরেও যেন না হয় যে, মানুষ তীব্র গরমের চোটে হয়রান হয়ে যায়, আবার একেবারে বিকালেও যেন না হয় যে, মানুষে বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যাবে। অন্ধকারের ভয়ে বেশী মানুষ হাযির হতে পারবে না। অথবা ঠিকমত পথও দেখতে পারবে না মনে করে কম লোক আসবে.........।

এরপর ময়দানে ঈমানদার ও আল্লাহদ্রোহীদের মোকাবেলা শেষ হলো......... আর এখানে এই দৃশ্যের ওপর দীর্ঘ দিনের জন্যে পর্দা পড়ে গেলো এবং সত্য ও সততার বিজয়ের কথা মানুষ নিঃশেষে ভুলে গেলো।

দেখুন, ওপরে বর্ণিত হক ও বাতিলের প্রতিযোগিতার দৃশ্য কোরআনুল করীমে পর্যায়ক্রমে পেশ করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে,

[মূসা (আ.) চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর] ফেরাউন দরবার থেকে ওঠে গেলো, অতপর সে অনুষ্ঠিতব্য বিশাল সমাবেশের আয়োজন শেষ করলো এবং সময় মতো হাযির হয়ে গেলো।

অর্থাৎ, সে মহাবেশে সত্য মিথ্যার প্রতিযোগিতা কিভাবে সংঘটিত হয়েছিলো, ফেরাউন মূসা (আ.) কে কি বলেছিলো এবং তার জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলতে গিয়ে কোন কোন বিষয়ের দিকে ইশারা করেছিলো, তার সাথে যাদুকরদের কি কি আলাপ হয়েছিলো, তারা বিজয়ী হলে তাদের কি কি পদোন্নতি দেয়া হবে বলে ওয়াদা করা হয়েছিলো, উৎসাহব্যঞ্জক কি কি কথা তাদের বলা হয়েছিলো এবং তাদের কি কি পুরস্কার দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছিলো, নিজে সে কি চিন্তা করেছিলো এবং তার পরামর্শদাতারা কি কি চিন্তা-ভাবনা করেছিলো, ওপরের আলোচনায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব আলোচনা সেরে ফেরাউন দরবার শেষ করলো এবং পরের দিন সকল প্রকার যোগাড়যন্ত্র সহকারে সে পুনরায় দরবারে আগমন করলো। ওপরে বর্ণিত ছোট্ট আয়াতটিতে তিনটি পর্যায় ক্রমিক কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে বুঝা যায়, ফেরাউনেরও উঠে যাওয়া, যোগাড়যন্ত্র করা এবং এগুলো নিয়ে হাযির হওয়া।

আর এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মূসা (আ.) চিন্তা করলেন, ওদের আর একবার নসীহত করা, আল্লাহ তায়ালার সাথে পাল্লা দেয়ার পরিণতি সম্পর্কে ওদের আর একবার সতর্ক করা, আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার ফল কত ভয়ংকর তা

শেষবারের মতো জানিয়ে দেয়া দরকার, যাতে করে তারা হেদায়াতের দিকে ফিরে আসে এবং যাদু দ্বারা আল্লাহর দেয়া মোজেযার সাথে পাল্লা দেয়া থেকে বিরত হয়, আর অবশ্যই এটা সত্য কথা, যাদুমাত্রই আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপের নামান্তর। এরশাদ হচ্ছে,

'মূসা তাদের বললো, দুঃখ হয় তোমাদের জন্যে! খবরদার তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মনগড়া মিথ্যা কথা বলো না, এতো করে বুঝানো সত্তেও যদি তোমরা না শোন তাহলে তোমরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কঠিন আযাবে ফেলে তোমাদের সমূলে নিধন করে দেয়া হবে, আর যারাই এভাবে মিথ্যা ও বানেয়াট কথা বলে তারা অবশ্যই বিফল মনোরথ হয়।'

এ সত্য কথাগুলো অবশ্যই কোনো কোনো হৃদয়কে নাড়া দিলো, প্রবিষ্ট হয়ে গেলো তাদের হৃদয়ের গভীরে এই মর্মস্পর্শী বাণী। তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে মনে হতে লাগলো, শাস্তির যে ভয় দেখানো হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাই, দেখা গেলো এই নিষ্ঠাপূর্ণ কথাতে যাদুকরদের কেউ কেউ বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, এজন্যে কি করবে না করবে সে বিষয়ে তারা দ্বিধাদ্বন্ধের পড়ে গেলো, আর পাল্লা যারা দিতে চাচ্ছিলো না তারা চুপে চুপে ও গোপনে আপোসের কিছু কথা এমনভাবে বলছিলো যেন মূসা (আ.) তাদের কথা শুনতে পান, এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর ওরা তাদের বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো।'

অর্থাৎ, মূসা (আ.)-এর কথা শুনে তারা মত স্থির করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলো এবং গোপনে গোপনে পরামর্শ করতে শুরু করলো। তারা একে অপরকে উস্কাতে থাকলো এবং মূসা ও হারুন (আ.)-এর ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরস্পরকে ওদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকলো। কেননা সে দুই ব্যক্তি তো তাদের মিসর থেকে সমূলে উৎখাত করতে চায় এবং সমস্ত মিসরবাসীর ঈমান আকীদা পুরোপুরিভাবে বদলে দিতে চায়। অতএব তারা একথার ওপর একমত হলো যে, সকল দলাদলি ও ঝগড়া ফাসাদ ভুলে গিয়ে সে দুই ব্যক্তির মোকাবেলায় একত্রিত হতে হবে এবং সবাই মিলে এক হাত হয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ওদের শেষ সিদ্ধান্ত হলো, আজকের এই যুদ্ধের দিন প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যারা আজকে বিজয়ী হবে তারাই হবে সাফল্য মন্ডিত এবং তারাই হবে প্রাধান্য বিস্তারকারী। ওদের কথাগুলো উদ্ধৃত করতে গিয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বললো, এরা দু'জন যাদুকর ছাড়া তো আর কিছু নয়, এরা তোমাদের যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায় এবং এজন্যে তারা এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছে। অতএব তোমাদের শক্তিকে একত্রিত করে একযোগে (সারিবদ্ধ হয়ে) তাদের ওপর হামলা করো। আজকে যে বিজয়ী হবে সেই কৃতকার্য হবে (দেশে টিকে থাকতে পারবে)।'

এভাবে আকীদা সম্পর্কে চরম ও পরম সত্য কথাটি নাযিল হলো এবং সে বাতেল শক্তির ধ্বজাধারীদের মধ্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে ফেললো। যেমন করে মিথ্যা শক্তির লোক লস্কর ও সারিগুলোর মধ্যে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হলে তাদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতংক সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফেরাউনের লোক লস্করের অন্তর প্রচন্ড ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো, হৃদয় তাদের কেঁপে ওঠলো এবং নিজেদের শক্তি ক্ষমতার ওপর তারা এক দারুণ আঘাত অনুভব করলো। তাদের বদ্ধমূল ধারণা বিশ্বাস ও চিন্তা স্রোতের মূল নড়বড়ে হয়ে ওঠলো। এখন একবার ভেবে

দেখুন, সমাজের বুকে যখন জাহেলিয়াত জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে তখন তা অপসারিত করতে হলে কত বড়ো শক্তি ক্ষমতা এবং কত বেশী মনোবল প্রয়োজন। প্রয়োজন কত বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বাহাদুরীর। এখানে দেখুন, একদিকে রয়েছে দুজন অসহায় মানুষ– মূসা ও হারুন (আ.), আর অপরদিকে অসংখ্য যাদুকরের দল এবং তাদের পেছনে দন্ডায়মান ফেরাউন, তার দেশ, সেনাবাহিনী, তার শক্তি ক্ষমতা ও তার অঢেল সম্পদ রয়েছে, কিন্তু মূসা ও হারুনের সাথে রয়েছেন তাদের রব, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন ....।'

সম্ভবত এই অবস্থাটাই আমাদেরকে অহংকারী ও ক্ষমতাগর্বী ফেরাউনের দম্ভ ও দাপট সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করছে, সাহায্য করছে যাদুকরদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে, যেহেতু তাদের পেছনে রয়েছে ফেরাউন। এখানে প্রথম বিষয়টি চিন্তার দাবী রাখে, কে ছিলো মূসা, কেইবা ছিলো হারুন, কেইবা তাদেরকে জানতো ও চিনতো। ফেরাউন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলো এবং সে নিজেও তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলো। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে, ফেরাউন তার সকল শক্তি নিয়োগ করছে, যাদুকরদের জড়ো করছে, একত্রিত করছে তার দেশের জনগণকে, তারপর সে তার সভাসদদের নিয়ে বসে দু'পক্ষের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করছে। এখন চিন্তা করা দরকার, ফেরাউনের মতো এতো বড়ো শক্তিদর্পী বাদশাহ কেমন করে মূসা (আ.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করে নিলো এবং কেমন করে চললো এই দীর্ঘ সময় ধরে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অথচ মূসা তো ছিলো তার শত্রুপক্ষ বনী ইসরাঈল জাতির একজন সদস্যমাত্র। যাদের সে বহু বছর ধরে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো এবং তার শক্তি ক্ষমতার সামনে তারা অত্যন্ত হীনতাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিলো।.............. এর কারণ একথা ছাড়া আর কিছু বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তায়ালা মূসা ও হারুন (আ.)–এর প্রচন্ড এক ভীতি ফেরাউনের অন্তরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই তাদের সাথে আছেন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যিনি শোনেন ও দেখেন।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, শীর্ষস্থানীয় যাদুকরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে নানা প্রকার মতপার্থক্য। এরা সারা দেশের ওস্তাদ যাদুকর– এরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না কি করবে। অতপর এরা গোপনে পরামর্শ করতে শুরু করছে, দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় এরা গলদঘর্ম। এদের চেহারা ছবি দেখে বুঝা যাচ্ছে এরা দারুণ দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে এবং গোটা সমাবেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এরা জনগণকে শান্ত করার চেষ্টা করছে যেন তারা মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, তাদের দলের মধ্যে বিশৃংখলা না ঘটে এবং সবাই যেন ধীরস্থিরভাবে প্রতিযোগিতা পর্ব সমাপ্ত হতে সাহায্য করে– তার জন্যে সব ওস্তাদ যাদুকররা মহাব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে।

এরপর দেখা যাচ্ছে তারা এগিয়ে এলো,

'বললো, হে মূসা, তুমি কি প্রথমে তোমার যাদু ছাড়বে না আমরাই প্রথমে আমাদের যাদু দেখাবো?'

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিলো ময়দানে বাস্তব প্রতিযোগিতা, একযোগে সে যাদুকররা তাদের জারিজুরি প্রদর্শন করতে, বাদশাহর প্রতি তাদের আনুগত্য দেখাতে এবং এখন তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমতাবস্থায়,

'মূসা বললো, বরং তোমরাই ছাড় তোমাদের যাদু প্রথমে'...........

অর্থাৎ মূসা (আ.) তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, প্রশান্ত বদনে তাদের সুযোগ দিলেন তাদের যাদুবিদ্যা দেখানোর জন্যে এবং তাঁর নিজের জন্যে শেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার মওকা হাতে রেখে

দিলেন .... কিন্তু, প্রশ্ন দাঁড়ায়? হাঁ, যা ময়দানে প্রকাশ পাচ্ছে তা অবশ্যই এক ভয়ংকর যাদু, সারা মাঠ জুড়ে হঠাৎ করে কিলবিল করে ওঠলো সঞ্চরণশীল কিছু জীব, দেখা যাচ্ছে সবার চোখে-মুখে আতংকের ছাপ। এমনকি আল্লাহর নবী মূসা (আ.) ও (মনে মনে) ভীষণ শংকাগ্রস্ত। দেখুন ওই দৃশ্য আল কোরআন কিভাবে উদ্ধৃত করছে,

'দেখা গেলো, তাদের রশি ও লাঠিগুলো, সবকিছু তার কাছে মনে হলো তাদের যাদুর কারণে ছুটোছুটি করছে।' তখন মূসা (আ.) মনে মনে কিছু ভীতি অনুভব করলেন।

কিন্তু মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর রব বর্তমান আছেন এবং তিনি তাকে দেখছেন, এ অনুভূতি থাকা সত্তেও অর্থাৎ, ওদের যাদু করা রশিগুলো যখন বিরাট বিরাট সাপ হয়ে নড়ে বেড়াতে লাগলো, তখন মূসা (আ.)-ও ভয় পেয়ে গেলেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে দেশের যাদুকরদের এগুলো ছিলো সব থেকে বড়ো যাদু। তাঁর মনে ভয় সৃষ্টি হওয়া অবশ্যই একথার প্রমাণ দেয় যে বিষয়টি একেবারে সাধারণ জিনিস ছিলো না এবং কিছুক্ষণের জন্যে তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলো যে তিনি ওদের থেকে (আল্লাহর রহমতে) বেশী শক্তিশালী। যাই হোক, অবশেষে তাঁর রব তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁর সাথে রয়েছে মহাশক্তি (মহান আল্লাহর শক্তি)। এরশাদ হচ্ছে,

'বললাম, আমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় তুমিই বিজয়ী হবে, ফেলে দাও তোমার ডান হাতের জিনিসটি। এটা খেয়ে ফেলবে সে সকল জিনিসকে যা ওরা বানিয়েছে। ওরা যা বানিয়েছে তা যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আর যাদুকররা যা কিছুই নিয়ে আসুক না কেন তা সাফল্যমন্ডিত হয় না।'

এ আয়াতে বলা হচ্ছে, ভয় পেয়ো না, তুমিই জয়ী হবে। কেননা তোমার কাছে রয়েছে সত্য সঠিক জিনিস, আর ওদের কাছে রয়েছে বাতিল শক্তি, তোমার কাছে রয়েছে সত্য সঠিক বিশ্বাস, আর ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে চরম দুর্ভাগ্য। তোমার কাছে রয়েছে ঈমান যা তোমাকে সাহায্য করে সেই নীতির ওপর মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, যা তুমি গ্রহণ করেছো, আর ওদের পৃথিবী-কেন্দ্রিক ভালো কাজ ও দান খয়রাত– তার প্রতিদান ওরা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। জেনে রাখো, তুমি বিজড়িত রয়েছো সেই মহাশক্তির মালিকের সাথে, যাঁর সামনে সব কিছুই তুচ্ছ। ওরা নশ্বর জীবনসম্পন্ন মানুষের জন্যে কাজ করছে, তা তারা যতোই অহংকারী ও শক্তিশালী হোক না কেন।

সুতরাং ভয় পেয়ো না 'এবং ফেলে দাও তোমার ডান হাতের বস্তুটি।' একথা দ্বারা যতো বড়ো জিনিসই ওরা করে থাকুক না কেন তাকে তুচ্ছ করা হচ্ছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে যা কিছু ওরা তৈরী করেছে তোমার হাতের বস্তুটি সবই খেয়ে ফেলবে। তুমি নিশ্চিত থাক, যা তুমি দেখছো, ওটা নিছক এক ভয়ংকর যাদু– যাদুকরের এক হীন প্রচেষ্টা ও কাজ মাত্র। আর জেনে রাখো যে কোনো যাদুকর কখনই শেষ পর্যন্ত সাফল্যমন্ডিত হয় না। তা সে যেভাবে যতো চেষ্টাই করুক না কেন, কারণ সে তো মনগড়া কিছু তদ্বীর করে চলেছে মাত্র সে এমন কোনো সত্য জিনিসের ওপরে নির্ভর করে নেই। যা টিকে থাকতে পারে। তাদের অবস্থা হচ্ছে যে কোনো পথের সত্য পথের পথিক এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল কোনো লোকের মোকাবেলায় মিথ্যা ও দুর্নীতিবাজ কোনো ব্যক্তির রুখে দাঁড়ানোর অবস্থার মতো। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, যখন ওই মিথ্যার ধ্বজাধারীরা আত্মপ্রত্যয়ী কোনো হকপন্থীর মোকাবেলায় দাঁড়ায় তখন সে ভালো করেই জানে ও বুঝে যে, সে নিজে হক পথের ওপর নেই এবং এ কথাও সে জানে ও তার মনে এ ভয়ও আছে যে, সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সত্য থেকে দূরে থাকার জন্যে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন এবং সত্য থেকে গাফেল হয়ে থাকার জন্যে যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন সত্য

অবশ্য অবশ্যই, অবশেষে বিজয়ী হবে এবং বাতিলের পরাজয় অনিবার্য্য। চিরন্তন এই নিয়ম অনুযায়ী মূসা (আ.)-এর লাঠিটি বিরাট অজগর রূপ ধারণ করে ওই যাদুকরদের সকল সাপগুলো গিলে খেয়ে ফেললো- এভাবে মিথ্যার চূড়ান্ত পরাজয় সূচিত হলো।

ঘটনার বিবরণে আল কোরআন জানাচ্ছে, মূসা (আ.) লাঠিটি ফেলে দিলেন, সাথে এবং অতীব বিস্ময়করভাবে আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ওই লাঠিটি এক ভীষণ শক্তিশালী সাপের রূপ ধারণ করলো এবং পুরস্কারের জন্যে আশান্বিত যাদুকরদের সকল আশা নস্যাৎ করে দিয়ে সকল যাদুর সাপগুলো গলাধকরণ করে ফেললো। হায়, এরা তো এসেছিলো বুকভরা আশা নিয়ে যে, আজ রাজকোষ থেকে তারা প্রাণভরে অর্থ লাভ করবে এবং রাজার একান্ত প্রিয়জনে পরিণত হবে; কিন্তু এক্ষণে তাদের সকল আশায় ছাই পড়ায় তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো। যে পারদর্শী যাদুকররা ভেবেছিলো, মূসা (আ.) তাদের যাদুর সাপগুলো দেখে ভড়কে গেছেন তারাও হতাশ হয়ে গেলো।

প্রথমত রসূল হলেও তাঁর কাছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আকস্মিকভাবে সে রশিগুলো চলমান প্রকৃত সাপ বলেই মনে হয়েছিলো। কেন এমন হয়েছিলো তা কোনো কথা দিয়ে বুঝানো যাবে না বা এ ব্যাপারে কোনো যুক্তিও প্রদর্শন করা যাবে না, কিন্তু যাদুকরদের সব জারিজুরি যখন ব্যর্থ হয়ে গেলো তখন তারা বুঝলো, অবশ্যই মূসা (আ.) আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং এজন্যে তারা সাথে সাথে সেজদায় পড়ে গেলো। এরশাদ হচ্ছে,

'অতপর, যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেলো, বলে উঠলো, আমরা হারুন ও মূসার রবের ওপর ঈমান আনলাম।'

আল্লাহর নবী মূসা (আ.)-এর ফেলে দেয়া লাঠির এতো বড়ো সাপে পরিণত হওয়া এবং উপস্থিত যাদুকরদের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুর প্রাসাদ তাসের ঘরের মতো উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটা ওদের ধমনীতে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো যে, তাদের দেহ মন থর থর করে কেঁপে ওঠলো। খুলে গেলো তাদের পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াতের বন্ধনগুলো এবং ঝলমল করে জ্বলে উঠলো সত্য সুন্দরের নূর, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেলো ঘনান্ধকারের দুর্বীনিত পর্দা। এটাই হচ্ছে মানুষের অন্তরের ওপর ঈমানের বজ্র কঠিন স্পর্শ, যা মুহূর্তের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে হেঁচকা টানে কুফুরীর গহ্বর থেকে বের করে ঈমানের শুভ্র সমুজ্জ্বল প্রান্তরে এনে দেয়।

কিন্তু এটাও সত্য ঈমানের এই গোপন রহস্যের সন্ধান তারা পায় না যাদের অন্তর আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের জগদ্দল পাথরের আড়ালে ঢাকা থাকে। কি করে তারা সুমহান ঈমানের মধুর পরশ পাবে! কেমন করে তারা পরিবর্তনের এই গোপন রহস্য জানবে! আর যখন তারা অহংকার করলো ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠলো, তখন এ কথা ভুলে গেলো যে, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা কার, আর তারা দেখতে থাকলো, নানা প্রকার ইশারা ইংগিত দ্বারা, তাদের অনুসারীরা আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি কটাক্ষপাত করছে। তারা একথাও ভুলে গেলো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। একথাও তারা ভুলে গেলো যে, আল্লাহর সাথে একবার যদি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়, আর ওই সম্পর্ক ধরে রাখার যদি জন্যে কেউ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং মহান আল্লাহর নূরের আলোকে যদি কেউ নিজেকে আলোকিত করতে মনস্থ করে, তাহলে তার ওপর অন্য কারো ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তা সে যেই হোক না কেন। এরশাদ হচ্ছে,

‘সে (ফেরাউন) বলে উঠলো, ঈমান এনে ফেললে তোমরা আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? হুঁ (বুঝতে পেরেছি), অবশ্যই সেই তোমাদের ওস্তাদ, সে তোমাদের যাদু বিদ্যা শিখিয়েছে। ঠিক আছে, অবশ্যই আমি কেটে ফেলবো তোমাদের হাত ও পাগুলো বিপরীত দিক থেকে (অর্থাৎ ডান হাত বাম পা এবং বাম হাত ডান পা– এই কায়দায় সকলের হাত পা কাটা হবে যাতে করে তোমরা জীবনে বাঁচলেও চলাফেরা করতে না পার), আর তারপর আমি তোমাদের খেজুর গাছের সাথে (বেঁধে) শূলে চড়াবো (অর্থাৎ খেজুর গাছের সাথে বেঁধে, তারপর পেরেক মেরে, মেরে ফেলবো), আর তখনই বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।’

‘ঈমান এনে ফেললে তোমরা আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই?’

এই বাক্যটি উচ্চারিত হলো সেই অত্যাচারী, যুলুমবাজ ও অহংকারী ব্যক্তির মুখে, যে বুঝে না যে সে ব্যক্তিরা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ ঈমান তাদের অন্তর বশীভূত করে ফেলেছে– ইচ্ছা করলেও ঈমানের এই আকর্ষণ থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারে না। আর অন্তরের অবস্থান হচ্ছে মহা দয়াময় পরওয়ারদেগারের আংগুলের মধ্যে দুটি আংগুলের মাঝখানে, কাজেই তিনি যেভাবে তাকে চালাতে চান চালাতে পারেন। কেননা ঈমান তাদের অন্তরগুলোকে ছোঁয়া দিয়ে বশ করে ফেলেছে। ইচ্ছা করলেও তারা নিজেদের এই নেয়ামত থেকে আর ফিরিয়ে রাখতে পারে না। হাঁ, বুঝা গেছে, ‘ওইই হচ্ছে তোমাদের নেতা, যে তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে– তাই না?’ খেয়াল করুন, যাদুকরদের সম্বোধন করে ফেরাউন বলে উঠলো, ‘ওইই হচ্ছে তোমাদের নেতা, যে তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে......ওরা যে আত্মসমপর্ণ করলো, কেন বিনা শর্তে এই আত্মসমর্পণ করলো, তার রহস্য এখানে এটা মোটেই ঠিক নয় যে, ঈমান তাদের অন্তরের মধ্যে অতি সংগোপনে বিরাজ করছে সে বিষয় তারা কিছুতেই বুঝছে না, আর এটাও ঠিক নয় যে, আল্লাহর অদৃশ্য হাতই ভুল পথের পর্দা সরিয়ে দিয়ে তাদের চোখগুলো খুলে দিয়েছে।

এরপর সে যাদুকরদের বশীভূত করার জন্যে কঠিন কষ্ট দেয়া হবে চরমভাবে– এই ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং অহংকারী রাজা-বাদশাহরা বরাবর এভাবেই মানুষকে যুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকে। তাদের শরীরকে গোলাম বানানোর সাথে সাথে তাদের মনকেও তারা বশীভূত করতে চায়। এরশাদে রব্বানীতে সে কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে, ‘অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পাগুলো বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব এবং খেজুরের গাছের সাথে বেঁধে তোমাদের শূলি দেবো।’

এরপর সে কঠিন সত্য প্রকাশিত হচ্ছে, শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হলে মানুষ দুর্বল মানব শ্রেণীর ওপর নির্যাতন চালিয়ে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়– এটা হচ্ছে জংগলের পশু-শক্তির শামিল। এ শক্তি অসহায় মানুষের অংগ-প্রত্যংগ বিচ্ছেদ ঘটায় এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাও বিগড়ে দেয়, তাদের শিরা উপশিরা এবং নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে ফেলে দেয়, যেমন হিংস্র জন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে দুর্বল প্রাণীকে নিধন করে। তাই ফেরাউনের ঘোষণা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, ‘আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কে অধিক শক্তিশালী এবং কে অধিক দীর্ঘস্থায়ী!’

কিন্তু অতীতেও এমন বহু বলদর্পী ক্ষমতাধরদের দাপট দেখা গেছে এবং সময়ান্তরে তাদেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু সেসব যালেম ঈমানী শক্তিকে নিশেষে মুছে ফেলতে পারেনি। কেননা এ শক্তির তাপ হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে গিয়ে এমনভাবে মানুষকে উজ্জীবিত করে যে দুনিয়ার কোনো যুলুম নির্যাতন তাকে আর দুর্বল করতে পারে না। তখন সে পাহাড়ের মতো দৃঢ় ও মযবুত হয়ে

ওঠে, তার সামনে পার্থিব সকল শক্তি ক্ষমতা তুচ্ছ হয়ে যায় এবং সকল অহংকারী রাজা বাদশাহর ক্ষমতা লীন হয়ে যায়। আর সত্য পথের পথিক এ জীবন এবং জীবনের সকল চাহিদা তুচ্ছ করে হক ও ন্যায়ের পথে টিকে থাকার জন্যে নিজের জীবনকে সর্বপ্রকার ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে। এভাবেই যখন হকপন্থীরা দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তখনই এহেন মানুষদের হৃদয়ের দুয়ার খুলে যায়, তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় দিগন্তব্যাপী গোটা ধরণী, যার কারণে এ পৃথিবীর লোভ ও লাভ তাদের আর স্পর্শ করতে পারে না, নশ্বর এ দুনিয়ার কোনো কষ্টই তাদের কাছে আর কষ্ট বলে মনে হয় না, দুনিয়ার জীবন ও এ জীবনের সকল আমোদ ফুর্তির জিনিস তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। এই জন্যে দেখুন, সে নবদীক্ষিত মুসলমানের দল (সাবেক ফেরাউনপন্থী যাদুকরদের) কথা, 'ওরা বললো, কিছুতেই সেই জিনিসের ওপর তোমাকে আমরা প্রাধান্য দেবো না যা সুস্পষ্ট সত্যের দলীল হিসাবে আমরা পেয়েছি, আর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপরেও আমরা তোমাকে শক্তিশালী মনে করবো না। অতএব, আমাদের সম্পর্কে যে ফয়সালাই করতে চাও করো। তুমি তো এই দুনিয়ার জীবনেই যা কিছু করার করবে– তাই না? অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের ওপর যাতে করে তিনি আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন, আর তিনি আমাদের ক্ষমা করেন আমাদের সেসব যাদু করার অপরাধ ও ত্রুটি বিচ্যুতি, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আর আল্লাহ তায়ালাই উত্তম এবং তিনি চিরস্থায়ী।

এটিই হচ্ছে ঈমানের প্রভাব সেসব অন্তরের ওপর, যা এ পর্যন্ত ফেরাউনের জন্যে পাগলপারা ছিলো এবং তার নৈকট্য হাসিল করার জন্যে এবং তার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্যে লালায়িত ছিলো, আর এজন্যে মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তারা এতো আগ্রহী ছিলো, কিন্তু এরপর যখন তারা আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার নমুনা দেখলো তখন তারা ফেরাউনের ক্ষমতার অসারতা গভীরভাবে উপলব্ধি করলো এবং ফেরাউনের রাজত্ব ও ক্ষমতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে গেলো। বজ্র নির্ঘোষে তারা বলে ওঠলো, (তাদের কথা উদ্ধৃত করা হচ্ছে),

'ওরা বললো, কিছুতেই আমরা আর তোমাকে গুরুত্ব দেবো না সে সুস্পষ্ট দলীলের ওপর যা আমরা দেখতে পেয়েছি, আর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপর তোমাকে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বলেও আমরা মনে করবো না। তাঁর ক্ষমতাই আমাদের ওপর অধিক কার্যকর এবং তাঁর সম্মানই আমাদের নযরে অধিক ও মহান, 'অতএব আমাদের সম্পর্কে যে ফয়সালাই তুমি করতে চাও করো।'

অর্থাৎ, যতো পারো খাটাও, আমাদের ওপর তোমার ক্ষমতা এ পৃথিবীর জীবন পর্যন্ত। 'তুমি তো বড়ো জোর আমাদের ওপর দুনিয়ার জীবনেই ক্ষমতা খাটাবে।' এ দুনিয়ার বাইরে আমাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। দুনিয়ার জীবন যতোই জাঁকজমকপূর্ণ হোক বা যতো হীন অবমাননাকরই হোক, আসলে এ জীবন সংকীর্ণ, বড়োই তুচ্ছ, আর পৃথিবীর এ জীবনে তুমি আমাদের যতো কষ্টই দাও না কেন তা অবশ্যই ওই আযাব থেকে সহজ, যা আল্লাহর কাছে রয়েছে। সেই আযাবকে বেশী ভয় করা দরকার এবং সেই চিরস্থায়ী জীবনের কষ্ট সম্পর্কে আরো বেশী চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়। 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের ওপর যাতে তিনি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দেন, মাফ করে দেন সেই যাদু করার গুনাহ যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছো।' অর্থাৎ তুমি যখন আমাদের নবী মূসা (আ.)-এর সাথে যাদু প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে হুকুম দিয়েছিলে, ঈমান না থাকায় তখন আমরা বুঝেছিলাম তোমার হুকুম পালন না করে

আমাদের কোনো উপায় নেই। এখন আমরা ঈমান এনেছি এবং আশা করছি, তোমার জবরদস্তিতে পড়ে আমাদের দ্বারা যা কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেছে, অবশ্যই তা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন 'এবং অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন উত্তম এবং তিনিই স্থায়ী।' অর্থাৎ উত্তম আশ্রয় ও উত্তম সংগী হিসেবে তিনিই সব কিছু থেকে শ্রেয়। তাঁর দেয়া প্রতিদান ও পুরস্কারই অন্য সব কিছু থেকে স্থায়ী.........তুমি আমাদের যতোই কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির ভয় দেখাও না কেন তাতে আমাদের কোনো পরওয়া নেই।

ফেরাউনকে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

এখানে অবশ্যই একথা বুঝতে হবে যে, যাদুকররা ঈমান আনার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে 'এলহাম' নাযিল করে তাদের মযবুত করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সে বিদ্রোহী বাদশাহর জন্যে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে নির্দেশ দান করেছিলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই যে কোনো ব্যক্তি তার রবের কাছে অপরাধী হয়ে হাযির হবে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম যেখানে সে মরবেও না, আর (প্রকৃত অর্থে) যিন্দাও থাকবে না।'

অর্থাৎ যেমন মৃত্যু এসে সে কঠিন আযাবের দুঃসহ জ্বালার অবসান ঘটাবে না, তেমনি জাহান্নামের মধ্যে এতো কষ্ট হতে থাকবে যে, বেঁচে থাকার স্বাদও সে পাবে না।' আর সেদিন যে সব মোমেন ব্যক্তি সর্বপ্রকার ভালো কাজ করার রেকর্ড নিয়ে হাযির হবে, তাদের জন্যেই রয়েছে বড়ো বড়ো মর্যাদার আসন। চিরস্থায়ী এবং চির সবুজ সুষমাময় বাগ-বাগিচায় তারা বাস করবে, যার নীচু বা পাশ দিয়ে ছোট ছোট নদী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত হতে থাকবে, আর এটিই তো সঠিক পুরস্কার সে সব ব্যক্তির জন্যে, যারা পবিত্র জীবন যাপন করেছে।'

কল্পনা ক্ষেত্রে একবার তাকিয়ে দেখুন ওই দৃশ্যের দিকে, ফেরাউন যাদুকরদের এই বলে ভয় দেখাচ্ছে যে, সে এক সংগে সবাইকে হত্যা করবে না এবং হঠাৎ করেও মেরে ফেলবে না; বরং সে এমন শাস্তি দেবে যা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং তিলে তিলে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা দিতে থাকবে। এমন সময় সে ব্যক্তিদের জানানো হচ্ছে, যে ব্যক্তি অপরাধী থাকা অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাযির হবে তার জন্যে রয়েছে (দুনিয়ার এসব কষ্ট থেকে) আরও কঠিন এবং আরও স্থায়ী আযাব। 'তার জন্যে রয়েছে এমন জাহন্নাম, যেখানে সে মরবেও না, সত্যিকারে যিন্দাও থাকবে না।'– অর্থাৎ মৃত্যু এসে এ আযাবের অবসান ঘটাবে না বা আযাব শেষ হয়ে গিয়ে জীবনের শান্তি যে ফিরে আসবে তাও হবে না। অপরদিকে জান্নাতীদের জন্যে বাড়তি খোশখবর হচ্ছে যে, তাদের মহান মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হবে। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেসব বাগ বাগিচাভরা বাসস্থানে যার নীচু বা পাশ দিয়ে কুলু কুলু স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হতে থাকবে। আর জীবনে যে পবিত্রতা অর্জন করবে তার জন্যেই রয়েছে এই প্রতিদান।' তাদের সকল গুনাহ খাতা থেকে পবিত্র করা হবে।

দেখুন, সেই কঠিন দিনে মোমেন দিলগুলো কেমন করে রাজার কথাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে ও সে অহংকারী বিদ্রোহী বাদশাহর ভীতি প্রদর্শনের প্রতি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। যেহেতু তাদের অন্তর নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ও জান্নাতের আশায় ভরপুর, তাই তারা ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে সে যালেম শাসকের মোকাবেলা করছে– তাদের সুমহান মর্যাদাপূর্ণ ঈমান নিজ শক্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠছে এবং গভীর ও খাঁটি বিশ্বাস আত্মপ্রকাশ করছে পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে; বরং নবদীক্ষিত এই ঈমানদাররা ভীত হওয়ার পরিবর্তে সে বলদর্পী শাসককেই তার করুণ পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছে।

আর মানব ইতিহাসের পাতায় এ দৃশ্য আজও অম্লান হয়ে আছে যে, মুক্ত হৃদয় মানুষ পৃথিবীর সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, স্বৈরাচারী বলদর্পী শাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে তাদের ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে। শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে দেয়া লোভ লালসা বা ভয় ভীতি কোনো কিছুই তাদের দৃঢ়তাকে ভাঙতে পারেনি। আর এই বজ্র কঠোর অবস্থানে উপনীত হওয়া আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

এখানেই এ দৃশ্যের ওপর যবনিকা পাত হচ্ছে এবং নতুন আর একটি কাহিনীর দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে,

আসলে এ দৃশ্যের মধ্যে সত্য ও দৃশ্য জগতের বাস্তব ক্ষেত্রে ঈমানের বিজয় যাত্রা চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্র পার হতে দেখা যাচ্ছে, এ দৃশ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এ বিজয় নেমে এসেছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি, যাদুর জারিজুরি বানচাল করে দিয়েছে আল্লাহর শক্তিরূপী নিদর্শন মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠিটি। এ ছিলো এমন এক মোজেযা যা যাদুকরদের অন্তরগুলোকে বশীভূত করে ফেলেছিলো এবং তাদের আর না-হক পথে ফিরে যেতে দেয়নি। অপরদিকে ঈমানী শক্তির প্রতাপ বাতেলের ভয় ভীতি ও বাতেলের সকল আকর্ষণ খতম করে দিয়েছে, ভ্রুকুটি দেখিয়েছে ফেরাউনের রক্তচক্ষু ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকে। অতপর দেখা যাচ্ছে হক এখানে বাতিলের ওপর বিজয়ী হল এবং গোমরাহীর ওপর ছেয়ে গেলো সত্যের শুভ্র সমুজ্জ্বল বাতি; বিজয়ী হল অহংকারী ও তাগূতী শক্তির ওপর ঈমানের দৃঢ়তা। আরো দেখা যাচ্ছে, শেষের সাহায্যের সাথে প্রথম সাহায্যের পরিপূর্ণ সম্পৃক্ততা; সুতরাং এটা প্রতীয়মান হলো যে, অন্তর জগতেই সত্য প্রথমে স্থান করে নেয় এবং তারপরই দেখা যায় বাস্তব জীবনের সর্বত্র এ বিজয় ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই সত্য পথের পথিকরা যখন জীবনের গোপন অংশগুলোতে মিথ্যার ওপর জয়ী হয়, একমাত্র তখনই জীবনের প্রকাশ্য বিষয়গুলোতে তাদের বিজয়ী হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্য সঠিক হক পথ ও ঈমানের নিজস্ব কিছু তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, চেতনার মধ্যে যখন এসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তখন সে বৈশিষ্ট্যগুলো আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং এমনভাবে এর সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় যে, মানুষ এর মাধুরী বাস্তবে দেখতে পায়। অতপর যদি ঈমানের বাহ্যিক রূপ দেখা যায়, কিন্তু অন্তরে ছাপ না পড়ার কারণে এর বাস্তব ফায়দা পাওয়া না যায় তাহলে বাস্তবে মানুষ সে সত্যকে কোনো সত্য বলে বুঝতে পারে না। আবার সত্য বলতে এমন কিছু বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত বস্তু বুঝায় যা মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে, কিন্তু তা যদি বিবেক থেকে না হতে থাকে তাহলে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ও মিথ্যাই জয়ী হয়ে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, পৃথিবীতে সাধারণত দেখা যায় মিথ্যা শক্তি ও আল্লাহদ্রোহীরা বস্তু শক্তির ওপর এমনভাবে কর্তৃত্ব করে চলেছে, মনে হয় এদের মোকাবেলা করার কোনো উপায়ই নেই এবং এদের সামনে সত্য ও ঈমান দাঁড়াতেই সক্ষম নয়... এ জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে ঈমানের মূল তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অনুভূত হতে হবে এবং হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট হতে হবে সত্যের প্রকৃত মর্ম, তাহলেই বাস্তব সত্য ও হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত ঈমানী শক্তি সে সকল স্থূল বস্তু শক্তির ওপর বিজয়ী হতে পারবে, যা নিয়ে বস্তুবাদীরা বড়াই করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এই অবস্থাটাই মূসা (আ.)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছিলো। যাদুকরদের যাদুর উপস্থিত তেলেসমাত তাঁকে কাবু করতে চেয়েছিলো, কারণ তাঁর কাছে বাহ্যিক বস্তু শক্তি ছিলো না। অপর দিকে ফেরাউনের হাতে বস্তু শক্তি থাকাতে যাদুকররা তার ও তার অনুচরদের অনুগত গোলামে পরিণত হয়েছিলো, এই কারণেই সত্যকে পৃথিবীর বুকে বিজয়ী বানানো হল যার বিবরণ এই সূরার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি। বলা হচ্ছে,

আর ওহীর মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে মূসাকে নির্দেশ দিয়েছিলোম .... আর ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করলো এবং নিজেও সে হেদায়াত পেলো না। (আয়াত ৭৭-৭৯)

আবার দেখুন, বর্তমান আলোচনা প্রসংগে একথা জানানো হয়নি যে বিদ্রোহী ও ক্ষমতাদর্পী বাদশাহ ফেরাউনের সাথে ঈমানের প্রতিযোগিতার পর যাদুকরদের সাথে ফেরাউন ও তার দরবারীরা কি ব্যবহার করেছিলো। তারপর যখন তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিলো, তখন তাদের ফেরাউন বিপরীত দিক থেকে হাত পা কাটার ধমকে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ব্যক্তিদের সাথে বাস্তবে কি ব্যবহার করেছিলো তার কোনো বিবরণ পেশ করা হয়নি। এরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলো দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়ার সকল ভোগ বিলাসিতার বস্তুকে। তারা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হওয়ার পরই দেখতে পেলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার নিদর্শন এবং তখনই তাদের অন্তর ঝুঁকে ছিলো সারা বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর দিকে। তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর মোমেন বান্দাদের পরিচালনা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাঁর নেক বান্দাদের সাহায্য করেন। তারপর যখন মূসা (আ.)-এর জাতি ঘর-বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে সাগরের কিনারায় পৌঁছে গেলো এবং এ মহাসাগরের উত্তাল তরংগ তাদের গতি রোধ করলো, তখন কি ঘটল তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া হয়নি। অন্য সূরাতে এসব বিবরণ কিছু জানা যাবে।

এখানে বেশী কোনো প্রকার ভূমিকা না দিয়ে শুধু আল্লাহর সাহায্যের কথাটাই তুলে ধরা হয়েছে, কেননা যেসব কারণে আল্লাহর সাহায্য আসে তা মোমেনের দিল-দেমাগের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এখানে যে কথাটার দিকে বিশেষভাবে ইংগিত করা হয়েছে তা হচ্ছে মূসা (আ.) যেন আল্লাহর বান্দা বনী ইসরাঈলদের ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে নিয়ে যেতে পারেন এবং এজন্যে তাঁকে রাত্রের অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তারপর মূসা (আ.) সাগরের বুকে এক শুকনা পথ রচনা করলেন, এতোটুকু বলেই অন্য প্রসংগে চলে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু এ সফরের আর বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেয়া হয়নি।এজন্যে আমরাও আয়াতে বর্ণিত কথার মধ্যে যতোটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছি। এখানে আমরা এতোটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাহায্য অবশ্যই মোমেনদের জন্যে অবধারিত। আল্লাহ তায়ালাই মূসা (আ.) এর দ্বারা তাদের নিয়ে গেলেন সাগরের দিকে। মূসা নবী নির্ভিক চিত্তে তাঁর জাতিকে নিয়ে গেলেন। ফেরাউন বা তার বাহিনী তাদের কিছুতেই ধরতে পারবে না– এ ব্যাপারে তাঁর মন ভয় ভাবনাহীন হয়ে রইলো। সমুদ্রের উত্তাল তরংগ ও তাঁর মনে কোনো উৎকণ্ঠা জাগালো না, কারণ আল্লাহর হুকুমেই তিনি এসব পদক্ষেপ নিতে অগ্রসর হয়েছেন। কাজেই (আল্লাহর হুকুমে লাঠির আঘাত করায় পানি ভাগ হয়ে) শুকনা রাস্তা যখন বেরিয়ে গেলো, তখন নিশ্চিন্ত মনে তিনি নিজ জাতিকে নিয়ে সেই পথে এগিয়ে গেলেন। তারপর তাদের পার হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর কুদরত প্রবাহমান পানিকে তার প্রকৃতি অনুসারে আবারও মিলিয়ে দিলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে যখনই ইচ্ছা হয়েছে তখনই আল্লাহ তায়ালা তারই দেয়া এই প্রকৃতি বদলে দিয়েছেন এবং পানির মধ্য থেকে শুকনা পথ বের করেছেন! এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর ফেরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে অনুসরণ করলো তাদের, অতপর সাগরের উত্তাল তরংগ তাদের ঢেকে ফেলল পুরোপুরিভাবে। এভাবে ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করলো এবং কিছুতেই সে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেনি।'

ফেরাউন ও তার অনুসারীদের পরিণতি

এভাবে সংক্ষেপে ফেরাউন ও তার জাতির সলিল সমাধির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হয়নি, এতে করে মানুষের স্মৃতিতে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের সে কঠিন অবস্থার স্মৃতি জাগরূক থাকে। বিস্তারিত তথ্য সাধারণভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখা মুশকিল বিধায় শুধুমাত্র না-ফরমানীর শাস্তি সম্পর্কিত কথাগুলো এখানে বলা হয়েছে। হায় হতভাগা বিদ্রোহী অহংকারী বলদর্পী শাসক! ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় সে তার নিজের জাতিকে নিকৃষ্টভাবে পরিচালনা করেছে এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তার জাতিকে সে সাগরের দিকে এমন নিকৃষ্টভাবে পরিচালনা করলো যে, সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তার গোটা জাতিকেও ধ্বংস করে ছাড়লো।

ফেরাউনের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আমরাও শুধুমাত্র ততোটুকু; আলোচনা করে ক্ষান্ত হয়েছি যতোটুকু আল কোরআনের আলোকে আমরা বুঝতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাকেই আমরা হেকমতের দাবী বলে বুঝেছি। আমরা তো আল কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে বাস্তব জীবনের জন্যে শিক্ষা নিতে চাই। কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া আমাদের কোনো আসল উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাই যেন আমাদের মনের ওপর অতীতের কোনো ঘটনার বিবরণ এমনভাবে দাগ কেটে যায় যেন ভবিষ্যতে আমরা সতর্ক হতে পারি।

আল কোরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলো দ্বারা আল্লাহর কুদরত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। সকল কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ঈমান ও আল্লাহ দ্রোহিতার মধ্যে বিরাজমান চিরন্তন বিরোধের কথাকে সুস্পষ্ট করে তোলা। সুতরাং আলোচ্য ঘটনায় ঈমানদারদে শুধুমাত্র ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর নির্দেশ মানতে এবং রাত্রে মূসা (আ.)-এর সাথে ঘর বাড়ী ছেড়ে তাদের বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে (আক্রমণকারী ও আক্রান্ত) শক্তিদ্বয় সমান নয় এবং বাস্তব মতবাদের দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে তারা পরস্পরের কাছাকাছিও নয় যে, একদল আর এক দলকে সহ্য করতে পারবে। মূসা ও তাঁর জাতি শক্তির দিক দিয়ে পুরোপুরিই দুর্বল এবং ফেরাউন ও তার লোক লস্কর সকল ধরনের অস্ত্রসহ সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী; সুতরাং বস্তুগত দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে তাদের পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এখানে দেখা যাচ্ছে সকল ক্ষমতার মালিক রাজাধিরাজ নিজেই যুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন, কিন্তু ঈমান যখন স্থান করে নিলো সেসব যাদুকরের অন্তরে, যাদের কাছে ঈমানের হাতিয়ার ছাড়া আর কোনো হাতিয়ারই ছিলো না, তারা এই হাতিয়ারই ব্যবহার করলো এবং শক্তি ক্ষমতাদর্পী সে বাদশার মুখের ওপর ঈমানের ঘোষণা দিয়ে তারা বাদশাহকে আক্রমণের আহ্বান জানালো। তারা জানালো যে, তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, বাদশাহকেও নয়, বাদশাহর অনুকম্পাও তারা আশা করে না, তার ধমকের কোনো পরওয়াও তাদের নেই এবং তার কাছে কোনো পদমর্যাদা, মান-সম্মান-স্বার্থ কোনো কিছুই তারা কামনা করে না। এমতাবস্থায় দেখুন, অহংকারী বাদশাহ চূড়ান্তভাবে সতর্ক করতে গিয়ে তাদের জানিয়ে দিচ্ছে, 'অবশ্য অবশ্যই আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো এবং তোমাদের খেজুর গাছের সাথে বেঁধে শূলে চড়াবো।' এর জওয়াবে 'ঈমান' দৃঢ়তার সাথে জওয়াব দিলো, 'ঠিক আছে, যে ফয়সালা করতে তোমার মন চায় সে ফয়সালাই করো, তুমি তো এই জীবনের ওপরই যা করতে চাও করবে'.......... অর্থাৎ তাদের অন্তরের মধ্যে ঈমান ও না-ফরমানীর সংঘর্ষ

যখন বেধে গেলো। তখন পরিশেষে শক্তি ক্ষমতার আসল মালিক সত্যের ঝান্ডা এমনভাবে তুলে ধরলেন যেন তা সমুন্নত থাকে এবং ঈমানদারদের কোনো চেষ্টা ছাড়াই যেন মিথ্যার পতাকা অবনমিত হয়ে যায়।

আলোচ্য পাঠ থেকে অন্য যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে........... যখন ফেরাউনের হাতে বনী ইসরাঈলের বেটা ছেলেগুলো নিহত হচ্ছিলো আর তারা ওদের কন্যা সন্তানদের ছেড়ে দিচ্ছিলো, তখন আল্লাহর কুদরতী হাত সক্রিয় হয়ে উঠেনি এবং তাদের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপও করেনি। এর কারণ হচ্ছে, সে সময়ে বনী ইসরাঈলরা কিবতীদের ভয়ে হীনমন্য হয়ে ছিলো এবং সদা-সর্বদা ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতো, কিন্তু যখন সে যাদুকররা ঈমান আনার ঘোষণা দিলো, বনী ইসরাঈলরাও ঈমানদার হয়ে গিয়ে মূসা (আ.)-এর অনুগত হয়ে গেলো এবং ফেরাউনের পক্ষ থেকে তাদের নির্যাতন করার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকা সত্তেও বিশ্ব সম্রাটের ওপর নির্ভর করে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেলো এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করেও দ্বিধাহীন চিত্তে ফেরাউনের মুখের ওপর কালেমায়ে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করলো, তখনই সে সাক্ষাত-সমরের সমূহ সম্ভাবনার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতী হাত বাস্তবে এগিয়ে এলো। অবশ্য বাস্তবে সাহায্য নেমে আসার আগে, তাদের অন্তরের মধ্যে তাদের অন্তরাত্মার গভীরে সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিলো।

এই শিক্ষাটিকেই আলোচ্য প্রসংগে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিলেও ওপরে বর্ণিত দুটি ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। আশা করা যায়, এ কাহিনীর বিবরণী দ্বারা দাওয়াতদানকারী মোমেনরা এ বন্ধুর পথে কাজ করার জন্যে প্রচুর উৎসাহ পাবেন এবং বিরোধীদের শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে, মহাশক্তিমান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তারা সত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবেন। অতপর পার্থিব বস্তুগত সহায় সম্পদ না থাকা সত্তেও তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তির নিশ্চিত আশা নিয়ে সকল প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত শত্রুদের মোকাবেলায় বীরদর্পে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্তি ও শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি লাভের এই দৃশ্যের আলোকে আমরা সুস্পষ্টভাবে দুটি শিক্ষা পাচ্ছি। এক, আল কোরআনে বর্ণিত অতীতের ঘটনাবলীর আলোকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। দুই, আমাদের সতর্কতার সাথে ফয়সালা নিতে হবে, আমরা কোন পরিস্থিতিতে কি সিদ্ধান্ত নেবো। আলোচ্য ঘটনাদ্বয়, ঈমানের ঘোষণাদান, বস্তুগত সাজ সরঞ্জামের কিছু যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষাত সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হাতে নিজেদের সোপর্দ করা শিক্ষা দিচ্ছে। ঘটনাদ্বয় আমাদের আরো শিক্ষা দিচ্ছে যেন আমরা আল্লাহকে ভুলে না যাই, তাঁর সাহায্য ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের ওপর নির্ভর না করি এবং কোনো অবস্থাতেই অহংকারী না হয়ে ওঠি। আরো মনে রাখতে হবে; বাস্তব সমর ক্ষেত্রে যেসব বস্তুগত অস্ত্র ব্যবহৃত হবে তার কিছু না কিছুর অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত আমরা একেবারে খালি হাতে শত্রুর মোকাবেলায় যেন এগিয়ে না যাই।

তবে শত্রুর ব্যবহৃত অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্র যদি কিছু থাকে এবং তুলনামূলকভাবে নিজেদের সংখ্যা যদি কমও থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। লোকসংখ্যা ও অস্ত্র সংখ্যা সমান সমান হওয়া কোনো জরুরী নয়। আল কোরআন জানাচ্ছে, 'কত ছোট ছোট দল, আল্লাহর হুকুমে কত বড়ো বড়া দলের ওপর জয় লাভ করেছে।' সুতরাং সেনা সংখ্যা বা অস্ত্র সংখ্যা কম হলেও অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য ও সফলতা আশা করা যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে বনী ইসরাঈল জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে তোমাদের দুশমনদের থেকে নাজাত দিয়েছি......আর অবশ্যই আমি ক্ষমাকারী তার জন্যে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, আর তারপর হেদায়াতের পথ গ্রহণ করে। (আয়াত ৮০-৮২)

ওপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে বনী ইসরাঈল জাতি (সাগর পাড়ি দেয়ার পর) বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে গেলো, সেখান থেকে তারা ফেরাউন ও তার সৈন্য সামন্তকে ডুবে মরতে দেখলো। অতপর তারা তূর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। এখানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, মোমেনদের জন্যে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তি এমন এক বাস্তব সত্য, যা প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে জাগছে, কিন্তু এ সাহায্যের কথা বেশীর ভাগ মানুষ মনে রাখে না। এজন্যে আল্লাহর সাহায্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও জ্বলন্ত প্রমাণের কথা ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে সে অকৃতজ্ঞ জাতির সামনে! তাঁর অপার মেহেরবানীর কথা তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যেন তারা পেছনের কথা স্মরণ করে আল্লাহর নেয়ামতের অবদান ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে এর শোকরগোযারী করতে পারে।

ওদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিলো যে ওদের, ডান দিকে অবস্থিত তূর পর্বতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। একথা দ্বারা তূর পর্বতে মূসা (আ.)-এর সেই যাত্রার দিকে ইংগিত করা হয়েছে যার ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মিসর থেকে বেরিয়ে আসার পর চল্লিশ দিনের মধ্যে তাঁকে তাঁর রব নিজ সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সঠিক আকীদা ও জীবনের আইন কানুন সম্পর্কিত সেই কথাগুলো শুনিয়ে দেন যা বিভিন্ন ফলকে লিখিত আকারে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিলো। মূসা (আ.)-এর জাতি বনী ইসরাঈলকে একটি আদর্শ জাতি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সে ফলকগুলোতে লিখিতভাবে প্রেরিত হয়েছিলো আল্লাহর মহাবাণী। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তূর পবর্তের পবিত্র উপত্যকায় পৌঁছে তারা এক সুসংগঠিত ও আদর্শ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠবে এবং অন্য মানুষদের সত্য পথে আহ্বান জানাবে। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে তারা নিজেদের জীবনকে আদর্শ জীবন হিসাবে পেশ করবে। এরপর 'মান' নামক খাদ্য নাযেল হওয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, এগুলো একপ্রকার মিষ্টি খাদ্য, যা শিশিরবিন্দু আকারে পতিত হয়ে গাছের পাতার ওপর জড়ো হতো। আর 'সালওয়া' বলতে বুঝায় খুবই চর্বিদার এক প্রকার পাখী, যা মরুভূমির মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হতো। এগুলো সহজেই তারা ধরতে পারতো এবং খেতেও এগুলো বড়ো সুস্বাদু ছিলো। এগুলো ছিলো তাদের জন্যে মরুভূমির মধ্যে আল্লাহর মেহেরবানীর বহিঃপ্রকাশ। এগুলো এমন একপ্রকার পাখী যাদের গায়ে পশম নেই। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে এদের বনী ইসরাঈল জাতির কাছে পৌঁছে দিতেন। এভাবে এগুলো তাদের দৈনন্দিন খাবারে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তিনিই তাদের জন্যে তা ধরা সহজ করে দিয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাদের এসকল সহজলভ্য নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের ব্যবহার করার হুকুম দিচ্ছেন এবং তাদের সকল প্রকার না-ফরমানীমূলক কাজও ব্যবহার থেকে দূরে থাকার জন্যে সতর্ক করছেন। এ নেয়ামত ভোগ করার ব্যাপারে তারা দু-ধরনের বাড়াবাড়ি করতো, কখনও তারা অতিমাত্রায় খেতো, যার কারণে নানা প্রকার পেটের পীড়া দেখা দিতো, আবার কখনও কখনও আরো মুখোরোচক ও সুস্বাদু খাদ্য খাবারের দাবী জানাতো, অথচ যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদের মিসর থেকে বের করে এনে এই জনহীন বিয়াবানে আল্লাহ তায়ালা আশ্রয় দিয়েছিলেন সে দায়িত্ব তারা পালন করতো না। আল্লাহ তায়ালা তো তাদের এসব সহজলভ্য নেয়ামত দিয়ে চেয়েছিলেন যে, তারা পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে, আর এসব দায়িত্ব পালন না করায় আল্লাহ তায়ালা তাদের বিদ্রোহী জাতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা বিদ্রোহাত্মক নানা প্রকার কাজ করার দরুন তারা আল্লাহর বিরাগভাজন হয়ে গিয়েছিলো এবং ইতিমধ্যে কিছু কিছু শাস্তিও পেয়ে গিয়েছিলো। এভাবে এক চূড়ান্ত অবস্থায়

উপনীত হওয়ার পর্যায়ে তারা পৌঁছে গিয়েছিলো। এরশাদ হচ্ছে, 'খবরদার পৃথিবীর বুকে তোমরা অহংকার করো না, এর ফলে তোমাদের ওপর গযব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে যাবে, আর যার ওপর গযব নাযিল হওয়া হয়ে যায় অবশ্যই সে ধ্বংস হয়।'

অর্থাৎ, শীঘ্রই ফেরাউনের পতন হলো, রাজক্ষমতার আসন থেকে সে নেমে গেলো এবং সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। আর ধ্বংস হওয়া বলতে বুঝায় মানুষের সেই পরিণতিকে যা তাকে সকল কিছুর নীচে নামিয়ে দেয়। এই অধপতনের মুখোমুখি হয় তারা, যারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ এবং নিজেদের বড়োত্ব প্রদর্শন করে। এই বিদ্রাহ ও না-ফরমানীর বহু দৃষ্টান্ত আল কোরআনে পেশ করা হয়েছে এবং সে বর্ণনাগুলো এমনই চমৎকার যে, মনে হয় সে ঘটনাগুলো এখনও যেন আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠছে।

এই সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শন হচ্ছে ওইসব বনী ইসরাঈলের জন্যে, যারা সাগর পার হয়ে সে মরুভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিলো। যে উদ্দেশ্যে তারা বের হয়েছিলো সে কারণেই তাদের প্রতি সতর্কবাণী, যেন তারা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হয়, অহংকারী না হয়ে যায় এবং বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে নিজেদের কর্তব্য ভুলে না যায়, তা করলে তারা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তি থেকে পিছিয়ে যাবে................ আর এটাও সত্য, সতর্কীকরণের সাথে সাথে যে কোনো তাওবাকারী ব্যক্তির জন্যে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি অপরাধ করার পর ক্ষমাপ্রার্থী হবে এবং ভালোর দিকে ফিরে আসবে, অবশ্যই তাকে ক্ষমা করা হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির জন্যে যে তাওবা করবে, ঈমান আনবে, ভালো কাজ করবে এবং সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করবে।'

তাওবা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারিত কোনো কথার নাম নয়। এটা হচ্ছে মনের মধ্যে গড়ে ওঠা এক সংকল্পের নাম, যার বহিপ্রকাশ ঘটে ঈমান ও নেক কাজের মাধ্যমে, আর তাওবাকারীর এ সংকল্পের লক্ষণ সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার ব্যবহার এবং তার বাস্তব জীবনের কাজে কর্মে, আগের আচরণে। অতপর তাওবা করার পর ঈমান যখন সহীহ হয়ে যাবে এবং বাস্তব জীবনের কার্যকলাপ যখন তার তাওবার স্বাক্ষর বহন করবে, তখনই বুঝতে হবে সে ব্যক্তি সঠিক পথে আছে, ঈমান আনার পর হেদায়াতের ওপর টিকে আছে এবং তখনই তার নেক আমলের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে, চেষ্টা ও নেক কাজের ফলই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্তি।

আল্লাহর মহান সান্নিধ্যে হযরত মুসা

এ পর্যন্ত এসে সাহায্য ও শাস্তির দৃশ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে, এ অধ্যায়ের সমাপ্তি হচ্ছে এবং অবশেষে আসছে সে দৃশ্য, যখন দেখা যাচ্ছে মূসা (আ.) তাঁর রবের নৈকট্য হাসিলের জন্যে তূর পর্বতের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পর্বতের এক নির্দিষ্ট স্থানে মূসা (আ.)-কে সান্নিধ্য দান করার জন্যে ওয়াদা করেছিলেন, বলেছিলেন চল্লিশ দিন পর তাকে সেখানে যেতে, তাঁরপর তাকে বিজয়ী করবেন, যদিও ইতিমধ্যে পরাজয়ের কিছু গ্লানি তাকে স্পর্শ করেছিলো। সাহায্য পাওয়ার জন্যে অবশ্যই বেশ কিছু কষ্ট করতে হয়। আকীদা আমল ঠিক রাখার জন্যেও অনেক অনেক সবর করতে হয়, অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়, মনকে মযবুত বানাতে হয় এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে বিরাট এক মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর মূসা (আ.) তাঁর সঙ্গীদের পাহাড়ের পাদদেশে রেখে একাই আরোহণ করলেন তূর পর্বতের সর্বোচ্চ শৃংগে। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পেছনে ছেড়ে গেলেন তাঁর ভাই হারুনকে। প্রিয়তম প্রভু বিশ্ব সম্রাটের সাথে গোপন আলোচনার জন্যে একান্ত নির্জনতায় পৌঁছুনোর আনন্দঘন মুহূর্তটি ছিলো মূসা (আ.)-এর জন্যে এক বিরল ও অভূতপূর্ব সুযোগ, যার

জন্যে তাঁর মনটা পাগলপারা হয়ে ছিলো এবং তাঁর মন চাইছিলো আল্লাহর সামনে অবস্থানের সময়টা যেন কখনও শেষ না হয়ে যায়। পরম করুণাময় মালিকের সান্নিধ্যের আনন্দ তিনি ইতিপূর্বে লাভ করেছিলেন, এজন্যে অধীর আগ্রহে কাল-বিলম্ব না করে তাঁর মধুর পরশ পাওয়ার আশায় তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেছিলেন। এরপর তাঁর মালিকের দরবারে যখন তিনি পৌঁছে গেলেন তখন মাওলা পাকের চেতনা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো কিছু তাঁর অনুভূতিতে স্থান পায়নি, এমনকি পর্বতের পাদদেশে ছেড়ে আসা তাঁর জাতির অবস্থা কি হল এসব বিষয় চিন্তা করার মতো কোনো অবসরই আর তিনি পাননি।

এমনই এক মুহূর্তে তাঁর রবই তাঁকে জানাচ্ছে পেছনে ছেড়ে আসা তাঁর জাতির অবস্থা সম্পর্কে। সুতরাং আসুন একবার আমরা তাকাই সে ছেড়ে আসা জনতার অবস্থার দিকে এবং তাঁর একান্ত সংগীদের সম্পর্কে রব্বুল আলামীনের সাথে তাঁর কথাবার্তা একটু কান পেতে শুনি,

'কোন জিনিস তোমাকে ব্যস্ত করে ফেললো তোমার জাতি থেকে এতো তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্যে হে মূসা? সে বললো, ওরা তো আমার পেছনে পেছনেই আসছে, আমি তোমার কাছে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছিলাম যেন তুমি খুশী হও (হে আমার মালিক)। আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'শোনো তাহলে, আমি মহান আল্লাহ, তোমার আগমনের অব্যবহিত পরেই তোমার জাতিকে একটি পরীক্ষার মধ্যে ফেললাম, আর (এই অবসরে) সামেরী (নামক এক ব্যক্তি) তাদের ভুল পথে চালিত করলো।' আর এভাবেই মূসা এসেছিলেন তাঁর মাওলার দরবারে............. খুবই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, অবশ্য আসার এরাদা করার পর তিনি তাঁর রবের সান্নিধ্যে দীর্ঘ চল্লিশটি দিন উপস্থিত থাকার জন্যে মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই রওয়ানা হয়েছিলেন। শত শত বছর ধরে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ও নবীন জীবন লাভে মুগ্ধ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে জীবনবিধানপ্রাপ্তিই যে ছিলো মূসা (আ.)-এর রব প্রভু পালনকর্তা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের কারণ, তা সম্যকভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাদের হীনতা দীনতা ও দীর্ঘ দিনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে করে আল্লাহর বার্তা মযলুম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাদেরকে তিনি যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন তাছাড়া তাদেরকে এ এবং এ গুরুদায়িত্ব বহন করার উপযোগী একদল সুন্দর যোগ্য মানুষ হিসেবে তিনি তাদের গড়ে তুলতে পারেন।

বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার গোমরাহী

কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে দাসত্বের শৃংখলে নিষ্পেষিত হওয়ার এবং পৌত্তলিক ফেরাউনের অধীনস্থ থাকার ফলে তাদের প্রকৃতি বিগড়ে গিয়েছিলো, আল্লাহর দ্বীন প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব বহন করার মনোবল তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। এ মহান দায়িত্ব বহন করার জন্যে যে অবিচলতা ও ধৈর্য প্রয়োজন তা প্রদর্শন করার যোগ্যতা তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে ওয়াদা পূরণ করার মতো চারিত্রিক বল ও দৃঢ়তা ছিলো না। এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্তহীনতার রোগ বাসা বেঁধেছিলো, তারা নেতৃত্বের গুণাবলী এবং স্বতস্ফূর্ত আনুগত্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিলো। ফলে। যখনই মূসা (আ.) তাঁর ভাই হারুনের পরিচালনায় সাময়িকভাবে তাদের রেখে একটু দূরে চলে গেলেন তখন তাদের মধ্যে নানা প্রকার ফেৎনা জন্ম নিলো, তাদের আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেলো এবং প্রথম পরীক্ষাতেই তারা চরম দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বসলো। অথচ আল্লাহর খলীফা হিসাবে মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা অর্জনের জন্যে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা প্রয়োজন এবং নানা প্রকার বিপদ মসিবতে নিপতিত করে ধৈর্য অবলম্বনের প্রশিক্ষণও উদীয়মান এ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে একান্ত দরকার। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের জন্যে প্রথম পরীক্ষা ছিলো সামেরী

কর্তৃক নির্মিত গো-শাবক। এরশাদ হচ্ছে, 'অতপর, আমি, মহান আল্লাহ তোমার জাতিকে (ওদের পেছনে ফেলে) তোমার (পবর্তারোহণের) পর পরীক্ষা করলাম, আর সে সময়েই সামেরী তাদের পথভ্রষ্ট করলো।' অথচ মূসা (আ.) তাঁর রবএর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জাতির প্রতি আগত এ পরীক্ষা সম্পর্কে কোনো খবর রাখতেন না। এ সাক্ষাতকালে তাঁকে কিছু ফলক দেয়া হয়েছিলো, যাতে ছিলো হেদায়াতের বাণী এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় জীবনবিধান, যাতে তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

বর্তমান আলোচনার ধারা বুঝা যাচ্ছে, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন মূসা (আ.)-কে হেদায়াত সম্বলিত সে ফলকগুলো দিচ্ছিলেন, সে সময়ে পেছনে ছেড়ে আসা তাঁর জাতির যে কঠিন পরীক্ষা মুখোমুখি হয়েছিলো সে বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। কারণ তাতে মূসা (আ.)-এর মনে অস্থিরতা আসতো, তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর মালিকের সাথে কথা বলতে পারতেন না এবং ক্ষোভে দুঃখ তিনি ফিরে আসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কারণ তিনি বড়ো কষ্ট করে তাদের পৌত্তলিকতার পরিবেশ থেকে বের করে এবং মানুষের বন্দেগী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করেছিলেন। তারা যেন পৌত্তলিকতামুক্ত পরিবেসে আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকতে পারে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন সহজলব্ধ খাদ্য খাবার এবং অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্য তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থাও করেছিলেন। এ ছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁর নবীর দ্বারা সে ধুধু মরুভূমির মধ্যে তাদের পরিচালনা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সে সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ এবং গোমরাহী ও তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাচ্ছেন। তারপর সে জাতিই মানুষের নিজের হাতে তৈরী বাছুরের মধ্য থেকে উত্থিত হাম্বা হাম্বা রব শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো এবং ঝুঁকে পড়লো পৌত্তলিকতা ও বাছুর পূজার দিকে!

অবশ্য পুতুল পূজার ফেৎনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে যা কিছু জানিয়েছিলেন এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। এতদসত্তেও এখানে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাতে সে জাতির চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। এখানকার বিবরণে দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.) রাগ ও দুঃখ নিয়ে ফিরে আসছেন এবং তাঁর জাতিকে কঠিনভাবে তিরস্কার করছেন– ভীষণভাবে ধমকাচ্ছেন তাঁর ভাইকে। এতে বুঝা যাচ্ছে, মূসা (আ.) তাঁর জাতির এসব কদর্য আচরণ সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'তারপর মূসা তার জাতির কাছে রাগান্বিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলো, বললো, হে আমার জাতি ....ওরা বললো, মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এরই (এই বাছুরটিরই) পূজা করতে থাকবো।'(আয়াত ৮৬-৯১)

এই হচ্ছে সেই ফেৎনা যার মোকাবেলা মূসা (আ.)-কে তার জাতির সাথে করতে হয়েছিলো বলে এই প্রসংগে প্রকাশ পাচ্ছে। মূসা (আ.) যখন একাকী তাঁর মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে ছিলেন সেই পবিত্র মুহূর্তে এই ফেৎনার কথা প্রকাশ না করে একটু দেরী করা হয়েছিলো এবং এর বিস্তারিত বিবরণ গোপন রাখা হয়েছিলো, যাতে করে পরবর্তীকালে এ বিষয়ের জ্ঞান-গবেষণায় মানুষ আত্মনিয়োগ করতে পারে।

ওপরে বর্ণিত বিষয়টি মূসা (আ.) ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো এই জন্যে যে, তিনি ফিরে এসে যেন নিজ চোখে তাঁর জাতিকে হাম্বারত গো-শাবকের স্বর্ণ মূর্তিটি পূজা করার অবস্থা নিজ চোখে দেখতে পারেন। দেখুন, কত বিস্ময়কর এই হতভাগা অকৃতজ্ঞ জাতির ব্যবহার, যাদের মূসা (আ.) কত বিপদের ঝড় মাথায় নিয়ে ফেরাউনের নিগড় থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং যারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার অজস্র নিদর্শন এ পর্যন্ত দেখে এসেছে, তারা কেমন করে একটা বাছুর (তার সামান্য একটা বৈশিষ্ট্যের কারণে) পূজা করতে শুরু করেছে। অথচ তারা ভালো করেই জানে, বাছুরটি তৈরী করেছে তাদেরই সম্প্রদায়ের

সামরী নামক একজন সাধারণ মানুষ। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, তারা বলছে, এটাই তোমাদের ও মূসা (আ.)-এর পূজনীয় বস্তু, অথচ তাদের ত্রাণকর্তা মূসা (আ.)-কে তারা বেমালুম ভুলে গেলো! একথাও ভুলে গেলো যে, তাদের সে স্থানে অপেক্ষা করতে বলে মূসা (আ.) সেই পর্বত-শিখরে তাঁর রবের কাছে গেছেন, যেখানে তাঁর পরশ তিনি লাভ করবেন (বলে তারা জেনেছে এবং বিশ্বাস করেছে)!

অতপর পড়ন্ত বেলায় ফিরে এসে মূসা (আ.) অতীব দুঃখ ও ক্রোধের সাথে তাঁর জাতির এ কদর্য আচরণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রব আল্লাহ অতি সুন্দর ওয়াদা করেননি?' আর এটা অবশ্যই তাদের সবার জানা ছিলো যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন, যে তারা অতি শীঘ্রই একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মান্যকারী হিসেবে, তাঁরই সাহায্য বলে বায়তুল মাকদেসের পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করবে। এ ওয়াদা দানের পর খুব বেশী দিন তো অতীত হয়নি যে তারা হয়রান হয়ে যাবে এবং হতাশার কারণে অন্য পথ ধরবে। মাত্র চল্লিশ দিনও পার হয়নি এবং মূসা (আ.) তাদের কাছে তখনও ফিরে আসেননি, এরই মধ্যে তাদের হলো এই ভীমরতি........ তাই তিনি তাঁর হতভাগা জাতিকে অত্যন্ত অসন্তোষ নিয়ে তিরস্কার করছেন; বলছেন, 'কি ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা কি খুব বেশী দিন হয়ে গেছে, না কি তোমরা চাও যে, আল্লাহর গযব তোমাদের ওপর অবধারিত হয়ে যাক এবং অবিলম্বে নেমে আসুক তোমাদের ওপর সেই কঠিন আযাব?' অর্থাৎ তোমরা যে কাজ ও আচরণ করে চলেছ তাতে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা অবধারিত হয়ে গেছে। এতে বুঝা যায়, ওরা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে সেসব না-ফরমানী করেছে এবং এর পেছনে রয়েছে কঠিন এক চক্র। .... এজন্যে বলা হচ্ছে; 'কি ব্যাপার, যে ওয়াদা করেছিলে তা কি অনেক পুরাতন হয়ে গেছে? না কি চাও যে তোমাদের ওপ আল্লাহর আযাব এসে যাক।' অতএব, এই জন্যেই আমার সাথে কৃত চুক্তি তোমরা ভংগ করেছো'— তাই না? অথচ আমরা সবাই পরস্পরের সাথে তো এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলাম যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ এ চুক্তি ভাংবে না, আমার হুকুম ছাড়া তোমাদের মধ্যে কেউই আকীদার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনবেনা বা তোমাদের কর্মকান্ডের মধ্যে কিছু রদবদল করবে না?

ওপরের আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে যে, সে চুক্তি করার সময়ই তারা নানা প্রকার ওযর আপত্তি করেছিলো, যা দ্বারা এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ওরা দীর্ঘ দিন ধরে যে মূর্তিপূজার মধ্যে ডুবেছিলো তার প্রভাব এখনও পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। মানসিক দিক দিয়ে তারা দ্বিধা-দ্বন্ধের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের বুদ্ধি এখনও স্থির হতে পারেনি। দেখুন তাদের কথার উদ্ধৃতিতে কি বলা হচ্ছে, 'ওরা বললো, আমাদের নিজেদের ইচ্ছা এখতেয়ার অনুযায়ী যে আমরা ওয়াদা ভংগ করেছি তা নয়', অর্থাৎ, এই যে পরিবর্তনের বিষয়টি— এটা আমাদের ইচ্ছা এখতেয়ারের বাইরে ছিলো, 'বরং আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো গোটা ফেরাউন জাতির অলংকারাদির বোঝা; অতপর সেগুলোই আমরা ছুঁড়ে ফেলেছিলাম'............ অর্থাৎ, মিসর অবস্থিত বনী ইসরাঈল জাতির সকল অলংকার তাদের মহিলাদের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিলো। আমরা সবাই তাদের সাথে নিয়ে সেগুলোকে বহন করে নিয়ে এনেছিলাম .... এই বোঝা বলতে ওরা ইংগিত করছিলো সেই গহনাগাটির দিকে এবং বলছিলো; আমরা ওইসব অলংকার হারাম মনে করি। ওগুলো বয়ে বেড়ানো থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম এবং এ জন্যে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তখন সামেরী ওগুলো হাতিয়ে নেয় এবং ওগুলো দিয়ে সে একটি বাছুর তৈরী করে। সামেরী হচ্ছে 'সামেরা' নামক এলাকা থেকে আগত এক ব্যক্তি। সে এলাকার লোকদের সাথে তার ওঠাবসা ছিলো। অথবা সে তাদেরই একজন যার নামের সাথে সামেরী উপাধি সংযোজিত হয়েছে।

এই গো-শাবকের মধ্যে কতকগুলো ছিদ্র রেখে দেয়া হয়েছিলো, এগুলোর মধ্যে যখন বাতাস প্রবেশ করতো তখন হাম্বা হাম্বা রব বেরুত। অথচ এর মধ্যে কোনো জীবন বা আত্মা কিছুই ছিলো না। এ ছিলো নিছক একটি মূর্তি। মূর্তি কথাটি প্রযোজ্য সেই শারীরিক বস্তুর ওপর, যার মধ্যে কোনো প্রাণ থাকে না, কিন্তু আফসোস, স্বর্ণ নির্মিত এই গো-শাবক মূর্তির মধ্য থেকে শব্দ নির্গত হতে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের রবকে ভুলে গেলো সে জাতি, যাদের তাদের রব চরম অপমানের গ্লানি এবং হীনতা দীনতার কবল থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। আর তারা এই স্বর্ণ নির্মিত বাছুরের পূজা করতে শুরু করে দিলো এবং চিন্তার বিভ্রান্তি কবলিত হয়ে বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা বলে ওঠলো; 'এটিই হচ্ছে তোমাদের পূজনীয় সর্বময় ক্ষমতার মালিক প্রভু, আর মূসারও প্রভু এটাই।' অর্থাৎ সে বিভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ তাদের জনগণকে বুঝালো যে, মূসা এই প্রভুরই সন্ধান করতে গেছে পর্বতের ওপরে। অথচ তিনি তো এখানে আমাদের সাথে বর্তমান রয়েছেন। হায়, মূসা তার রবএর সান্নিধ্যে পৌঁছুনোর পথটা ভুল গেলো এবং তার থেকে দূরে সরে পড়লো!

দেখুন, সে বেওকুফ জাতির কী ভীষণ বেয়াদবী, আল্লাহর নবীকে কিভাবে তারা দোষারোপ করছে এবং কি ভাবে তাঁর মান সম্ভ্রমকে পদদলিত করছে, অথচ তিনি শুনছেন ও দেখছেন, তারা বলছে, মূসা (আ.) তাঁর রবএর কাছে পৌঁছুতে পারেননি, এমনকি, ওরা বলছে যে, তিনি তাঁর রবএর কাছে যাওয়ার পথই ভুলে গেছেন তিনি নিজেও পথ পাননি, তাঁর রবও তাঁকে সঠিক পথ দেখাননি। অর্থাৎ সে হতভাগা জাতি দোষারোপ করছে একাধারে তাদের নবীকে এবং তাদের রবকেও!

সামেরী যে কঠিন ধোঁকা ফেলে বনী ইসরাঈল জাতিকে শেরকে লিপ্ত করেছিলো তা আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নীচের আয়াতাংশে।

'ওরা কি দেখছে না যে সে বাছুর দেহী বস্তুটি (হাম্বা হাম্বা শব্দ করলেও) তাদের কথার কোনো জওয়াব দেয় না বা তাদের কোনো ক্ষতি অথবা উপকার করতে পারেনা, অর্থাৎ এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে আসলে বাছুরটি এমন কোনো জ্যান্ত প্রাণী ছিলো না যা শুনতে বা দেখতে পায়, অথবা জীবন্ত গো-শাবককে ডাকলে যেমন সাড়া দেয় সে রকম সাড়াও সে দিতে পারতো না, যার দ্বারা প্রাণ স্পন্দনের নিম্নতম লক্ষণ বুঝা যায়, ক্ষতি বা উপকার করা তো দূরের কথা। তার অবস্থা হচ্ছে, না সে গুঁতা মারতে পারতো– না পারতো লাথি মারতে, না পারতো মলন মলতে আর না পারতো কুয়া থেকে পানি তোলার কাজে সাহায্য করতে।

আর এ সব কিছুর ওপর যে কথাটি চিন্তা করার তা হচ্ছে, মূসা (আ.) হারুন নবীকে তাদের দেখা শুনার জন্যে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর সাবধান করা সত্তেও তাঁর কথা অবজ্ঞা করে তারা এই বাছুরটির সামনে মাথানত করে তার পূজা শুরু করেছিলো। এটা যে এক কঠিন পরীক্ষা– একথা জানাতে গিয়ে 'তিনি বললেন, হে আমার জাতি, অবশ্যই তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব-প্রতিপালক তো তিনি যিনি মহা দয়াময়।' তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করার জন্যে তিনি তাদের বারবার উপদেশ দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন তাদের সেভাবে বুঝাতে যেভাবে মূসা (আ.) তাঁকে বলে গিয়েছিলেন, আর তিনি একথাও বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর রবের সাথে পবর্তের ওপর নির্দিষ্ট সময় কাটানোর পর শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন, কিন্তু হায়, তাঁর কথা মানার পরিবর্তে ঘাড় বাঁকিয়ে তারা সরে গেছে, তাঁর নসীহতের কোনো পরওয়াই তারা করেনি এবং মূসা (আ.)-এর অবর্তমানে হারুন (আ.)-এর আনুগত্য করবে বলে যে ওয়াদা তারা করেছিলো তার কোনো পরওয়াই তারা করলো না; বরং তারা বললো, 'ঠিক আছে, আমরা এই বাছুরটি নিয়েই মেতে থাকবো যতোক্ষণ না মূসা (আ.) আমাদের কাছে ফিরে আসেন!

মূসা (আ.)-এর তূর পর্বত থেকে প্রত্যাবর্তন

অতপর প্রচন্ড ক্রোধ ও বেদনাহত হৃদয় নিয়ে মূসা (আ.) তাঁর জাতির কাছে ফিরে এলেন এবং যখন তাদের এই কদর্য কাজের যুক্তি শুনলেন, তখন বুঝলেন তাঁর জাতিকে এক কঠিন চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছে, তাদের চিন্তা ধারা বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়েছে। তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর ভাই হারুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং চরম উত্তেজিতভাবে তাঁর চুল ও দাড়ি জাপটে ধরে বললেন, 'হে হারুন, যখন তাদের এভাবে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে তখন কোন জিনিস তোমাকে আমার কাছে চলে আসতে বারণ করেছিলো? তুমি কি আমার নাফরমানী করলে?'

মূসা (আ.) এই জন্যে তাঁর ওপর বেশী রেগে গিয়েছিলেন যে, যখন তাদের বাছুর পূজা থেকে বিরত করতে হারুন ব্যর্থ হলেন তখন সেখানে উপস্থিত থেকে নীরবে সেই অন্যায় সহ্য না করে মূসা (আ.)-এর কাছে পৌঁছে যাওয়া তাঁর কি উচিত ছিলো না? তা না করে, সে অন্যায় প্রত্যক্ষ করে তিনি নিজেও কষ্ট পেলেন এবং ওদেরকেও বাছুর পূজা থেকে থামাতে পারলেন না। এতে কি তার জন্যে নির্দেশ অমান্য করা হলো না?

অবশ্য প্রাসংগিক আলোচনায় হারুন (আ.)-এর অবস্থানের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁকে দাড়ি ও চুল ধরে যখন মূসা (আ.) কথা বলতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি কোনো প্রকার ক্রোধ প্রদর্শন না করে অত্যন্ত অনুতাপ ও বিনয়ের সাথে নিজের ওযর পেশ করছেন এবং হারানো মহব্বত ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, 'হে আমার মায়ের পেটের ভাই, আমার দাড়ি ও চুল ধরে আমাকে ঝাঁকাবেন না। আমি ভয় করছিলাম যে আপনি বলবেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছো। ওদের সংগঠিত করে রাখার জন্যে তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার অবর্তমানে তুমি সে দায়িত্ব পালন করোনি এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।'

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি হারুন ছিলেন যথেষ্ট আত্মসংযমী এবং মূসা (আ.)-এর তুলনায় বেশী ক্রোধ সংবরণকারী। তিনি অবস্থার নাযুকতা গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলেন এবং তাঁর স্নেহপূর্ণ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে ভাইয়ের রাগ দমন করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাইকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর সংযম প্রদর্শন ছিলো প্রকৃতপক্ষে ভাইয়ের আনুগত্যের উদ্দেশ্যেই। তিনি আশংকা করছিলেন, তাঁর বেশী কড়াকড়িতে হয়তো বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একদল বাছুর পূজার দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং নগণ্য আর একটি দল হারুন পন্থী হয়ে থাকবে; অথচ তাঁর মূসা (আ.)-এর নির্দেশ ছিলো বনী ইরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ও কোনো প্রকার দুর্ঘটনা যেন তাদের পেয়ে না বসে সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা, আর তাদের কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ না করা মূসা (আ.) তখন তো ভাবতে পারেননি যে, এমন কঠিন কাজ তারা করবে। অবশ্য, অন্যদিকে চিন্তা করলে তাঁর এ যুক্তির মধ্যে অনুগত্যের ছোঁয়াচ বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

এখানে দেখা যায়, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে হারুন (আ.)-এর এ বিনম্র ভূমিকায় বেশ ভালো কাজ হলো অর্থাৎ, তাঁর ওপর থেকে মূসা (আ.)-এর রাগ নেমে গিয়ে সামেরীর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। যেহেতু মূলত সেই ছিলো এই প্রচন্ড বিশৃংখলা সৃষ্টিকার হোতা এ পর্যন্ত মূসা (আ.) তার দিকে খেয়াল দেননি, কারণ হাম্বা-রবকারী যে কোনো জীব জন্তুর পূজা করার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে গোটা জাতিই তো দায়ী ছিলো। অবশ্যই তারা সবাই বুঝত যে, শুধু হাম্বা রবকারী হওয়ার কারণেই কেউ পূজা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায় না। আর প্রকৃতপক্ষে এই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী গোমরাহ লোকদের ও তাঁর সাথে টিকে থাকা সত্য সঠিক পথে অবস্থানকারীদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যে হারুনই ছিলেন দায়িত্বশীল। যখন তাদের সংগঠক হিসাবে তিনি

দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তখন মূসা (আ.) তাঁকেই এ ফেৎনার জন্যে দায়ী মনে করেছিলেন। সামেরীর ব্যাপারটা তো পরে আসছে। সে প্রথম নবী মূসা (আ.)-এর নাফরমানী করলো, তারপর দ্বিতীয় নবীর উপদেশের পরওয়াও করলো না। কাজেই এ কঠিন অবস্থার জন্যে দায়িত্ব বর্তায় প্রথম দায়িত্বশীল মূসা (আ.)-এর ওপর, তারপর আসে দ্বিতীয় দায়িত্বশীল হারুন (আ.)-এর ওপর এবং একেবারে শেষে দায়ী হয় এই ফেৎনা সৃষ্টির হোতা সামেরী।

দেখুন, একথা শুনে মূসা (আ.) সামেরীর দিকে মনোযোগী হচ্ছেন!

'সে বললো, তোমার কি বলার আছে, বলো হে সামেরী?' অর্থাৎ, তোমার অবস্থা ও বক্তব্য কি বলো দেখি; জিজ্ঞাসা করার এই ভংগিতে বিষয়টি যে কত কঠিন তা বেশ বুঝা যাচ্ছে।

'সে বললো, আমি তাই দেখেছি যা ওরা দেখেনি, তারপর আমি বার্তাবাহক (জিবরাঈল)-এর পদ স্পর্শিত ধূলি থেকে এক মুষ্টি তুলে নিয়েছি এবং নিক্ষেপ করেছি এই ধূলিকণাগুলোকে (সে অলংকারাদির বিগলিত স্তূপের মধ্যে), এভাবেই মন আমাকে যা বলেছে, আমি তাই করে ফেলেছি।'

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন আসে, সামেরী কি দেখেছিলো?- সে বিষয়ে তার বক্তব্য সম্পর্কে বহু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কে ছিলো এ 'রসূল' যার পদধূলি সে নিক্ষেপ করেছিলো, আর এর সাথে সে স্বর্ণনির্মিত বাছুরেরই বা সম্পর্ক কি ছিলো, আর এই এক মুষ্টি পদ স্পর্শিত ধূলিরই বা কি কারিশমা (অলৌকিক ক্ষমতা) ছিলো, এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে।

আর এসব রেওয়ায়াতের (বর্ণনা পরম্পরের) মধ্যে সব থেকে দ্বিধা-দ্বন্ধের বিষয় হচ্ছে, সে নাকি জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছিলো, সে নাকি তাকে সেই আসল রূপ চেহারা দেখেছিলো যা নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন, তারপর সে নাকি তার পবিত্র কদমের নীচে থেকে এক মুষ্টি ধুলা তুলে নিয়েছিলো। অথবা তাঁর ঘোড়ার খুরের মাটি থেকে তুলে নিয়েছিলো, তারপর সে নাকি সেই স্বর্ণ নির্মিত গো শাবকটির ওপর ছুঁড়ে মেরেছিলো, যার ফলে সেটি হাম্বা-হাম্বা রব করতে শুরু করে দিলো, অর্থাৎ সে বিগলিত স্বর্ণ কুন্ডের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তা হাম্বা রবকারী বাছুরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো।

এখানে আল কোরআন সে ঘটনার রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু জানায়নি। একটি কাহিনী হিসাবে শুধুমাত্র সামেরীর ঘটনাটি পেশ করেছে............ আর এ কারণেই আমরা কি ঘটেছিলো, সেটা বড়ো করে না দেখে সামেরীর ওযরটা গুরুত্ব সহকারে পরখ করতে চাই। সেসব স্বর্ণঅলংকার দ্বারা বাছুর বানিয়ে ছিলো যা মিসরবাসীর কাছ থেকে তারা বহন করে নিয়ে এসেছিলো এবং পরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে সামেরী বাছুরটা এমন এক সূক্ষ্ম প্রযুক্তিতে তৈরী করেছিলো যে, যখনই সেটির মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতো তখনই তা থেকে হাম্বা ডাকের মতো শব্দ শোনা যেতো। এ বিষয়টা রহস্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে এবং তার কেরামতি জাহির করার জন্যে সে বুদ্ধি করে এ কাহিনী বানিয়ে নিয়েছিলো যে, 'রসূল'-এর পায়ের ধুলা থেকে এক মুষ্টি সে তুলে নিয়েছিলো!

অবস্থা যাইই হোক না কেন, তার এই ধোঁকাবাজি দ্বারা গোটা জাতিকে গোমরাহ করার ক্ষমাহীন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ মূসা (আ.) তাকে সারা জীবনের জন্যে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা শুনিয়ে তার চূড়ান্ত শাস্তির দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মানুষকে সরিয়ে বাছুর পূজার দিকে এগিয়ে দেয়ার হোতা যে অপরাধ করেছিলো তাকে তিনি অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করলেন যাতে করে মানুষ প্রামাণ্যভাবে বুঝতে পারে, কোনো একটি বাছুর কখনও ইলাহ (সর্বশক্তিমান) হতে পারে না, কোনোভাবেই এর

নির্মাতার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যায় না, বা তার কোনো ওযরই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ব সম্রাটের ক্ষমতার বাঁধন থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কিছুর মধ্যে যে লিপ্ত করবে, তাকে সে মহান সম্রাটের প্রতিনিধি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না।

গো-শাবক নির্মাতার প্রতি অভিশাপ

এজন্যে আল্লাহর নবী ও রসূল মূসা (আ.) তা চূড়ান্ত ও কঠিন অভিশাপ দিলেন আল্লাহর ভাষায় তা হচ্ছে,

'সে বললো, দূর হয়ে যা মরদূদ (জাহান্নামের কীট), তোর জন্যে রইলো এই শাস্তি যে সারা যিন্দেগী ধরে তুই বলতে থাকবে 'আমাকে ছুঁয়োনা আমাকে' ছুঁয়ো না। কিছুতেই তুমি এর থেকে মুক্তি পাবে না, আর চেয়ে দেখো তোমার সে পূজনীয় বস্তুর দিকে যা নিয়ে তুমি মেতেছিলে। ওকে আমরা পুড়িয়ে ছাই করে দেবো এবং সে সব ছাইকে বিশাল সাগরের বুকে ভাসিয়ে দেবো।'

অর্থাৎ, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, ভালো মনে হোক বা মন্দ মনে হোক- কোনো অবস্থাতেই তোকে কেউ স্পর্শ করবে না- আর তুইও কাউকে স্পর্শ করতে পারবিনে। মূসা (আ.) কর্তৃক যে সব শাস্তির আইন চালু করা হয়েছিলো, তার মধ্যে এই একঘরে করার দন্ড ছিলো একটি মোক্ষম শাস্তি। এরপর তাকে চির অচ্ছ্যুৎ ও অস্পৃশ্য হওয়ার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো যে কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না এবং সেও কারো কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এরপর তো রয়েছে পরপারের জন্যে ওয়াদা, সেখানে আল্লাহর কাছে রয়েছে তার জন্যে যথোপযুক্ত শাস্তি ও উচিত প্রতিদান। এরপর দেখা যাচ্ছে, মূসা (আ.) চরম ক্রোধ ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে স্বর্ণের বাছুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে সেগুলো সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। মূসা (আ.)-এর চারিত্রিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো পাহাড়সম দৃঢ়তা, সিদ্ধান্তে অবিচলতা, আর এখানে তাঁর ক্রোধ সঞ্চার হওয়া সে তো আল্লাহরই জন্যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে। এই কারণে তাঁর দৃঢ়তাকে এবং তাঁর কঠোরতাকে ভালো মনে করা হয়েছে।

এভাবে যখন মিথ্যা ইলাহর (পূজনীয় পাত্রের) জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার দৃশ্য সামনে এলো তখন মূসা (আ.) সঠিক আকীদা বিশ্বাসের আসল রূপ তুলে ধরছেন,

'অবশ্যই তোমাদের প্রকৃত ইলাহ হচ্ছেন আল্লাহ (যার হাতে রয়েছে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি), তিনি ছাড়া সর্বময় ও চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই। সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে বর্তমান রয়েছে।'

আর মূসা (আ.)-এর এই ঘোষণার সাথে আলোচ্য সূরার মধ্যে তাঁর কাহিনীর ইতি টানা হয়েছে। তাঁর এ কাহিনীর বর্ণনায় আল্লাহর রহমত ও সুদৃঢ় পরিচালনার ছবি ফুটে ওঠেছে, ফুটে ওঠেছে তাঁর দাওয়াতী কাজ ও ব্যক্তিগতভাবে তার পরিপূর্ণ আনুগত্যের জীবন্ত চিত্র। এমনকি যখন ওরা তাঁকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে তখনও তারাই যে ভুল করেছে তা শীঘ্রই ধরা পড়ে গেছে।

এরপর এ কাহিনীকে অবলম্বন করে আর অন্য কোনো তথ্যবিবরণী আসেনি। কারণ এর পরই দেখা যাচ্ছে বনী ইসরাঈল জাতির ওপর আপতিত উপর্যুপরি আযাব নাযিলের ধারা এটাই তাদের নানা প্রকার অপরাধ, অশান্তি বিশৃংখলা ও বিদ্রোহাত্মক কাজের পুরস্কার। পরিশেষে একথা বলতে হয়, সূরাটির মধ্যে আল্লাহর নেককার ও পছন্দনীয় বান্দাদের জন্যে মনোরম দয়ামায়া ও মমতাপূর্ণ এক পরিবেশ ফুটে ওঠেছে। অতএব, এহেন শান্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অন্য কোনো কাহিনীর অবতারণা করে এর সুষমাকে ম্লান করার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا

ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ

وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ

يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ

بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ

عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ

فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ

الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا

৯৯. (হে নবী, মূসার) যেসব ঘটনা তোমার আগে ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবেই তোমাকে শুনিয়ে যাবো, (তা ছাড়া) আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে একটি স্মরণিকাও দান করেছি। ১০০. যে কেউই এ (স্মরণিকা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন (নিজ কাঁধে) গুনাহের এক ভারী বোঝা বইবে, ১০১. তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; কেয়ামতের (কঠিন) দিনে তাদের জন্যে এ বোঝা কতো মন্দ (প্রমাণিত) হবে! ১০২. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের এমন অবস্থায় জমা করবো, (ভয়ে) তাদের চোখ নীল (ও দৃষ্টিহীন) থাকবে, ১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা (দুনিয়ায় বড়ো জোর) দশ দিন অবস্থান করে এসেছো ১০৪. (আসলে) আমি জানি (সে অবস্থানের সঠিক পরিমাণ নিয়ে) যা কিছু বলছিলো, বিশেষ করে) যখন তাদের মধ্যকার সবচাইতে বিবেকবান ব্যক্তি (যে সৎপথে ছিলো)– বলবে, তোমরা তো (দুনিয়ায়) মাত্র একদিন অবস্থান করে এসেছো!

রুকু ৬

১০৫. (হে নবী,) তারা তোমার কাছে (কেয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কি হবে) জানতে চাইবে, তুমি তাদের বলো, (সে সময়) আমার মালিক এগুলোকে (টুকরো টুকরো করে) উড়িয়ে দেবেন, ১০৬. অতপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন, ১০৭. তুমি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু নীচু দেখবে না; ১০৮. সেদিন সব মানুষ একজন আহ্বানকারীর পেছনে চলতে থাকবে, তার জন্যে কোনো বাঁকা পথ থাকবে না (সে চাইলেও অন্য দিকে যেতে পারবে না), সেদিন দয়াময় আল্লাহ তায়ালার (প্রচন্ড ক্ষমতার) সামনে অন্য সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে, (এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ভীতবিহ্বল মানুষের পায়ে চলার) মৃদু আওয়ায ছাড়া আর কিছুই তুমি শুনতে পাবে না। ১০৯. সেদিন পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার

مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ
الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز وَقُلْ
رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ
عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾

সামনে কারো কোনো রকম সুপারিশই কাজে আসবে না, অবশ্য যাকে করুণাময় আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তার কথা আলাদা। ১১০. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন, তারা তা দিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞানকে কোনো দিনই পরিবেষ্টন করতে পারে না। ১১১. (সেদিন) মানুষের চেহারাগুলো (সেই) চিরঞ্জীব ও অনাদি সত্তার সামনে অবনত হয়ে যাবে, ব্যর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে সেদিন শুধু যুলুমের ভারই বহন করবে। ১১২. (অপরদিকে) যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (দুনিয়ায়) নেক কাজ করেছে, (সেদিন) সে কোনো যুলুমের ভয় করবে না এবং কোনো ক্ষতির ভয়ও না। ১১৩. এভাবেই আমি কোরআনকে (পরিষ্কার) আরবী (ভাষায়) নযিল করেছি এবং তাতে (মানুষদের পরিণাম সম্পর্কে) সাবধানতা সংক্রান্ত কথাগুলো সবিস্তার বর্ণনা করেছি, যেন তারা (গোমরাহী থেকে) বেঁচে থাকতে পারে, কিংবা (তাদের মনে) তা তাদের জন্যে কোনো চিন্তা ভাবনার সৃষ্টি করতে পারে। ১১৪. আল্লাহ তায়ালা অতি মহান, তিনিই (সৃষ্টিকুলের) প্রকৃত বাদশাহ (তিনিই কোরআন নাযিল করেছেন, হে নবী), তোমার কাছে তার ওহী নাযিল পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআনের ব্যাপারে কখনো তাড়াহুড়ো করো না, (তবে জ্ঞান বাড়াতে চাইলে) বলো, হে আমার মালিক, আমার জ্ঞান (-ভান্ডার) তুমি বৃদ্ধি করে দাও। ১১৫. আমি এর আগে আদম (সন্তানের) প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে (এসব কথা) ভুলে গেছে, (আসলে) আমি (কখনো) সে ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পাইনি।

রুকু ৭

১১৬. আমি ফেরেশতাদের (যখন) বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা করো, তখন তারা (সাথে সাথেই) সাজদা করলো, কিন্তু ইবলীস, (সে) অস্বীকার করলো।

فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

১১৭. আমি আদমকে বললাম, এ (শয়তান) হচ্ছে তোমার ও তোমার (জীবন) সাথীর দুশমন; সুতরাং (দেখো) এমন যেন না হয় যে, সে তোমাদের উভয়কেই জান্নাত থেকে বের করে দেবে এবং (এর ফলে) তুমি দারুণ দুঃখ কষ্টে পড়ে যাবে, ১১৮. (অথচ) এখানে তুমি কখনো ক্ষুধার্ত হও না, কখনো পোশাকবিহীনও হও না! ১১৯. তুমি (কখনো) এখানে পিপাসার্ত হও না, কখনো রোদেও কষ্ট পাও না! ১২০. (কিন্তু এতো সাবধান করা সত্ত্বেও) অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে (তাকে) বললো, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি গাছের কথা বলবো (যার ফল খেলে তুমি এখানে চিরজীবন থাকতে পারবে) এবং বলবো এমন রাজত্বের কথা, যার কখনো পতন হবে না! ১২১. অতপর তারা উভয়ে ওই (নিষিদ্ধ গাছের) ফল খেলো, সাথে সাথেই তাদের শরীরের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা (লজ্জায় তাড়াতাড়ি করে) জান্নাতের (বিভিন্ন গাছের) পাতা দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলো, এভাবেই আদম তার মালিকের না-ফরমানী করলো এবং (এ কারণে) সে (সাময়িকভাবে) পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো। ১২২. কিন্তু (তার ক্ষমা প্রার্থনার পর) তার মালিক তাকে (তার বংশধরদের পথ প্রদর্শনের জন্যে) বাছাই করে নিলেন, তার ওপর ক্ষমাপরবশ হলেন এবং তাকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন। ১২৩. তিনি বললেন, (শয়তান ও তোমরা এখন) উভয় দলই এখান থেকে নেমে পড়ো, (মনে রাখবে) তোমরা কিন্তু একজন আরেক জনের (জঘন্য) দুশমন, অতপর (তোমাদের জীবন পরিচালনার জন্যে) আমার কাছ থেকে হেদায়াত (পথনির্দেশ) আসবে, অতপর যে আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে সে না কখনো (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে, না (আখেরাতে সে) কোনো কষ্ট পাবে। ১২৪. (হাঁ,) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রী সংকুচিত হয়ে যাবে, (সর্বোপরি) তাকে আমি কেয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাযির করবো।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ
ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ
وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ
لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَ
أَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ

১২৫. সে (নিজেকে এভাবে দেখার পর) বলবে, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে কেন (আজ) অন্ধ বানিয়ে উঠালে? (দুনিয়াতে তো) আমি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই ছিলাম! ১২৬. তিনি বলবেন, (আসলে দুনিয়াতেও) তুমি এমনিই (অন্ধ). ছিলে! আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিলো, কিন্তু তুমি তা ভুলে ছিলে, এভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে। ১২৭. (মূলত) আমি এভাবেই তাদের প্রতিফল দেই, যারা (আমার আয়াত নিয়ে) বাড়াবাড়ি করে, সে তার মালিকের আয়াতের ওপর কখনো ঈমান আনে না; (সত্যিকার অর্থে) পরকালের আযাবই হচ্ছে বেশী কঠিন এবং অধিক স্থায়ী। ১২৮. এদের আগে আমি কতো কতো জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, আর এ (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদসমূহের ওপর দিয়ে এরা তো (হামেশাই) চলাফেরা করে; অবশ্যই এতে বিবেকবান মানুষদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

রুকু ৮

১২৯. যদি তোমার মালিকের পক্ষ থেকে (এদের অবকাশ দেয়ার এ) ঘোষণা না থাকতো এবং এদের ওপর আযাব আসার সুনির্দিষ্ট কালক্ষণ আগেই ঠিক করা না থাকতো, তাহলে এদের ওপর (কবেই আযাব) অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো; ১৩০. অতএব (হে নবী), এরা যা কিছুই বলে তুমি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করো, তুমি (বরং) তোমার মালিকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের আগে ও তা অস্ত যাওয়ার আগে, রাতের বেলায় এবং দিনের দুই প্রান্তেও তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো, সম্ভবত (কেয়ামতের দিন) তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে। ১৩১. (হে নবী,) পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের সেসব উপকরণ আমি তাদের অনেককেই দিয়ে রেখেছি, তার দিকে তুমি কখনো তোমার দুচোখ তুলে তাকাবে না, (আসলে আমি এসব কিছু এ কারণেই দিয়েছি) যেন আমি তাদের পরীক্ষা করতে পারি, (মূলত) তোমার মালিকের রেযেকই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۖ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ
بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ
لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ
وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ
الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

১৩২. (হে নবী,) তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো, আমি তো তোমার কাছে কোনোরকম রেযেক (জীবনোপকরণ) চাই না, রেযেক তো তোমাকে আমিই দান করি; আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার জন্যেই রয়েছে উত্তম পরিণাম। ১৩৩. (এরপরও মূর্খ) লোকেরা বলে, এ ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন; (তুমি কি মনে করো,) তাদের কাছে সেসব দলীল প্রমাণ নেই– যা আগের কেতাবসমূহে মজুদ রয়েছে! ১৩৪. আমি যদি এর আগেই তাদের কোনো আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে অবশ্যই এরা বলতো, হে আমাদের মালিক, তুমি (আযাব পাঠাবার আগে) আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠালে না কেন? (রসূল) পাঠালে আমরা এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম। ১৩৫. (হে নবী, এদের) বলো (হাঁ), প্রত্যেক ব্যক্তিই (তার কাজের প্রতিফল পাবার) অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরাও অপেক্ষা করো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে সঠিক পথের অনুসারী কারা, আর কারাই বা সোজা সঠিক পথ পেয়েছে।

তাফসীর
আয়াত ৯৯-১৩৫

সূরাটি শুরু হয়েছিলো কোরআন সম্পর্কিত বর্ণনা দিয়ে। কোন উদ্দেশ্যে তা নাযিল হয়েছে এবং কি কাজের জন্যে এসেছে সে কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, কিছুতেই এ পবিত্র গ্রন্থ রসূল মোহাম্মদ (স.)-কে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি, অথবা এটাও নয় যে, এ মহাগ্রন্থের কারণে তাঁর ওপর কষ্ট নেমে আসবে। পরবর্তীতে এ সূরার মধ্যে মূসা (আ.)-এর কেসসার বিস্তারিত বিবরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি এ বর্ণনাধারার মধ্যে মূসা (আ.)-কে আল্লাহর পরিচালনা, তাঁর প্রতি, তাঁর ভাই ও তাঁর জাতির প্রতি আল্লাহর অপরিসীম মেহেরবানীর বর্ণনা।

এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবার আলোচ্য প্রসংগের মোড় ঘুরে যাচ্ছে আল কোরআন ও তার মূল কাজের দিকে। তাদের পরিণতি সম্পর্কিত আলোচনার দিকে যারা এ মহান কেতাব থেকে

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় এবং জানানো হচ্ছে যে, তাদের এ কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে মূলত আখেরাতের জীবনেই, আর এজন্যে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে তাদের শাস্তির দৃশ্যটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে; নশ্বর এ পৃথিবীর জীবনের তুচ্ছতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সে ভয়ংকর দিনে পাহাড় পর্বতের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, সব কিছু সমান হয়ে এক বিশাল প্রান্তরে পরিণত হয়ে যাবে, আর তখন (আজকের) বলদর্পী শক্তিমানদের গর্ব খর্ব হয়ে মহা দয়াময় পরওয়ারদেগারের সামনে সবার কণ্ঠস্বর এমন ক্ষীণ হয়ে যাবে যে, তাদের কণ্ঠ থেকে কোনো আওয়াযই বেরোতে চাইবে না, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি-ক্লান্তির গ্লানিতে সবাই মুহ্যমান হয়ে থাকবে। আল কোরআনের মধ্যে আগত অন্যান্য ধমকের কথার সাথে এ বিবরণী সামনে আসায় আশা করা যায় মানুষের চেতনা প্রভাবিত হবে এবং তারা সত্য সচেতনতার দিকে এগিয়ে আসবে; তাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠবে এবং তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠবে। তারপর এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটছে, অবতরণকালে তাঁর ওপর যে কষ্ট নেমে আসতো সেই অবস্থার ওপর তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তিনি ভুলে যাবেন মনে করে যেন জলদি না করেন এবং একথা মনে করে যেন কোনো কষ্ট না নেন। আল্লাহ তায়ালাই তার জন্যে সব কিছু সহজ করে দেবেন এবং তাঁকে আল কোরআনের হাফেয বানিয়ে দেবেন; তবে অবশ্যই তিনি তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে তাঁর রবের কাছে দোয়া করতে থাকবেন।

প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, আদি পিতা আদম আল্লাহর সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর সকল হুকুম মেনে চলবেন বলে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন, সে কথা স্মরণ করে রসূলুল্লাহ (স.)ও পেরেশান হচ্ছিলেন যে, তিনি আবার কোনো কথা ভুলে যান কি না, বিশেষ করে যখন যালেম ও মরদুদ শয়তান সদা-সর্বদা পেছনে লেগে রয়েছে এবং যখন আদম সন্তানদের বিরুদ্ধে সে দুশমনী করবেই বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। নবী মোহাম্মদ (আ.)-এর সামনে সকল সময়ে ভাসতে থাকত আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির কথা ও বনী আদমের মধ্যে যারা না-ফরমানী করে তাদের করুণ পরিণতির কথা, আর নশ্বর জীবনের সফর শেষে অনাগত কেয়ামতের কঠিন অবস্থার দৃশ্য তাঁকে নিশিদিন পেরেশান করে রাখতো। তিনি কখনও ভুলতে পারতেন না যে, এ সফর শুরু হয়েছে সর্বোচ্চ আকাশে অবস্থিত বেহেশতের মনযিল থেকে, তার পরিসমাপ্তি তো পুনরায় সেখানেই গিয়ে ঘটবে। অতএব এ জীবন তো মাত্র একটি সরাইখানা। এখানে নিশ্চিন্তভাবে থাকা যায় না। আবারও একবার আলোচ্য অধ্যায়টি এখানে শেষ হচ্ছে বলে জানানো হলো।

পরিশেষে রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তিনি যেন বিরুদ্ধবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে তাদের কথায় কান না দেন– বলুক না তারা যা ইচ্ছা তাই, তাতে কি আসে যায়? স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর সহায় রয়েছেন তখন তিনিই তো সকল দিক সামাল দেবেন; তারা যেভাবে যতো চেষ্টাই করুক না কেন তাঁকে কিছুতেই কষ্ট দিতে পারবে না এবং তাঁর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তনই তারা করতে পারবে না; বরং তাদের জন্যে এবং তাদের সব কর্মকান্ডের জন্যে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ব থেকেই ঠিক করা রয়েছে, সে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই তারা পাকড়াও হয়ে যাবে এবং শেষ হয়ে যাবে তাদের সকল জারিজুরি। তারা যেসব ধন-দৌলতের বদৌলতে এমন বাড়াবাড়ি করে চলেছে, কাল কেয়ামতে সেসব কিছুই

হবে তাদের জন্যে কাল। আসলে, প্রাচুর্য্যের আধিক্যে আজকে তারা এটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে, পার্থিব ধন-দৌলত, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য এসব কিছুই তাদেরকে এক পরীক্ষা স্বরূপ দেয়া হয়েছে। অতএব, তিনি যেন ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর স্মরণে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলেই তিনি খুশী হয়ে যেতে পারবেন এবং সকল অবস্থার মধ্যে নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারবেন। অবশ্যই তিনি জেনেছেন, ইতিপূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা বেঁচে থেকেছে, তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, শেষ রসূলের মাধ্যমে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। অতএব, যারা জেনে বুঝে না-ফরমানী করেছে তাদের বিষয় থেকে তিনি যেন হাত গুটিয়ে নেন এবং তাদের চূড়ান্ত ও করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যেন তিনি তাদের ছেড়ে দেন। দেখুন, এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, প্রত্যেকেই তাদের অন্তিম অবস্থা লাভের জন্যে এন্তেজার করে চলেছে। অতএব, তোমরাও এন্তেজার করো, অতপর শীঘ্রই সঠিক পথের অনুসারীদের সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে এবং আরো জানতে পারবে তাদের সম্পর্কেও, যারা হেদায়াত গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।

এভাবেই আমি তোমাকে জানাচ্ছি, হে আমার নবী, অতীতের ঘটনাবলী.......... আমি জানি ওরা যা বলছে, ওদের মধ্যে যে একটু ভালো পথের পথিক ছিলো সে অবশ্যই সে কঠিন দুঃসময়ে বলবে, তোমরা তো দুনিয়ায় মাত্র একটি দিনই অবস্থান করেছিলে,..........(আয়াত ৯৯-১০৪)

অর্থাৎ, এভাবে, যেমন করে আমি মহান আল্লাহ মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে তোমাকে জানাচ্ছি, তেমনি করে আমি অতীতের আরো বহু ঘটনাবলী তোমাকে জানাব যেগুলোর বর্ণনা তুমি এই কোরআনের মধ্যেই পাবে। এজন্যে আল কোরআনের আর এক নাম দেয়া হয়েছে 'উপদেশ' বা স্মৃতিচারণ। যেহেতু এ গ্রন্থ অবতীর্ণই হয়েছে আল্লাহর স্মরণের জন্যে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে জানা ও বুঝার জন্যে, আরো এসেছে এ মহান গ্রন্থ আল্লাহর সে নিদর্শনসমূহ জানাতে যা অতীতে ঘটেছে।

দেখুন, কী চমৎকারভাবে অস্বীকারকারীদের সামনে এ মহা উপদেশবাণী ছবির মতো তুলে ধরা হয়েছে। এতে ওই অস্বীকারকারীদের অপরাধী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে কেয়ামতের একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, ওই অপরাধীরা তেমনি করে তাদের বোঝাগুলো বহন করছে যেমন করে কোনো মোসাফের তার বোঝা বহন করে থাকে, আর আজকের মোসাফেররা যেভাবে বোঝা বইতে বইতে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যায়, তার থেকে অনেক বেশী ওদের ক্লান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। তারপর, প্রকৃতপক্ষে যখন সবাইকে একত্রিত করার জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সেসব অপরাধী ব্যক্তি দুঃসহ দুঃখের জ্বালায় কালিমা লিপ্ত চেহারা নিয়ে হাশরের ময়দানে দলে দলে হাযির হয়ে যাবে, তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে থাকবে, ভয় ও আতংকে তাদের আওয়ায বসে যাবে আর সে উন্মুক্ত হাশরের ময়দানে আতংক তাদের এমনভাবে ঘিরে ফেলবে যে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় তারা খুঁজে পাবে না। এসময়ে কোন বিষয়ে তারা কানাঘুষা করবে? তখন তারা তাদের পার্থিব জীবনের কীর্তিকলাপ স্মরণ করতে থাকবে এবং আন্দায করতে থাকবে যে, সেই শাস্তি বোধ হয় তাদের জন্যে এগিয়ে আসছে যার কথা তাদের পূর্ব জীবনে বলা হতো। তখন ফেলে আসা যিন্দেগী তাদের কাছে বড়োই তুচ্ছ মনে হতে থাকবে এবং অতীতের সে জীবনে তারা সামান্য ক'টি দিন মাত্র কাটিয়েছে বলে মনে হবে। তাদের সেই পারস্পরিক কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'তোমরা বড়ো জোর দিন দশেক দুনিয়ায় ছিলে'। কিন্তু ওদের মধ্যে যার কথা বেশী গ্রহণ করার যোগ্য হবে, সে পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব আরো কম

করে দেখবে, বলবে, 'না না, একদিনের বেশী দুনিয়ায় কেউ তোমরা থাকোনি।' এভাবে ফেলে আসা জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা বিভিন্ন প্রকার হবে এবং মনে হবে গোটা জীবন যেন তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সে দিন সারা জীবনের সঞ্চয় ও আশা-আকাংখা এবং দুঃখ-বেদনা বড়োই তুচ্ছ মনে হবে। এখন চিন্তা করে দেখুন, দুনিয়ার জীবনের দশটি দিন, তা যতোই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, অনন্ত অসীম জীবনের তুলনায় তার কি মূল্য আছে!– একথা তাদের তখনই মনে হতে থাকবে যখন প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হবে, হায় হায়, অতীতের এই তুচ্ছ জীবনের জন্যে আমরা এতো অন্যায় কাজ ও মন্দ আচরণে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আর ভুলে গিয়েছিলাম এই অফুরন্ত যিন্দেগীর কথা! ভুলে গিয়েছিলাম সেই কঠিন পরিণতির কথা যার নেই কোনো অন্ত, নেই কোনো শেষ! তখনই তারা সঠিকভাবে বুঝবে যে, আসল ও অনন্ত জীবন তো তাই যা এই হাশরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেলো। এজন্যে তখন ওদের বার বার মনে হতে থাকবে, যতো সৌভাগ্য ও সুন্দর সচ্ছল জীবন তারা পৃথিবীর জীবনে অতিবাহিত করে থাকুক না কেন, তা তো ছিলো মাত্র একটি দিন বা একটি রজনীর শামিল। তার জন্যেই তারা কি দুঃসহ জ্বালা খরীদ করে নিয়েছে! হায়, তাদের আজ কি হবে?

এসব কথা মনে হতে থাকবে এবং বাড়তে থাকবে তাদের ভীতি ও আতংক, যার কারণে তাদের সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বাড়তেই থাকবে। আবার তাদের মনে ফিরে আসবে পাহাড় পর্বত সম্পর্কে ওই প্রশ্ন, যা জীবদ্দশায় তারা বার বার জিজ্ঞেস করেছে। আজকে ওইসব কথার জওয়াব তারা বাস্তবে দেখবে, অর্থাৎ তাদের সামনেই তারা দেখতে পাবে সবকিছু ধূলিকণায় রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয়েছে এমন এক সুপ্রশস্ত ময়দানে, যার কোনো সীমা শেষ তাদের নযরে পড়বে না– এসব কিছু যতো বেশী তারা দেখতে থাকবে ততোই তাদের আতংক বাড়তে থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে পর্বত-মালা সম্পর্কে, অতএব তুমি বলো, এগুলোকে ধূলিকণা বানিয়ে আমার রব উড়িয়ে দেবেন..........আর ঈমান আনার পর যে ব্যক্তি সকল প্রকার ভালো কাজ করবে, তার প্রতি কোনো যুলুম হবে বলে তার কোনো ভয় হবে না, আর সে ধ্বংস হয়ে যাবে বলেও শংকিত হবে না।' (আয়াত ১০৬-১১২)

এই আয়াতগুলো পাঠকালে সে ভয়ানক দৃশ্যের ছবি যেন পাঠকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে, যে পাহাড় পর্বত সব ভেংগে চুরমার হয়ে গোটা বিশ্ব একটি বিশাল প্রান্তরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং কোথাও কোনো বাঁকা তেড়া বা উঁচু-নীচু দেখা যাচ্ছে না– সুবৃহৎ একটি থালার মতো সব কিছু এক মসৃণ ভূমির আকার ধারণ করেছে।

পাঠকের হৃদয়ে এই অধ্যায়টি অধ্যয়নের সময়ে তীব্রভাবে এই অনুভূতি আসবে যে উন্মত্ত এক তুফানের পর সকল পাহাড় পর্বত ভেংগে চুরমার হয়ে ধুলায় পরিণত হয়ে গেছে এবং এসব ধুলা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এক অন্তহীন সমান্তরাল প্রান্তরের রূপ ধারণ করেছে, এমনভাবে সব কিছু সমান হয়ে গেছে যে, কোনো জায়গায় উঁচুনীচু নেই। নেই কোনোখানে কোনো বাঁকা-তেড়া ভূমি নেই সম্মিলিত অগণিত জনতার ভিড় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করছে। কোনো কিছুর নেই কোলাহল, নেই কোনো গন্ডগোল– সবাই নির্বাক নীরব নিথর, অজানা-অচেনা প্রচন্ড আতংকে সবার বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে, কি করবে, কোথায় যাবে, কি হবে? কিছুই ভেবে না পেয়ে থেমে যাচ্ছে তাদের কাতরানি, মন্থর হয়ে যাচ্ছে তাদের গতি। এসময়ে উত্থিত হচ্ছে ঘোষকের আহ্বান! সে ডাকে সাড়া দিয়ে বিশাল এ জামায়াত অগ্রসর হচ্ছে একমুখী হয়ে এবং একযোগে নীরবে নিশব্দে,

পরিপূর্ণ অনুগতভাবে, কেউ এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, পিছিয়েও থাকছে না কেউ, অথচ এমনও একদিন ছিলো যখন তাদের ডাকা হতো, কিন্তু তখন কেউ তো পিছিয়ে থাকতো আর মুখ ফিরিয়ে চলেও যেতো কেউ। তাই সে ভয়ংকর দিনের ডাকে সাড়া দিয়ে আনুগত্য করার অর্থ এভাবে করা হচ্ছে, 'তারা আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিচ্ছে এমন আনুগত্যের সাথে যে, এ হুকুম পালন করার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই।' অর্থাৎ আজকের এই আনুগত্যের মধ্যে শরীর ও অন্তর দুই শরীক আছে সমস্ত দিল ও জান দিয়ে তারা তেমনি করে আনুগত্য করছে, যেমন করে পাহাড় পর্বতগুলো বিনাবাক্যে ওই কেয়ামতের দিনে আনুগত্য করেছে।

তারপর সে ভয়ংকর নীরবতা ও পরিপূর্ণ শান্ত অবস্থার চিত্র এভাবে আকা হচ্ছে, 'আর মহা-দয়াময় পরওয়ারদেগারের কথা শোনার জন্যে উন্মুখ জনতার সকল শব্দ স্তিমিত হয়ে যাবে, সেদিন তুমি মৃদু গুঞ্জরণ ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবে না।' ....আর শ্রান্ত-ক্লান্ত সকলের চেহারা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে ঝুঁকে থাকবে।'

এভাবে ওই গোটা পরিবেশে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মর্যাদা প্রকাশিত হবে এবং তাঁর মর্যাদা সে সমগ্র প্রান্তরব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে যার পরিধি অনুমান করতে পারবে না কোনো চোখ, আর ভয়ে ও মিনতিতে কেউ কোনো দিকে তাকাতেও সাহস পাবে না। সুতরাং কিছু গুঞ্জরন ধ্বনি শোনা যাবে, ফিসফিসিয়ে একে অপরকে কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু বিনয়াবনতভাবে নীচের দিকে ঝুঁকে থাকা চেহারা থেকে সেসব শব্দ বেরুবে। চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহর সুমহান মর্যাদা ভীষণভাবে সকলের ওপর ছেয়ে থাকবে। সেদিন সেই ব্যক্তি ছাড়া কেউ কারো জন্যে শাফায়াত করতে পারবে না, যার ওপর আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে যাবেন। আর সব কিছুর যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই থাকবে, অর্থাৎ একমাত্র কি হবে না হবে সে বিষয়ে তিনি ছাড়া কেউ কিছুই জানবে না। সে দিন অত্যাচারী যালেম ব্যক্তিরা তাদের যুলুমের বোঝা কাঁধে নিয়ে শাস্তির নির্দেশের জন্যে প্রহর গুনতে থাকবে এবং তারপর তাদের নিক্ষেপ করা হবে চরম হীনতা ভরা স্থানে। অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে তারা থাকবে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত অবস্থায় হিসাব নিকাশের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে বলে তারা কোন ভয় করবে না এবং যেসব ভালো কাজ তারা করেছে তার কোনোটা বাতিল করে দেয়া হবে বলেও তারা মনে করবে না।

মহাশক্তিমান, সকল মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর সুমহান মর্যাদা পরিব্যাপ্ত থাকবে সব কিছুর ওপর— তাঁরই সম্মান ঢেকে রাখবে গোটা পরিবেশকে; কিন্তু তিনি যে রহমান— পরম দয়াময়, তাঁর দয়ার মহিমা বিজয়ী অবস্থায় বিরাজ করতে থাকবে সব কিছুর ওপর। এসব কথা নিয়েই আসছে মহান রব্বুল আলামীনের পরবর্তী কথা—

'আর এমনি করে আমি মহান আল্লাহ নাযিল করেছি এই কোরআনে করীম আরবী ভাষায় এবং তার মধ্যে সে ভয়ংকর অবস্থার কথা জানিয়ে সবাইকে সময় থাকতেই সতর্ক করে দিয়েছি, এবং ভয়ানক ও কঠিন আযাবের ভয়ও দেখিয়েছি, যেন আল্লাহর ভয়ে তারা বাছ-বিচার করে চলতে পারে অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার উদ্রেক করে।

এভাবে বিভিন্ন প্রসংগে কোরআনের মধ্যে নানা প্রকার আযাবের ভয় দেখিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে। কোথায় কাকে কিভাবে আযাব দেয়া হবে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে এসব কথা অপরাধীদের অন্তরে ভয় জাগায়, অথবা আখেরাতে কি ঘটবে সে বিষয়ে প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয়ে চিন্তা জাগে এবং অন্যায় কাজ ও আচরণ থেকে তারা আজই বিরত হয়ে যায়..........এই কথা সূরার শুরুতে আল্লাহ রব্বুল

আলামীন তুলে ধরেছেন। বলছেন, 'আমি মহান আল্লাহ, তোমার কাছে আল কোরআন তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে পাঠাইনি বরং এ পাক কালাম হচ্ছে এক মহা উপদেশ সেই ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে।'

অবশ্যই এটা দেখা যেতো, যখন রসূলুল্লাহ (স.) কোনো ওহী পেতেন তখন সে ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পূর্বে কোরআনের শব্দ ও আয়াতগুলো তিনি বার বার উচ্চারণ করতেন। এই ভয়ে তিনি বার বার আওড়াতেন যেন কোনো শব্দ বা বাক্য ছুটে না যায় বা ভুল না হয়ে যায়, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় তাঁর অবশ্যই কষ্ট হতো; এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে সেই আমানতের গুরুভার বহন করার জন্যে সান্ত্বনা দিতে চাইছেন যার বিরাট বোঝা তাঁকে বহন করতে হচ্ছে বলছেন,

'আল্লাহ সুমহান, যিনি প্রকৃতপক্ষে হক মালিক। না, আল কোরআন আয়ত্ত করতে গিয়ে তুমি জলদি করো না– যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার ওহী আসা সম্পূর্ণ হয় বরং তুমি বলো, হে আমার রব, তুমি আমার এলেম (জ্ঞান) বাড়িয়ে দাও।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালাই সুমহান মালিক, তিনিই প্রকৃতপক্ষে বরহক মালিক যার সামনে সকল চেহারা বিনয়াবনতভাবে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর সামনে সকল যালেম গোষ্ঠী ব্যর্থ হয়ে যায়, আর নিরাপত্তা লাভ করে নেককার মোমেনরা.......... তিনিই তো এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন তাঁর নিজ মর্যাদাপূর্ণ স্থান থেকে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তোমার জিহবা (এ পাক কালাম) উচ্চারণ করার ব্যাপারে যেন ব্যস্ত না হয়ে যায়, অবশ্যই আল কোরআন নাযিল হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে– তাঁর কাছ থেকে, যিনি এ পাক কালাম পাঠাচ্ছেন, কিন্তু তিনি একে ক্ষতিগ্রস্ত হতে অথবা হারিয়ে যেতে দেবেন না। তোমার দায়িত্ব তো শুধু এতোটুকু যে, তুমি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে তোমার রবের কাছে দোয়া করতে থাকবে। এরপর, যা তিনি তোমাকে দেবেন তা নিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো তোমার কাছ থেকে কিছু চলে যাবে বা হারিয়ে যাবে এ আশংকা তুমি করো না। সাফ সাফ জেনে নাও, এলেম বা নির্ভুল ও সুনিশ্চিত জ্ঞান তাই যা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে শেখাচ্ছেন আর অবশ্যই তিনি চিরস্থায়ীভাবে তাঁর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তিনি উপকার করেন, ক্ষতি করেন না, তিনি কৃতকার্য করেন, কাউকে ব্যর্থ করেন না।

শয়তানের প্ররোচনায় আদম (আ.)–এর ভুল ও পরিণতি

এরপর আসছে আদম (আ.)-এর কেসসা, আল্লাহর সাথে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন তা রক্ষা করতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি চিরস্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার ধোঁকাপূর্ণ আশ্বাসের কাছে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, আর এই কারণেই তিনি সেই ধোঁকাবাজ মরদূদ শয়তানের প্ররোচনাপূর্ণ কথায় কান দিয়েছিলেন। অথচ তাঁকে পৃথিবীতে খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে নিযুক্ত করার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলো এটা এক কঠিন পরীক্ষা, আর এ ঘটনা আদম সন্তানদের শিক্ষার জন্যে জানানো হয়েছে। অতপর ইবলীসের এই ধোঁকাবাজির কাজকে উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছেন যাতে করে তারা নিসন্দেহভাবে বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী যে কোনো কথা বা ইচ্ছা, যে কোনো দিক থেকেই তা আসুক না কেন– তাই শয়তানী প্ররোচনা ও ধোঁকা, যার ফল ধ্বংসই ধ্বংস। অতএব আদম (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে যেন তারা শিক্ষা নেয় এবং আর যেন ধোঁকা না খায়। তারপর পরীক্ষা যখন শেষ হলো, আদম (আ.) অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে মিনতি জানালেন, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর তাওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে পরবর্তীতে সত্য সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন।

পবিত্র কোরআনে বর্নিত ঘটনাবলীর মাঝে পরস্পর একটা যোগসূত্র ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে আদম (আ.) সম্পর্কিত ঘটনাটি আলোচিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কিত সেই ঘটনার পর, যেখানে আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে দেখতে পাই যে, তিনি ভুলে যাওয়ার আশংকায় কোরআনের আয়াতগুলো মুখস্থ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছেন। এখানে আদম (আ.)-এর ঘটনায় ভুলে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে, সাথে সাথে আলোচ্য সূরায় এ কথাও বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও সাহায্য থাকে। কাজেই আদম (আ.) আল্লাহর একজন মনোনীত ও সত্য পথের অনুসারী বান্দা হিসেবে তাঁর অনুগ্রহের হকদার। আর সে কারণেই, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-এর ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। এরপর কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এই দৃশ্যে আমরা আদম (আ.)-এর বাধ্য ও অবাধ্য সন্তানদের পরিণতি দেখতে পাই। এই দৃশ্যের মাধ্যমে মনে হচ্ছে যেন প্রতিটি প্রাণী তার কর্মফল ভোগ করার জন্যে পার্থিব জগত হতে পরকালের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে।

এখন আমরা মূল ঘটনার প্রসংগে ফিরে যাচ্ছি। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি এর আগে আদমকে....... দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পাইনি। (আয়াত ১১৫)

আদম (আ.)-এর কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে, সব ধরনের ফলমূল খাবে, তবে একটি বিশেষ ফল বা বৃক্ষ খেতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন আছে। কারণ, এর মাধ্যমে মানবীয় ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিত্ব দৃঢ়করণ, রিপুর দমন ইত্যাদি মহৎ উদ্দেশ্য সধিত হয়। সাথে সাথে এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে ততোটুকু মুক্ত রাখতে পারে যতোটুকু তার আত্মার উন্নতি ও স্বাধীন বিকাশের জন্যে প্রয়োজন। ফলে প্রবৃত্তি ও রিপুর দাসত্ব থেকে তার আত্মা মুক্ত থাকবে। আর এটাই হচ্ছে মানব উন্নতি নিরূপণের নির্ভুল মাপকাঠি। যার মাঝে প্রবৃত্তি ও রিপুকে দমন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা যতো বেশী থাকবে সে মানব ততোই উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থান করবে। অপরদিকে যার মাঝে এই গুণের যতো বেশী অভাব দেখা দেবে সে ততোই পশুত্বের নিম্নতর স্তরে চলে যাবে।

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা– যিনি মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রতিপালক, মানুষের মাঝে ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং এই ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও দান করেছেন। পৃথিবীর বুকে ‘আল্লাহর প্রতিনিধি’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্যে এই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন আছে। তবে আল্লাহ তায়ালা তার সামনে ভালো ও মন্দের পার্থক্য তুলে ধরেছেন এবং প্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানী প্ররোচনার সাথে সদিচ্ছা ও আল্লাহর সাথে করা প্রতিজ্ঞার মাঝে যে প্রচন্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে সে কথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আসছে পরীক্ষার পালা। প্রথম পরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ–

‘অতপর সে ভুলে গিয়েছিলো, আমি তার মাঝে দৃঢ়তা পাইনি’। এর পর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে, (আয়াত ১১৬-১১৯)

এটা আল্লাহর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আদমকে তার প্রকৃত শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সাবধান করে দিয়েছিলেন। আদমকে সাজদা করার আল্লাহর নির্দেশ যে অমান্য করতে পারে সে যে, আদমের চরম শত্রু, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। সে কারণেই আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ‘সে যেন তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয় ফলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে।’

এই কষ্ট কিসের? এই কষ্ট হচ্ছে কাজের, পরিশ্রমের, বিতাড়নের, বিভ্রান্তির, বিচ্যুতির, উদ্বেগের, উৎকণ্ঠার, অপেক্ষার, বেদনার এবং হারানোর। জান্নাতের বাইরে এসব কষ্টই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অর্থাৎ, জান্নাতের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে যতোদিন তারা থাকবে ততোদিন এসব কষ্ট তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। এখানে ক্ষুধার্ত হওয়ার ভয় নেই। তৃষ্ণার্ত হওয়ার ভয় নেই। বস্ত্র হারানোর ভয় নেই। রোদে কষ্ট পাওয়ার ভয় নেই। অর্থাৎ যতোদিন পর্যন্ত এই জান্নাতের ছায়াতলে বাস করবে ততোদিন পর্যন্ত তোমাদের জন্যে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়া হবে, কিন্তু আদম (আ.) খোদায়ী পরীক্ষার ব্যাপারে সচেতনতার অভাবে এবং চিরস্থায়ী জীবন ও ক্ষমতা লাভের মানবীয় দুর্বলতার কারণে শয়তানের চক্রান্তের শিকার হন। এই মানবীয় দুর্বলতার ছিদ্র দিয়েই তাঁর মাঝে শয়তানের প্রবেশ ঘটে। বলা হচ্ছে, কিন্তু এতো সাবধান করা ....কখনো পতন হবে না! (আয়াত ১২০)

শয়তান আদম (আ.)-এর স্পর্শকাতর জায়গায়ই হাত দিয়েছিলো। কারণ, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তার শক্তি সামর্থ্য ও সীমিত। কাজেই দীর্ঘ জীবন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতার প্রতি সে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী। এই আগ্রহের পথ ধরেই শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস পায়। আমরা জানি, আদম (আ.)-কে মানবীয় স্বভাব ও মানবীয় দুর্বলতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ও রহস্য রয়েছে যা আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে। এই মানবীয় দুর্বলতার কারণেই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে, অতপর তারা ....তাকে সঠিক পথনির্দেশ দিলেন। (আয়াত ১২১-১২২)

বিভ্রান্তি কেটে যাওয়ার পর আদমের প্রতিক্রিয়া

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, লজ্জাস্থান বলতে উভয়ের বাহ্যিক ও দৃষ্টি গোচর লজ্জাস্থানই বুঝানো হয়েছে, যা পরস্পরের কাছে গোপন ছিলো। উভয়ের কাছেই এই লজ্জা স্থান নিজেদের শরীরের সর্বাধিক গোপনীয় অংগ হিসেবে বিবেচিত ছিলো। সে জন্যে তা উন্মুক্ত ও নিরাভরণ হয়ে পড়লে উভয়ই বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তা পুনরায় আবৃত করার জন্যে গাছের লতা পাতা ব্যবহার করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে উভয়ের মনে কামভাব জন্ম নিয়েছিলো। কারণ, কামভাব জন্ম না নিলে সাধারণত মানুষ লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হলে কোনো প্রকার লজ্জা অনুভব করে না, এমনকি এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না, কিন্তু কামভাব জাগ্রত হলেই মানুষ লজ্জাস্থান সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং তা অনাবৃত হয়ে গেলে লজ্জাবোধ করে।

খুব সম্ভবত নিষিদ্ধ বৃক্ষটির ফল কামোদ্দীপক ছিলো। আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন, উভয়ের মাঝে এই কামভাব বিলম্বে জাগ্রত হোক। তাই তিনি তাদের সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। অথবা, আল্লাহর সাথে করা প্রতিজ্ঞা ভুলে যাওয়া এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করার ফলে নিজেদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের যে সম্পর্কচ্যুতি ঘটে, তারই অনিবার্য কারণ হিসেবে দৈহিক চাহিদার উদ্ভব ঘটে এবং এরই চরম পরিণতি হিসেবে তাদের মাঝে কামভাব জাগ্রত হয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, যখন উভয়ের মাঝে অমর হয়ে থাকার আগ্রহ জাগে তখনই তাদের মাঝে বংশ বিস্তারের উপায় হিসেবে কামভাবও জন্ম নেয়। কারণ, সীমিত ও নির্ধারিত আয়ু অতিক্রম করে পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে থাকার এটাই একমাত্র সহজ উপায়। তবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এই যা কিছু বলা হলো তা নিতান্তই অনুমানভিত্তিক। আর অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো' বক্তব্যটির কারণে। আয়াতটিতে এ কথা বলা হয়নি যে, 'তাদের লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো।' বরং বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যে তাদের লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উভয়ের লজ্জাস্থান উভয়ের দৃষ্টির আড়ালে ছিলো। পরে তাদের উভয়ের কামভাবের কারণে তা দৃশ্যমান হয়ে পড়লো। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'যেন শয়তান তাদের গোপন লজ্জাস্থান তাদের জন্যে

প্রকাশ করে দিতে পারে।' অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।' শয়তান যে পোশাক খুলে ফেলেছে সেটা বস্তুগত পোশাক না হয়ে কোনো গোপন অনুভূতিও হতে পারে। এমনকি তা পবিত্রতা, পাপহীনতা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অনুভূতিও হতে পারে। যা হোক, এগুলো নিতান্তই অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এগুলোর একটিও আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত নয়। এখানে কেবল মানব জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার বিষয়টি বোধগম্য করে তোলার জন্যেই এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অমনযোগী হওয়ার ফলে তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার পর পুনরায় আদম ও তাঁর স্ত্রীর ভাগ্যে আল্লাহর রহমত ও দয়া জুটে। এটা ছিলো তাঁদের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এ প্রসংগ উল্লেখ করে আয়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু তার ক্ষমা প্রার্থনার .... সঠিক পথ নির্দেশ দিলেন। (আয়াত ১২২)

আল্লাহর এই অপার করুণা ও অনুগ্রহ তারা তখন লাভ করতে সক্ষম হয় যখন তারা অনুতপ্ত হয়, দুঃখিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। তবে এই বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর রহমতকে এর নিজস্ব পরিবেশেই উদ্ভাসিত করা।

এরপর পরম দুই শত্রু আদম ও ইবলীসকে পৃথিবী নামক এক দীর্ঘ যুদ্ধ ময়দানে অবতীর্ণ হতে নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, তিনি বললেন .... কোনো কষ্ট পাবে। (আয়াত ১২৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে উভয় জাতের মধ্যকার শত্রুতার বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো। এর পর আদম বা তার কোনো সন্তানের পক্ষ থেকে সে ব্যাপারে অজ্ঞতার কোনো আপত্তিই চলবে না। সে আর বলতে পারবে না যে, শয়তান যে আমাদের শত্রু এ কথা আমার জানা ছিলো না। কারণ শয়তান যে মানব জাতির শত্রু এ ঘোষণা ঊর্ধ্বলোকেই দেয়া হয়েছে এবং সে ঘোষণা গোটা সৃষ্টি জগতের মাঝে ধ্বনিত হয়েছে।

এই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা স্বর্গে মর্তে, আকাশে-পাতালে ধ্বনিত হওয়া সত্তেও এবং এই ঘোষণার ব্যাপারে গোটা ফেরেশতা জাতি সাক্ষী থাকা সত্তেও কেবল বান্দার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। চির শত্রুতার বিষয়টি যে দিন ঘোষণা দেয়া হয়, সেদিনই এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, মানুষের হেদায়াতের জন্যে তাদের মধ্য থেকেই পথপ্রদর্শকের আগমন ঘটবে। যারা তার নির্দেশ মানবে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। যারা তার নির্দেশ অমান্য করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে। নিচের আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে, তিনি বললেন........ আযাবই হচ্ছে বেশী কঠিন এবং অধিক স্থায়ী। (আয়াত ১২৩-১২৭)

কঠিন শাস্তির এই দৃশ্য ঘটনার শেষে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন এটাও এ ঘটনারই একটা অংশ। আদম ও হাওয়ার ঘটনার শেষে ঊর্ধ্বলোকেই এই শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কাজেই এটা একটা খোদায়ী মীমাংসিত ও চূড়ান্ত বিষয়। এখানে পিছপা হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই এবং পরিবর্তনেরও কোনো সুযোগ নেই।

'এখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত পথে চললে মানুষ পথভ্রষ্টতা ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। এ দুটো অমংগল জান্নাতের দোরগোড়ায় তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তবে যারা আল্লাহর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলবে, তাদের তিনি এই দুটো অমংগল থেকে রক্ষা করবেন। কষ্ট বা দুর্ভাগ্য হচ্ছে পথভ্রষ্টতারই পরিণতি। পথভ্রষ্টরা ভোগ বিলাসিতায় ডুবে থাকলেও তারা এই কষ্ট থেকে রেহাই পাবে না। কারণ, এই ভোগ বিলাসিতাই হচ্ছে এক ধরনের অমংগল। ইহকালের জন্যেও অমংগল এবং পরকালের জন্যেও অমংগল। অবৈধ ও অনৈতিক সকল ভোগ বিলাসিতার পরিণতি

অমংগল ও দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। যখনই কোনো মানুষ আল্লাহর দেখানো পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে, তখনই সে মানসিক দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, উৎকন্ঠা ও অনিশ্চয়তার মাঝে হাবুডুবু খাবে। তার প্রতিটি কাজে ও পদক্ষেপে জড়তা, ভারসাম্যহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ প্রকট হয়ে দেখা দেবে। সত্য কথা হচ্ছে, অমংগল ও দুর্ভাগ্য পথভ্রষ্টতা ও লক্ষহীনতারই নামান্তর। এরপর চরম অমংলের পালা আসবে শেষ বিচারের পর, অনন্ত অসীম জগতে। অপরদিকে যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলবে তারা এই অমংগল ও দুর্ভাগ্য হতে মুক্ত থাকবে এবং এর ফলে দুনিয়াতেই হারানো জান্নাতের বিকল্প পেয়ে যাবে। আর পরকালে তো আসল জান্নাত তাদের জন্যে থাকবেই। (আয়াত ১২৪)

আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন জীবন, আল্লাহর রহমতের সাথে সম্পর্কহীন জীবন তো কষ্টকর হবেই তা যতোই বিলাসী হোকনা কেন, যতোই সহায় সম্পদে পরিপূর্ণ হোক না কেন। এই কষ্ট আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার কারণে, এই কষ্ট আসে আল্লাহর সান্নিধ্যজনিত প্রশান্তির অভাবে। এই কষ্ট হচ্ছে বিভ্রান্তিজনিত, উদ্বেগজনিত, ভয় ও আশংকাজনিত। এই কষ্ট কামনা বাসনার পেছনে দৌড়ানোর ফলে। এই কষ্ট আসে প্রতিটি হারানো বস্তুর জন্যে আহাজারির ফলে। মোটকথা, মনের সুখ-শান্তি এবং হৃদয়ের স্থিরতা কেবল আল্লাহর সান্নিধ্যেই লাভ হয়। মানুষ কেবল তখনই নিজের মাঝে আস্থা ও নৈতিক শক্তি অনুভব করতে পারে যখন আল্লাহর সাথে দৃঢ় ও অটুট সম্পর্ক থাকবে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অটুট সম্পর্ক দ্বারা যে মানসিক প্রশান্তি লাভ হয় তা গোটা জীবনকে কানায় কানায় ভরে দেয়। আর যখন সে এই অনাবিল মানসিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হয় তখন তার জীবনে নেমে আসে হতাশা ও বঞ্চনার কালো ছায়া, যা দারিদ্র্য ও ব্যর্থতাজনিত হতাশার চেয়েও মারাত্মক। (আয়াত ১২৪)

আল্লাহর স্মরণ বা যেকের থেকে গাফেল হলে পার্থিব জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের শিকার হতে হবে। শুধু তাই নয়, পরকালে এমন ব্যক্তিকে অন্ধ করে ওঠানো হবে। এই অন্ধত্ব হচ্ছে তার পার্থিব জীবনের ভ্রষ্টতারই স্বাভাবিক পরিণতি এবং তার গাফলত উদাসীনতার শাস্তি। তখন সে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবে যে, তাকে অন্ধ করে কেন উঠানো হলো, সে তো পৃথিবীতে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলো? তাই এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তিনি বলবেন............ বেশী কঠিন এবং অধিক স্থায়ী। (আয়াত ১২৬-১২৭)

অর্থাৎ তার সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির শাস্তিস্বরূপ তাকে এভাবে অন্ধ করে ওঠানো হয়েছে। আল্লাহকে ভুলে গিয়ে সে বাড়াবাড়ি করেছে। সরল ও সত্য পথকে প্রত্যাখ্যান করে বাড়াবাড়ি করেছে অথচ এটা ছিলো তার জন্যে এক অমূল্য রত্ন অমূল্য সম্পদ। দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সে বাড়াবাড়ি করেছে। কারণ, এই দৃষ্টি শক্তিকে আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবলোকন করার পরিবর্তে ভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। কাজেই তার জীবন তো কষ্টদায়ক হবেই। এমনকি পরকালেও তাকে অন্ধত্ব বরণ করতে হবে।

বর্ণনাভংগি আর দৃশ্যের চিত্রায়নে এখানে আমরা একটা অপূর্ব মিল লক্ষ্য করছি। জান্নাত ত্যাগের ফলে দুর্ভাগ্য ও হতাশার সৃষ্টি। অপরদিকে জান্নাতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এই দুর্ভাগ্য ও হতাশা থেকে মুক্তি। পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসিতার বিপরীতে এসেছে দুঃখ-দুর্দশা। অপরদিকে হেদায়াতের বিপরীতে এসেছে অন্ধত্ব। আর এসব বর্ণনা এসেছে আদম (আ.)-এর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। কারণ এই ঘটনা হচ্ছে মূলত গোটা মানব জাতিরই ঘটনা। তাই এর সূচনাও হয়েছে জান্নাতকে কেন্দ্র করে এবং সমাপ্তিও ঘটেছে জান্নাতকে কেন্দ্র করেই, যেমনটি ঘটেছে সূরা আ'রাফে। অবশ্য উভয় সূরার প্রাসংগিক বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দুনিয়ার জীবনে অপরাধের শাস্তি না দেয়ার রহস্য

ঘটনার উভয় প্রান্তের বর্ণনা শেষে এখন অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর বর্ণনা আসছে। সময়ের ব্যবধানে অতীতের এসব ঘটনা কেয়ামতের তুলনায় অনেকটা হাল যমানার ঘটনার মতোই। অনাগত কেয়ামতের দৃশ্য চাক্ষুষ না হলেও অতীতের এসব ঘটনা চাক্ষুষ। তাই বলা হচ্ছে, এদের আগে আমি কতো কতো .... সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারো। (আয়াত ১২৮-১২৯)

বাহ্যিক দৃষ্টি ও দিব্য দৃষ্টি দিয়ে যখন মানুষ অতীতের এসব ঘটনার দিকে তাকায়, যখন খুব কাছ থেকে এসব ধ্বংসযজ্ঞের নিদর্শনগুলো প্রত্যক্ষ করে, যখন নির্জন ও পরিত্যক্ত এসব ঘর বাড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে, যখন কল্পনায় এসব ঘর বাড়ির বাসিন্দাদের অস্তিত্ব অনুভব করে তখন সে ওদের আনাগোনা টের পায়। ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। ওদের আশা আকাংখার কথা অনুভব করে। ওদের দুঃখ-সুখের বিষয়টি অনুভব করে। কল্পনায় এসব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ যখন সে চোখ মেলে তাকায় তখন সে আর কিছুই দেখতে পায় না। বরং তার চোখের সামনে বিরাজ করে শূন্যতা ও নির্জনতা। তখন এই বিরাট শূন্যতার মাঝে অতীত ও বর্তমান বিলীন হয়ে যায়। আর ঠিক সে মুহূর্তেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন সে বুঝতে পারে, আল্লাহর জন্যে সবই সম্ভব। যিনি অতীতের জাতিগুলোকে ধ্বংস করতে পেরেছেন, তিনি বর্তমান যুগের জাতিগুলোকেও ধ্বংস করতে সক্ষম। এই উপলব্ধির সাথে সাথে সে 'সতর্ক করা, উপদেশ গ্রহণ করা' ইত্যাদির তাৎপর্যও বুঝতে পারে। এটা শুভবুদ্ধিরই লক্ষণ। কারণ, অতীত থেকে কেবল বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

বিশেষ কোনো হেকমত ও রহস্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা যদি পাপী বান্দাদের দুনিয়ার বুকেই নিশ্চিহ্ন না করার ওয়াদাবদ্ধ না হতেন, তাহলে অতীতকালের জাতিগুলোর বেলায় যা ঘটেছিলো এদের বেলায়ও তাই ঘটতো। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ হওয়াতে এবং একটা সময়সীমা নির্ধারণ করার ফলে এমনটি হয়নি। এ বিষয়টির দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে। (আয়াত ১২৯)

ওদের শাস্তি বিলম্বিত করা হয়েছে মাত্র, রহিত করা হয়নি। কাজেই হে নবী ওদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন, ওদের চাকচিক্যময় আহার বিহার দেখে তুমি বিস্মিত হয়ো না, বিচলিত হয়ো না, এগুলোর মাধ্যমে তো ওদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, ওদের দায়ভার আরো বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা তুলনাহীন, ওদের সে ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যময় জীবনের তুলনায় তা অনেক বেশী মূল্যবান ও মংগলময়। কাজেই তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই। (আয়াত ১৩০-১৩২)

অর্থাৎ বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপ, ওদের উপহাস বিদ্রূপ, ওদের অহমিকা অস্বীকৃতি এবং ওদের তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের মোকাবেলায় তুমি ধৈর্যধারণ করো। এর কারণে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না। ওদের এই অবস্থার জন্যে তোমার হা হুতাশ করারও প্রয়োজন নেই; বরং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করো। সকাল বিকাল তাঁকেই স্মরণ করো, তাঁরই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করো। প্রভাতের নির্জন মুহূর্তে যখন জীবনের চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতার সূচনা হয় এবং বেলা শেষে যখন গোটা প্রকৃতি ঝিমিয়ে পড়ে, চোখের পাতা বন্ধ করে নেয়, অর্থাৎ দিনের প্রতিটি মুহূর্তেই নিজেকে আল্লাহর সাথে জড়িয়ে রাখো, সম্পৃক্ত রাখো, এর মাধ্যমে তুমি শান্তি পাবে, তৃপ্তি পাবে।

আল্লাহর যেকের ও তসবীহের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই সম্পর্কের ফলে সে এক অনাবিল মানসিক শান্তি ও সুখ অনুভব করে। এই শান্তি হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যের, আর এই সুখ হচ্ছে তাঁরই নিরাপদ সান্নিধ্যের।

তাহলে বুঝা গেলো যে, এবাদাত রিয়াযতের ফল হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি। পার্থিব জীবনের জন্যে এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান। এর মাধ্যমে বান্দার হৃদয় মন সুখ শান্তিতে ভরে উঠে।

আল্লাহর এবাদাতের প্রতি মনোনিবেশ করুন। কাফের মোশরেকদের ধন দৌলত, সন্তান সন্ততি, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং জৌলুসময় জীবনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করার দরকার নেই। কারণ এগুলো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, ফুল যেমন দেখতে খুব সুন্দর লাগে, আকর্ষণীয় লাগে, এসব ক্ষণস্থায়ী বিলাস সামগ্রীও তেমনিই, কিন্তু ফুল সুন্দর হলেও তার এই সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। কারণ খুব কম সময়ের ব্যবধানেই ফুল শুকিয়ে যায়, নেতিয়ে পড়ে। পার্থিব ভোগ বিলাসিতার অবস্থাও ঠিক এমনটিই হয়ে থাকে। তাছাড়া এগুলো হচ্ছে পরীক্ষার জন্যে। এর মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, কিন্তু আপনাকে যা দান করা হয়েছে তা পরীক্ষাস্বরূপ নয়, বরং নেয়ামতস্বরূপ দান করা হয়েছে। এই নেয়ামত মংগলময়, কল্যাণময়। এর অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী নয়, চোখের ধোকা নয় এবং কোনো আপদও নয়।

পরিবার পরিজনদের প্রতি নামাযের আদেশ

এটা কিন্তু বৈরাগ্যের প্রতি আহ্বান নয়, জীবনের বৈধ আরাম আয়েশ ত্যাগ করার আহ্বান নয়; বরং এটা হচ্ছে শাশ্বত ও চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতি গৌরব প্রকাশের আহ্বান, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান, তাঁর প্রতি রাযি খুশী থাকার আহ্বান। অর্থাৎ মানুষ যেন ধন দৌলতের জৌলুসে আত্মহারা না হয়ে পড়ে। এর কারণে সে যেন তার প্রকৃত ও উন্নত আদর্শের প্রতি তার গৌরব এবং শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে না ফেলে; বরং সব সময়ই যেন এসব ক্ষণস্থায়ী ও চোখ ধাঁধানো বিলাস সামগ্রীর ব্যাপারে সে নিস্পৃহ থাকে এবং নিজেকে এসবের অনেক ঊর্ধ্বে মনে করে।

'তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও।' এই আয়াতের আলোকে প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে তার ঘরকে একটা মুসলিম ঘরে রূপান্তরিত করা। তার পরিবারের সবাইকে নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা যাতে করে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন হয়ে যায়। যে পরিবারের সকলের লক্ষ্য কেবল আল্লাহমুখী হয়, সে পরিবারের ছায়াতলে বাস করার মাঝে যে কি শান্তি তা বলে শেষ করার মতো নয়।

'এবং এর ওপর অবিচল থাকো,' অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে নামায কায়েম করার ব্যাপারে অবিচল থাকো। এই নামাযের সৎ প্রভাব নিজের মাঝে সৃষ্টি করার ব্যাপারে অবিচল থাকো। মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে নামাযের মূল ও যথার্থ প্রভাব। নামাযীর আচার আচরণে এই প্রভাব সৃষ্টি করার জন্যে নামাযের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হতে হবে। যদি এই কাংখিত প্রভাব সৃষ্টি হয় তখনই বলা যাবে, নামায কায়েম করা হচ্ছে। অন্যথায় এই নামাযে কিছু বাক্য ও কিছু ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

এই নামায, এই এবাদাত বন্দেগী এবং এই আল্লাহমুখী কর্মকান্ড হচ্ছে তোমার দায়িত্ব কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে আল্লাহর কিছুই পাওয়ার নেই। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তোমার মুখাপেক্ষী নন। বান্দার এবাদাতেরও তিনি মুখাপেক্ষী নন। 'আপনার কাছে আমি কোনো রেযেক কামনা করছি না রেযেক তো আমিই আপনাকে প্রদান করবো।' নামায হচ্ছে একটি এবাদাত। এর মাধ্যমে তাকওয়া পরহেযগারী অর্জিত হয়। আর শুভ পরিণতি কেবল তারাই লাভ করবে যারা তাকওয়া পরহেযগারীর অধিকারী হবে। কাজেই মানুষ নিজেই এই এবাদাতের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে লাভবান হবে। কারণ, এবাদাতের বিনিময়ে সে নিজেই দুনিয়ার যিন্দেগীতে সুখ শান্তি ভোগ করবে এবং পরকালে পাবে পরম পুরস্কার। এতে আল্লাহর লাভ লোকসানের কিছুই নেই এবং জগদ্বাসীর কাছেও তাঁর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই।

সূরাটি শেষ করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা সেই সকল অহংকারী, ভোগবাদী ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের প্রসংগ উল্লেখ করছেন যারা এই পবিত্র গ্রন্থের আগমনের পরেও রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে নবুওতের নিদর্শন দাবী করে। অথচ এই কোরআন পূর্ববর্তী সকল নবী রসূলের ঘটনার বিবরণ সুস্পষ্টভাবে দিচ্ছে। এরপরও তারা বলে, এতো কিছু সত্তেও.........আগের কেতাবসমূহে মজুদ রয়েছে! (আয়াত ১৩৩)

গোয়ার্তুমি, দম্ভ এবং অহমিকার বশবর্তী হয়ে নিছক দাবীর খাতিরেই তারা এ জাতীয় উদ্ভট দাবী উত্থাপন করে থাকে। অন্যথায় তাদের জন্যে এই কোরআনই ছিলো বড়ো নিদর্শন। এর মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানসহ সকল যুগের নবুওতের ঘটনাবলীই বর্ণিত হয়েছে। নবুওতের প্রকৃতি এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কেও অভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও এতে স্থান পেয়েছে।

আল্লাহদ্রোহী এসব লোক যাতে কোনো প্রকার তালবাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, সে জন্যে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যদি এর আগেই তাদের........আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম। (আয়াত ১৩৪)

যে মুহূর্তে এই আয়াত তাদের পাঠ করে শুনানো হচ্ছিলো. সেই মুহূর্তে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিতও হয়নি এবং অপমানিতও হয়নি; বরং এখানে ওদের চূড়ান্ত পরিণতির কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ পরকালে ওরা যখন লাঞ্ছিত অপমানিত হবে তখন হয়তো ওদের মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়বে, 'কতই না ভালো হতো যদি আমাদের জন্যে কোনো রসূল প্রেরিত হতো'...........কিন্তু পরকালে তারা সে ওযর আপত্তির আশ্রয় নিতে পারতো তার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ তায়ালা ঠিকই রসূল প্রেরণ করলেন, ফলে বেহুদা ওযর আপত্তি পেশ করার আর কোনো সুযোগই ওদের রইলো না।

ওদের এই চরম পরিণতির বিষয়টি উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলা হচ্ছে, তিনি যেন ওদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। ওদের নিয়ে আদৌ কোনো হা হুতাশ না করেন। ওরা ঈমান গ্রহণ করেনি বলে আদৌ কোনো দুঃখ প্রকাশ না করেন; আল্লাহ তাঁর রসূল (স.)-কে বরং ওদের ওই চরম পরিণতির ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। (আয়াত ১৩৫)

সূরার সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে পূর্ণ সংগতি রক্ষা পেয়েছে। উৎস স্থানে উপদেশ গ্রহণের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। যারা এই উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্যে রয়েছে মংগল ও কামিয়াবী। আর যারা গ্রহণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে আর কিছুই করার নেই। উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয়ার পর এখন তাদের পরিণতির জন্যে অপেক্ষার পালাই বাকী থাকবে। আর এই চূড়ান্ত পরিণতির বিষয়টি আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত।

সূরা আল আম্বিয়া

আয়াত ১১২ রুকু ৭

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ﴿١﴾ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ

مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ

السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٣﴾ قٰلَ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ

شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٥﴾ مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ

اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْۤ اِلَيْهِمْ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মুহূর্তটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা এখনো উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে আছে, ২. যখন তাদের কাছে তাদের মালিকের কোনো নতুন উপদেশ আসে তখন (মনে হয়) তারা তা শোনছে, কিন্তু তারা (তখনও) নানারকম খেলা ধুলায় নিমগ্ন থাকে, ৩. ওদের মন থাকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী; যারা যালেম তারা গোপনে বলাবলি করে, এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তোমরা কি (তারপরও তার) যাদুর ফাঁদে ফেঁসে যাবে? অথচ তোমরা তো (সব কিছুই) দেখতে পাচ্ছো! ৪. সে বললো, আমার মালিক (প্রতিটি) কথা জানেন, তা আসমানে থাকুক কিংবা যমীনে, তিনি (সব) শোনেন, (সব) জানেন। ৫. তারা তো বরং (কোরআনের ব্যাপারে) বলে, এগুলো হচ্ছে অলীক স্বপ্নমাত্র, সে নিজেই এসব উদ্ভাবন করেছে, কিংবা সে হচ্ছে একজন কবি, সে (নবী হয়ে থাকলে আমাদের কাছে) এমন সব নিদর্শন নিয়ে আসুক, যা দিয়ে পূর্ববর্তীদের পাঠানো হয়েছিলো। ৬. এদের আগে এমন সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা (এসব নিদর্শন দেখেও) ঈমান আনেনি। (তুমি কি মনে করো) এরা (এখন) ঈমান আনবে? ৭. তোমার পূর্বে আমি মানুষকেই (সব সময় নবী বানিয়ে) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমরা যদি না জানো তাহলে (আগের)

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا
يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ
وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٩﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
اٰخَرِيْنَ ﴿١١﴾ فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا
اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَمَا
خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا
لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ

কেতাবওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। ৮. আমি তাদের এমন সব দেহাবয়ব দিয়ে পয়দা করিনি যে, তারা খেতে পারতো না, (তা ছাড়া মানুষ হওয়ার কারণে) তারা কেউ (এ দুনিয়ায়) চিরস্থায়ীও হয়নি! ৯. অতপর আমি (আযাবের) ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখালাম, (আযাব যখন এসে গেলো তখন) আমি যাদের চাইলাম শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম, আর সীমালংঘন কারীদের আমি সমূলে বিনাশ করে দিলাম।

রুকু ২

১০. (হে মানুষ,) আমি তোমাদের কাছে (এমন একটি) কেতাব নাযিল করেছি, যাতে (একে একে) তোমাদের (সবার) কথাই রয়েছে, তোমরা কি বুঝতে পারো না! ১১. আমি এর আগে কতো জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যা ছিলো (আসলেই) যালেম, তাদের পরে তাদের জায়গায় আমি অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি। ১২. এরা যখন আমার আযাব (একান্ত) সামনে দেখতে পেলো তখন সেখান থেকে পালাতে শুরু করলো। ১৩. (আমি বললাম,) তোমরা (আজ) পালিয়ো না, বরং ফিরে যাও তোমাদের সম্পদের কাছে ও তোমাদের বাড়ি ঘরের দিকে যেখানে তোমরা আরাম করছিলে, সম্ভবত তোমাদের (কিছু) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ১৪. তারা বললো, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা (সত্যিই) যালেম ছিলাম। ১৫. অতপর তারা এই আহাজারি করতেই থাকলো, যতোক্ষণ না আমি তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি তাদের কাটা ফসল ও নির্বাপিত আলোকরশ্মি বানিয়ে দিলাম। ১৬. আসমান যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু (-র কোনোটাই) আমি খেলতামাশার জন্যে পয়দা করিনি। ১৭. আমি যদি নেহায়াত কোনো খেলতামাশার বিষয়ই বানাতে চাইতাম তাহলে আমি আমার কাছে যা (নিষ্প্রাণ বস্তু) আছে তা দিয়েই (এসব

فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ⑱ وَلَهٗ مَنْ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا
يَسْتَحْسِرُوْنَ ⑲ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ⑳ اَمِ اتَّخَذُوْٓا
اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ㉑ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ㉒ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْئَلُوْنَ ㉓ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج هٰذَا ذِكْرُ
مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لا الْحَقَّ فَهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ㉔ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ
اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ㉕ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ

কিছু) বানিয়ে দিতাম। ১৮. বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুঁড়ে মারি, অতপর সে (সত্য) এ (মিথ্যা)-র মগয বের করে দেয়, (এর ফলে যা মিথ্যা) তা সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা যা কিছু উদ্ভাবন করছো (তা থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক পবিত্র)। ১৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর (মালিকানাধীন), তাঁর (একান্ত) সান্নিধ্যে যেসব (ফেরেশতা) আছে তারা কখনো তাঁর এবাদাত করতে অহংকার (বোধ) করে না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করে না, ২০. তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা কখনো কোনো অলসতা করে না। ২১. এরা কি (আল্লাহ তায়ালার বদলে) যমীনের কোনো কিছুকে মাবুদ বানিয়ে নিচ্ছে? (এরা যাদের মাবুদ বানাচ্ছে) তারা কি এদের পুনরুত্থ্যান ঘটাবে? ২২. যদি আসমান যমীনে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আরো অনেক মাবুদ থাকতো, তাহলে (কবেই যমীন আসমানের) উভয়টাই ধ্বংস হয়ে যেতো, এরা যা কিছু বলে, আরশের মালিক আল্লাহ তায়ালা সে সব কিছু থেকে পবিত্র ও মহান! ২৩. তিনি যা কিছু করেন সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, বরং তাদেরই (তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে। ২৪. এরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (অন্য কাউকে) মাবুদ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা) আমার সাথীদের কেতাব এবং (এটা) আমার পূর্ববর্তীদের কেতাব, (পারলে এখান থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো;) এদের অধিকাংশ (মানুষই প্রকৃত সত্য) জানে না, তাই (সত্য থেকে) এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৫. আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই এবাদাত

مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ
عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ

করো। ২৬. (এ মূর্খ) লোকেরা বলে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদের নিজের) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; তিনি (এসব কথাবার্তা থেকে) অনেক পবিত্র; বরং তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত বান্দা, ২৭. তারা (কখনো) তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। ২৮. তাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা আল্লাহ তায়ালার সমীপে সেসব লোক ছাড়া অন্য কারো জন্যেই সুপারিশ করে না যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট রয়েছেন, তারা (নিজেরাও সব সময়) তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত (থাকে)। ২৯. (যারা অহংকারী) তাদের মধ্যে যদি কেউ একথা বলে, আল্লাহ তায়ালার বদলে আমিই হচ্ছি মাবুদ, তাহলে তাকে আমি এ জন্যে জাহান্নামের (কঠিন) শাস্তি দেবো; (মূলত) আমি যালেমদের এভাবেই শাস্তি দেই।

রুকু ৩

৩০. এরা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এসব জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না? ৩১. আমি যমীনের ওপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেন তা ওদের নিয়ে (এদিক সেদিক) নড়াচড়া করতে না পারে, এ ছাড়াও আমি ওতে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করে দিয়েছি যাতে করে তারা (তা দিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে) পৌছুতে পারে। ৩২. আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে তৈরী করেছি, কিন্তু এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা তার নিদর্শনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. আল্লাহ তায়ালাই রাত, দিন, সুরুজ ও চাঁদকে পয়দা করেছেন; (এদের) প্রত্যেকেই (মহাকাশের) কক্ষপথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে। ৩৪. (হে নবী,) আমি

أَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ

بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

তোমার পূর্বেও কোনো মানব সন্তানকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আজ তুমি মরে গেলে (তুমি কি মনে করো) তারা এখানে চিরজীবী হয়ে থাকবে? ৩৫. প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ,) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি; অতপর (তোমাদের তো) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটা মক্কী। অন্যান্য মক্কী সূরার মতোই এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত।

এই আকীদাগত বিষয়গুলো এ সূরায় প্রাকৃতিক জগতের বড়ো বড়ো নিয়ম ও উপাদানের বিবরণ দানের মাধ্যমে এবং আকীদা বিশ্বাসকে তার সাথে সংযুক্ত করণের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত আকীদা বিশ্বাস মহাবিশ্বের সৃষ্টিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা তার প্রধান প্রধান নিয়ম ও উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এইসব নিয়ম ও উপাদান সেই মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার ওপর আকাশ ও পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, যার ভিত্তিতে আকাশ ও পৃথিবী পরিচালিত। এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম ও উপাদান এবং এই মহাবিশ্ব মোটেই উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহীন নয়, নয় তা নেহাত লীলাখেলা। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা দোখানে বলেছেন, 'আমি আকাশ ও পৃথিবীকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।'

এ জন্যে সূরাটা মানুষের হৃদয়, দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে মহাবিশ্বের কয়েকটা জোড়া জোড়া অংশ যথা আকাশ ও পৃথিবী, পাহাড় ও সমতল, দিন ও রাত এবং সূর্য ও চন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এইসব সৃষ্টিকে পরিচালনা ও শাসনকারী প্রাকৃতিক বিধানের একত্বের দিকে। এই প্রাকৃতিক বিধানের একত্ব দ্বারা যে প্রাকৃতিক জগত তথা সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতির একত্বই প্রমাণিত হয় সে বিষয়ের দিকেও তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এ কথাও উপলব্ধি করার আবেদন জানানো হয়েছে যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে যেমন অন্য কেউ আল্লাহর সাথে শরীক ছিলো না, তেমনি তার মালিকানায়, আধিপত্যে ও কর্তৃত্বেও কেউ তার অংশীদার নেই। বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য প্রভুও থাকতো, তাহলে সে দুটোই ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এরপর মানুষের বিবেককে এ কথা উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রাণীজগত একই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত ও শাসিত এবং সমুদয় প্রাণীর জীবন একই উৎস থেকে উৎসারিত। বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকটি প্রাণীকে আমি পানি থেকে তৈরী করেছি।' এমনকি সমুদয় প্রাণীর জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটে একইভাবে, 'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেই' এবং মৃত্যুর পরে সবাই একই গন্তব্যের দিকে ফিরে যাবে। 'অতপর তোমরা আমার দিকেই ফিরে আসবে।'

তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত মৌল আকীদা সেসব প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান ও নিয়মের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই আকীদাও চিরদিন এক ও অভিন্ন, যদিও যুগে যুগে বহু নবী ও রসূল দুনিয়ায় এসেছেন,

'আমি তোমার পূর্বে যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, তার কাছে এই ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাই তোমরা একমাত্র আমারই এবাদাত করো।'

রসূলরা সবাই মানুষের মধ্য থেকেই জন্ম নিক, এটাই আল্লাহর শাশ্বত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমার পূর্বে আমি শুধু কিছু মানুষকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।'

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস যেমন মহাবিশ্বের বড়ো বড়ো নিয়ম কানুন ও উপাদানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, এই আকীদা বিশ্বাসের পার্থিব বৈশিষ্ট্যগুলোও তেমনি। তাই বিশ্ব প্রকৃতির চিরন্তন রীতি হলো, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বে সত্যই বিজয়ী এবং বাতিল পরাজিত হবে। সত্য হচ্ছে মহাবিশ্বের অন্যতম স্তম্ভ এবং তার বিজয় আল্লাহর শাশ্বত নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বরং আমি সত্যকে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা বাতিলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে যায়।'

অনুরূপ, অত্যাচারী ও মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস এবং রসূল ও মোমেনদের মুক্তি লাভও আল্লাহর এক চিরন্তন নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছি, তাদেরকে ও অন্য যাদেরকে ইচ্ছা করেছি, মুক্তি দিয়েছি এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করেছি।'

পৃথিবীটা আল্লাহর সৎ লোকদের অধিকারভুক্ত থাকুক এটাও আল্লাহর অন্যতম নীতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎ বান্দারাই পৃথিবীর মালিক হবে।'

এ জন্যে এই সূরায় সকল রসূলের উম্মাতদেরকে একই উম্মাত গণ্য করে তাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনা সূরার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থান করছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সংক্রান্ত আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ, সোলায়মান, নূহ, মূসা, হারুন, লূত, ইসমাঈল, ইদ্রীস, যুলকিফল, যুনুন, যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অত্যন্ত সংক্ষেপে।

এ আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরার শুরুতে আলোচিত তত্ত্বসমূহকে বাস্তব ঘটনার আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে যা সাধারণ নীতিমালা ও আদর্শের আকারে বিবৃত হয়েছে, পরবর্তীতে তা নবীদের জীবন ও আন্দোলনের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বাস্তবতার রূপ নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূরায় কেয়ামতের কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এসব দৃশ্যের মধ্য দিয়েও সে সব তত্ত্ব ও নীতিমালা কেয়ামতের বাস্তবতার আকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এভাবে সূরার বিভিন্ন দৃশ্য একই লক্ষ্যের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সেই লক্ষ্য হলো মানুষের মনকে সেই মহাসত্য উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা, যা শেষনবী (স.) এর আনীত আকীদা ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে মানুষ সেই মহাসত্য সম্পর্কে উদাসীন ও বিমুখ থাকতে পারবে না। এই মহাসত্য সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা ও বিমুখতার বিষয়টি সূরার প্রথম তিন আয়াত জুড়ে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা তা থেকে উদাসীন ও বিমুখ রয়েছে।' .... (১-৩)

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর এই সৃষ্টিজগত যেমন সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা, নবী ও রসূলদের আনীত বাণী ও দাওয়াতও তেমনি সত্য ও গুরুগম্ভীর বাস্তবতা। কাজেই তা ঠাট্টা ও উপহাস করে যেমন উড়িয়ে দেয়া চলে না। তেমনি তার সমর্থনে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে

চাওয়াও সমীচীন নয়। গোটা বিশ্ব নিখিলে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যখন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই সমুদয় সৃষ্টির তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, একমাত্র সর্বশক্তিমান সত্ত্বা এবং নবীর আনীত বাণী ও বার্তা সেই অসীম শক্তিধর একক স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছে, তখন এর প্রমাণ হিসেবে আর কোনো অলৌকিক ঘটনার দাবী সংগত নয়।

শব্দ ও সুরের দিক দিয়ে এ সূরার সার্বিক কাঠামো প্রতিবেদনমূলক এবং তার আলোচ্য বিষয় ও পূর্বাপর পটভূমির সাথে তার পূর্ণ সমন্বয় বিদ্যমান। সূরা মারইয়াম ও সূরা ত্বা-হার সাথে এ সূরার তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে দুটো সূরার সুর অত্যন্ত উদার ও বিনীত এবং সূরা দুটোর সার্বিক পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ সূরার সুর গম্ভীর, স্থিতিশীল এবং সূরার আলোচ্য বিষয়ও পটভূমির সাথে সংগতিশীল।

এই পার্থক্যটা তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সূরা মারিয়ামে ও আলোচ্য সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনাধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। সূরা মারইয়ামের হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার পিতার মধ্যে উদার ও বিনীত কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সূরায় যে কথোপকথন হয়েছে, তা মূর্তিভাংগা ও ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপের মতো চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এভাবে উভয় জায়গাতেই সূরার বর্ণনাভংগী শাব্দিক কাঠামো, পটভূমি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

সূরা আম্বিয়ায় চারটি পর্ব বা অধ্যায় দেখা যায়ঃ প্রথম পর্বটা শুরু হয়েছে বিবেককে জোরদার আঘাত করে জাগিয়ে তোলা ও মন মগযকে প্রচন্ড ধাক্কা ও ঝাঁকুনী দিয়ে ভুলে যাওয়া আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচকিত করার মধ্য দিয়ে। এর প্রথম আয়াত হলো

'মানুষের হিসেব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে আসছে, অথচ তারা উদাসীন ও বিমুখ.....'

অতপর অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য বর্ণনাপূর্বক আরো একটা ধাক্কা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন এবং বিভ্রান্তি ও অপরাধে নিমজ্জিত ছিলো।

'কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা যুলুম অত্যাচারে ডুবেছিলো, ...'। (আয়াত ১১-১৫)

এরপর দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে এবং প্রাকৃতিক বিধি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তবতার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। আরো যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে তাওহীদী আকীদা ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও বিধাতার একত্ব এবং সকল নবী ও রসূলের প্রচারিত আকীদা ও বিধানের অভিন্নতার মধ্যে, জীবনের আরম্ভ ও অবসান এবং উৎস ও পরিণতির অভিন্নতার মধ্যে।

দ্বিতীয় পর্বটায় রসূল (স.)-এর সাথে ব্যাংগ বিদ্রূপকারী কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, এমন অকাট্য সত্য ও গুরুতর বাস্তবতাকে উপহাস করা তোমাদের উচিত নয়। তাদের চারদিকে বিরাজমান গোটা পরিবেশ যখন সচেতন ও সচকিত হবার আহ্বান জানাচ্ছে তখন তা নিয়ে তামাশা করা এবং আযাব যখন আসন্ন, তখন আযাব পাঠানোর জন্যে তাড়াহুড়ো করা খুবই অন্যায় ও অসংগত। এখানে কেয়ামতের একটা দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। অতীতে যারা নবীদেরকে ব্যাংগ বিদ্রূপ করতো, তাদের পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ কোথাও নেই। মহান আল্লাহর অসীম শক্তিশালী হাত কিভাবে পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিজনিত উদাসীনতা থেকে সতর্ক ও সচেতন করা যায়।

এ পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে রসূল (স.)-কে তাঁর আসল কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করার মধ্য দিয়ে। যথা, 'বলো, আমি তো শুধু ওহী দ্বারা তোমাদেরকে সতর্ক করছি।' তাদের উদাসীনতার অশুভ পরিমাণ সম্পর্কে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে এই বলে, 'বধিররা কোনো সতর্কবাণী শুনতে পায় না।' আরো বলা হয়েছে যে, তারা উদাসীন থাকতে থাকতে একদিন কেয়ামত এসে পড়বে এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় পর্বে রয়েছে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের পর্যালোচনা। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে যে তায়ালা, সকল নবীর একই দাওয়াত, একই আকীদা বিশ্বাস ও একই ধর্ম ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার সৎ বান্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেন এবং কাফেরদেরকে পাকড়াও করেন।

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্বে আলোচিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত প্রসংগ। সূরার শেষের কথাগুলো প্রথম দিককার কথাগুলোর মতো জোরদার সতর্কীকরণমূলক।

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও যারা উদাসীন

এবার আমরা প্রথম পর্ব নিয়ে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। 'মানুষের হিসেব নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে .... (আয়াত ১-৯)

অলস ও উদাসীন লোকদেরকে এখানে একটা প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে সচকিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হিসাব নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীন। তাদের সামনে নিদর্শনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। অথচ তারা হেদায়াত বিমুখ। পরিস্থিতি গুরুতর, অথচ তারা সে সম্পর্কে অচেতন। যখনই কোরআনের একটা নতুন আয়াত নাযিল হয়, অমনি তারা তার প্রতি বিদ্রূপ করে। বলা হয়েছে, 'তাদের হৃদয় উপহাসকারী।' অথচ হৃদয় হলো চিন্তা, গবেষণা ও বিবেচনার স্থান।

এখানে এমন এক ধরনের মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যারা কোনো গুরুতর অবস্থাকেই গুরুতর মনে করে না, বরং গুরুতর অবস্থাকেও তারা হাসি তামাশার বিষয় গন্য করে এবং অতি পবিত্র ক্ষেত্রেও ধৃষ্টতাপূর্ণ ও বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ করা হয়। তাদের কাছে ওহী যোগে যে বাণী আসে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা সত্ত্বেও তাকে মস্করার বিষয়ে পরিণত করে। তার প্রতি কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। যারা সব কিছুকেই অবহেলার যোগ্য ভাবতে পারে, কোনো কিছুর প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে না, কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না, তারা নিজেরাই এক সময় গুরুত্বহীন ও মর্যাদাহীন হয়ে পতন ও বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়। মানবজীবনে তারা কোনো মতে পতন ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেলেও কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হয় না এবং তাদের জীবন হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, স্থবির, মর্যাদাহীন ও মূল্যহীন।

পবিত্র ও মহিমান্বিত জিনিসগুলোকে যারা অবহেলা ও তামাশার যোগ্য মনে করে, তারা এক ধরনের মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। অবহেলা ও তামাশা হচ্ছে উদারতা ও সহনশীলতার পরিপন্থী। যাদের উদারতা ও সহিষ্ণুতা আছে, তারা দৃঢ়চেতা ও তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। আর যারা অবহেলা প্রবণ, তারা অনুভূতিহীন ও উদাসীন।

পবিত্র কোরআন এখানে যাদের বিবরণ দিয়েছে, তারা কোরআনের বিরোধিতা করতো এ জন্যে যে, কোরআন একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, একটা পরিপূর্ণ আইন ও সংবিধান এবং পারস্পরিক আদান প্রদান ও আচার ব্যবহারের একটা পূর্ণাংগ বিধান। তারা ব্যংগ বিদ্রূপ ও হাসি তামাশার মাধ্যমে কোরআনকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতো। তারা কেয়ামতের জবাবদিহিতার

বিষয়টাকেও উদাসীনতার মাধ্যমে অগ্রাহ্য করতো। এ ধরনের মানুষ সবযুগেই পাওয়া যায়। গুরুত্ববোধ, মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ যাদের ভেতরে নেই, তারা সেইসব বিকারগ্রস্ত রোগীর পর্যয়েই উপনীত হয়। যাদের চিত্র কোরআন এখানে তুলে ধরেছে। এই বদস্বভাব মানুষের গোটা জীবনকেই একটা অসার পরিহাসে পরিণত করে দেয়, যার কোনো উদ্দেশ্যও নেই এবং যার কোনো মূল্যও নেই।

অথচ প্রকৃত মোমেনদের অবস্থা হলো যে, এ সূরা তাদের মনকে দুনিয়ার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ ও নিরাসক্ত করে তোলে। এ প্রসংগে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাচ্ছে,

আমাদীর রচিত হযরত আমের বিন রবীয়ার জীবন চরিতে আছে যে, একবার তার কাছে জনৈক মেহমান এসেছিলো। তিনি সে মেহমানকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন। এতে সে এতো অভিভূত হয় যে, পরবর্তীতে সে একটা ভূ-সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর পুনরায় তার কাছে আসে এবং তাকে বলে, আমি রসূলুল্লাহর কাছ থেকে একটা ভূ-সম্পত্তি লাভ করেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সে সম্পত্তির একটা অংশ তোমাকে দেবো, যা দ্বারা তোমার ও তোমার বংশধরের উপকার হবে। আমের বললেন, তোমার যমীন দিয়ে আমার কাজ নেই। আজ এমন একটা সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমাদেরকে দুনিয়া সম্পর্কে নিরাসক্ত করে দিয়েছে। সূরাটার শুরুতেই বলা হয়েছে, 'মানুষের হিসাব নিকাশ ঘনিয়ে এসেছে। অথচ তারা তা থেকে উদাসীন ও বিমুখ রয়েছে।'

এই হলো জীবন্ত মুক্ত ও সচেতন এবং নির্জীব, একগুঁয়ে ও অবরুদ্ধ মনের পার্থক্য। নির্জীব ও একগুয়ে মন তার নির্জীবতাকে লুকানোর জন্যে ঠাট্টা বিদ্রূপের আশ্রয় নেয় এবং তার অকর্মন্যতাকে লুকানোর জন্যে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে। এ ধরনের মনকে ওহীর বাণী দ্বারা প্রভাবিত করা যায় না। কেননা তার মধ্যে আর কোনো জীবনী শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

'যারা অপরাধীদের সাথে গোপন সলাপরামর্শ করে'..... ইতিপূর্বে কাফেররা নিজেদের মধ্যেই গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শ করতো। তারা রসূল (স.) সম্পর্কে বলতো, 'এই ব্যক্তি কি তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু? তোমরা কি দেখে শুনেও যাদুর কাছে আসো?'

মৃত ও জীবনী শক্তি থেকে বঞ্চিত মন নিয়ে এই কোরআনের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদের বুক দুরু দুরু করে কাঁপতো। তাই কোরআনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের প্রতিরোধ করার জন্যে তারা নানা ছলচাতুরি ও তালবাহানার আশ্রয় নিতো। তারা বলতো, মোহাম্মদ তো অন্য দশজন মানুষের মতোই মানুষ। তোমরা নিজেদের মতোই একজন মানুষকে কিভাবে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারো? সে যা কিছু নিয়ে এসেছে, তাতো যাদু ছাড়া কিছু নয়। তোমাদের চোখ থাকতে যাদুমন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত ও যাদুর অনুগত হও কিভাবে?

এই পর্যায়ে রসূল (স.) তাঁর নিজের কাজ ও বিরোধীদের অশুভ তৎরতার ব্যাপারটাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন এবং যে ফন্দি ফিকির দিয়ে তারা কোরআনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার অপচেষ্টা চালায়, তা রসূল (স.)-কে জানান।

'সে বললো, আমার প্রতিপালক আকাশ ও পৃথিবীতে যে কথাই বলা হয় তা জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা।'

অর্থাৎ তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর যেখানে যা বলা হয় তা জানেন, তখন পৃথিবীর কোনো জায়গায় বসে যে গোপন সলা-পরামর্শ করা ষড়যন্ত্র আঁটা হয়, তা তিনি অবহিত হন এবং স্বীয় রসূলকে তা অবহিত করেন। তিনি তো সব কিছুই জানেন ও শোনেন।

তারা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলো যে, কোরআনকে কেননা নামে আখ্যায়িত করবে এবং কিভাবে তা থেকে রেহাই পাবে। কখনো তারা বলতো, ওটা যাদুমন্ত্র। কখনো বলতো, ওসব হচ্ছে মোহাম্মদের দেখা রকমারি স্বপ্নের জগাখিচুড়ি বর্ণনা। আবার কখনো বলতো, ও হচ্ছে কবিতা। আবার কখনো বলতো, মোহাম্মদ (স.) নিজেই ওসব তৈরী করেছে আর দাবী করেছে যে, এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হওয়া ওহী।

'ওরা বরং বলেছে যে, রকমারি বাজে স্বপ্ন, না বরং ওর মনগড়া কথা। বরং সে একজন কবি।'

এর কোনো একটা কথার ওপরও তারা স্থির থাকেনি। কোনো একটা মতের ওপরও তারা দৃঢ়তা দেখায়নি। কেননা তারা কেবল ওযর বাহানা ও ছল-ছুঁতো খুঁজেছে, যাতে তাদের মনের ওপর থেকে কোরআনের প্রভাবকে নানা কৌশলে ফেরাতে পারে। কিন্তু তা তারা পারেনি। তাই তারা এখন এক দাবী এবং তখন এক দাবী করতো। এখন এক ছুঁতো, তখন এক ছুঁতো দেখাতো। কোনো বক্তব্যের ওপরই স্থীর থাকতো না, সব সময় অস্থির ও দিশেহারা থাকতো। তারপর এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কোরআনের পরিবর্তে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সামনে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটতো। সেগুলোর ঘটানো দাবী জানাতো।

'সুতরাং মোহাম্মাদ (স.)-এর উচিত পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতো আমাদের কাছেও কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা।'

অলৌকিক ঘটনাবলী ইতিপূর্বেও এসেছে। কিন্তু যাদের কাছে এসেছে, তারা ঈমান আনেনি। ফলে তাদের ওপর ধ্বংস নেমে এসেছে। অলৌকিক ঘটনাকে যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহর নীতি। এই নীতি অনুসারেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে,

'তাদের পূর্বে যেসব নগরকে আমি ধ্বংস করেছি, তারা ঈমান আনেনি।

কারণ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা ও অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায় এমন অলৌকিক ঘটনায়ও যে বিশ্বাস করে না, তার আর কোনো ওযর-বাহানা গ্রহণযোগ্য থাকে না এবং তার সংশোধনের আর কোনো আশাও অবশিষ্ট থাকে না। তাই তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়ে যায়।

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা বহুবার ঘটানো হয়েছে, বহুবার তাকে অবিশ্বাসও করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসকারীদেরকে ধ্বংসও করা হয়েছে বহুবার। এখন মক্কার যেসব মোশরেক আবার ওই সব অলৌকিক ঘটনার দাবী জানাচ্ছে, তা যদি তাদের সামনে পুনরায় ঘটানোও হয়, তবে তারা যে ঈমান আনবে, তার কী নিশ্চয়তা আছে? তারাও তো আগেকার ধ্বংসপ্রাপ্তদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।

'তারা কি ঈমান আনবে।'

মানব জাতির মাঝ থেকে রসূল নির্বাচনের কারণ

'আমি তোমার পূর্বে মানুষের মাধ্যমেই তাদের কাছে ওহী নাযিল করতাম। তোমরা যদি এসব না জানো, তবে যাদের ঐশী গ্রন্থ আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো। আমি তাদের দেহকে এমনভাবে বানাইনি যে, তারা পানাহার করবে না। তারা চিরঞ্জীবও ছিলো না।

বস্তুত আল্লাহর নিয়ম এটাই ছিলো যে, রসূলরা মানুষের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন এবং ওহী পাওয়া মাত্রই মানুষকে তার দিকে দাওয়াত দেবেন। পূর্ববর্তী নবীরাও দেহধারী মানুষ হতেন। আর দেহধারীরূপে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পানাহারেরও মুখাপেক্ষী করেছেন।

ফলে তারা খাওয়া দাওয়া না করে পারতেন না। খাওয়া দাওয়া দেহের অনিবার্য দাবী। আর এ ধরনের দেহধারী হওয়া মনুষত্বেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে সৃষ্ট মানুষ হিসেবে তারা চিরঞ্জীবও নন। এটাই আল্লাহর শাশ্বত রীতি ও প্রথা। এ সত্য যদি মোশরেকদের অজানা থেকে থাকে, তাহলে কেতাবধারী-ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা তাদের কর্তব্য। কেননা সে দুই জাতি পূর্বতন নবীদের বিষয়ে জানতো। নবীদেরকে মানুষের মধ্য থেকেই পাঠানো হতো। এর উদ্দেশ্য ছিলো তারা যেন মানুষের মতো জীবন যাপন করে। তাদের বাস্তব জীবনই হতো তাদের জন্যে শরীয়তের বিধান। তাদের সামাজিক জীবন হতো তারা মানুষকে যে জীবন ব্যবস্থার দিকে ডাকতো, তার বাস্তব নমুনা। জীবন্ত ও বাস্তব উপদেশই মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সুপথে চালিত করে। কেননা জনগণ তাকে একজন মানুষের জীবনে জীবন্তভাবে মূর্ত ও বাস্তবায়িত দেখতে পায়।

নবী ও রসূলরা যদি মানুষ না হতেন, তারা যদি খাবার না খেতেন, হাট বাজারে না যেতেন এবং নারীদের সাহচর্যে জীবন যাপন না করতেন, তাহলে তাদের হৃদয়ে মানুষ সুলভ আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি হতো না এবং তাদের ও সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো সম্পর্কও গড়ে উঠতো না। এর ফল দাঁড়াতো যে, নবীরা এমনে কোনো মানবীয় আবেগ উদ্দীপনা অনুভবই করতেন না, যা তাদেরকে উদ্দীপিত ও পরিচালিত করতে পারে। আর সে কারণে জনগণও তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারতো না।

যিনি জনগণকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তিনি যদি জনগণের ইচ্ছা ও আবেগ অনুভব না করেন এবং জনগণও যদি তার ইচ্ছা ও আবেগ অনুভব না করে, তাহলে তিনি জনগণের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে বাধ্য হবেন। তিনিও জনগণের ইচ্ছা আকাংখায় সাড়া দেন না। আর জনগণও তাদের তাকে সাড়া দেয় না। জনগণ তাঁর কোনো কথা শুনলেও তদানুসারে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। কেননা তাদের ও তার মাঝে আবেগ ও অনুভূতির কোনো সংযোগ থাকে না। অনুরূপ, যিনি ইসলামের দাওয়াত দেন, তার কথা ও কাজে যদি মিল না থাকে, তাহলে তার কথা শ্রোতার কানের দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়, হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না, তা সে কথা যতোই বিজ্ঞসুলভ ও অলংকারসমৃদ্ধ হোক না কেন। পক্ষান্তরে একেবারে সরল সহজ কথাও যদি আবেগ ও দরদ সহকারে বলা হয় বক্তার কাজ তার কথাকে সমর্থন করে, তাহলে সেই কথাই সবচেয়ে ফল প্রসূ হয়ে থাকে এবং অন্যদেরকেও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

যারা এক সময় দাবী জানাতো যে, নবী ও রসূল ফেরেশতাদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত এবং আজকাল যারা বলে যে, নবী ও রসূলের মানুষ সুলভ আবেগ অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকা উচিত-এই উভয় শ্রেণীর লোকেরাই নিছক গোয়ার্তুমির পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা এই সত্য সম্পর্কে উদাসীন যে, ফেরেশতারা তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষের মতো জীবন যাপন করে না এবং করতে পারেও না। অনুরূপভাবে দেহের দাবী ও চাহিদা কী এবং বিশিষ্ট মানুষের আবেগ-অনুভূতি কেমন তাও ফেরেশতাদের অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অথচ যিনি নবী বা রসূল হবেন, তার পক্ষে এইসব আবেগ অনুভূতি ও চাহিদা অনুধাবন করা একান্ত জরুরী। তার বাস্তব জীবনে সেসব আবেগ অনুভূতি ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটাও আবশ্যক-যাতে তিনি তার অনুসারী জনগণের বাস্তব জীবনের অনুসরণীয় নীতিমালাকে নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

এখানে আরো একটা বিষয় বুঝে নেয়া দরকার, মানুষ যদি জানতে পারে যে, রসূল তার মতো কোনো মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা, তাহলে সে যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে তার অনুকরণ ও

অনুসরণে আগ্রহী হবে না। কেননা তিনি ভিন্ন জাতের ও ভিন্ন স্বভাবের ব্যক্তিত্ব। তাই তার দৈনন্দিন জীবনে নবীর তরিকা ও পদ্ধতির আনুগত্য করার আগ্রহ তার থাকা সম্ভব নয়। অথচ নবীর জীবন হচ্ছে অন্য মানুষের জন্যে একটা উদ্বুদ্ধকারী মডেল বা আদর্শ।

যারা নবীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মতামত পোষণ করে থাকেন, তারা এই সত্যও ভুলে গেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্য থেকে রসূল পাঠানোর ব্যবস্থা করে মানব জাতিকে কিরূপ সম্মানিত করেছেন, যাতে তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং তাদের কাছ থেকে ওহী গ্রহণ করতে পারেন।

এসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করেছেন যে, মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসূল মনোনীত করবেন। তাদেরকে মানুষের মতোই জন্ম ও মৃত্যুর বিধানের আওতাভুক্ত করবেন। তাদেরই মতো আবেগ অনুভূতির অধিকারী করবেন। তাদেরই মতো সুখ-দুঃখ ও আশা আকাংখার অংশীদার করবেন এবং তাদেরই মতো আহার বিহার ও নারী সংসর্গের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করবেন। আর সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে পূর্ণাংগ ও সর্বশেষ নবী যার নবুওত কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী, তাঁকে বানিয়েছেন পৃথিবীতে মানব জাতির জন্যে সবচেয়ে পূর্ণাংগ আদর্শ, যদিও তিনি ছিলেন মনুষ্য সুলভ যাবতীয় জৈবিক বৈশিষ্ট্য, দাবী, চাহিদা, ও আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন।

এ হচ্ছে নবী ও রসূল মনোনয়নে আল্লাহর শাশ্বত নীতি। অনুরূপভাবে নবী-রসূলদেরকে ও তার অনুসারীদেরকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারী, মিথ্যুক সাব্যস্তকারী ও সীমালংঘনকারী সবাইকে ধ্বংস করাও আল্লাহর চিরন্তন নীতি।

'তারপর আমি তাদের সাথে করা ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছি, তাদেরকে ও অন্য যাদেরকে ইচ্ছা করেছি রক্ষা করেছি এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

বস্তুত নবী রসূলদের নিয়োগের মতো এটাও একটা শাশ্বত নীতি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ও তাদের সেই সব মোমেন সাথীদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন, যারা যথার্থ ও সত্যিকার ঈমানদার এবং যাদের বাস্তব কাজ তাদের ঈমানের অনুরূপ। আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে করা ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই নীতির ঘোষণা দিয়ে সেই সব মোশরেককে সতর্ক করেছেন, যারা রসূল (স.) ও মোমেনদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে, নির্যাতন করে এবং তাদের সাথে আচরণে সীমালংঘন করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই বলে হুশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, রসূল (স.) তাদের জন্যে রহমতস্বরূপ। তাকে কোনো বস্তুগত অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে পাঠাননি, যাতে তা প্রত্যাখ্যান করলে তাদেরকে পূর্ববর্তীদেরকে সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতে না হয়। তাকে শুধু এমন একখানা কেতাব দেয়া হয়েছে– যা তাদেরকে সম্মানিত করে। কেননা সেই কেতাব তাদেরই ভাষায় নাযিল হয়েছে, তাদের জীবনকে তা সুগঠিত ও পরিশীলিত করে, তাদের মধ্য থেকে এমন একটা উম্মাত গড়ে তোলে, যা বিশ্ব নেতৃত্বের অধিকারী এবং যা সমগ্র মানব জাতির কাছে একটা উল্লেখযোগ্য উম্মাত। আর এই কেতাব মানুষের বিবেকবুদ্ধির আয়ত্তাধীন। তা নিয়ে সে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত হতে পারে।

কোরআনই আরবজাতির উত্থান ঘটিয়েছে

'নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এমন এক কেতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে কি তোমরা বুঝবে না?

কোরআন এমন একটা মোজেযা, এমন একটা অলৌকিক নিদর্শন, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অবধি সমগ্র মানব জাতির জন্যে উন্মুক্ত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক নিদর্শনের মতো নয়, যা

একই প্রজন্মে শেষ হয়ে যায় এবং সে প্রজন্মের যারা তা দেখে, তারা ছাড়া আর কেউ তা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

বস্তুত এই কোরআন দ্বারাই বিশ্বের দিকে দিকে আরবদের সম্মান ও সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে যখন তারা তাকে বহন করে সমগ্র প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে আরবদের কোথাও কোনো উল্লেখ ছিলো না, মানব জাতিকে দেয়ার মতো কোনো অবদানও তাদের ছিলো না, যা তাদের পরিচিতি ও সুনাম সুখ্যাতির বিস্তার ঘটাতে পারে। এই কেতাবকে যতোদিন তারা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো, ততোদিন মানব জাতি তাদেরকে স্মরণ করেছে ও সম্মান করেছে। মানবজাতিকে তারা বহু শতাব্দী যাবত নেতৃত্ব দিয়েছে। এ কেতাব যতোদিন তাদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে, ততোদিন তাদের ও বিশ্ববাসীর জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির ঢল নেমেছে। কিন্তু যখনই তারা কোরআনকে ত্যাগ করেছে, বিশ্ববাসীও তাদেরকে বর্জন করেছে, তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি উধাও হয়ে গেছে, তারা অন্যান্য জাতির অত্যাচারের শিকার হয়েছে। অথচ যখন তারা এই কেতাবের অনুসরণ করতো, তখন বিশ্বের অনান্য জাতি নির্যাতিত হতো, আর মুসলমানরা থাকতো নিরাপদ।

আরবদের কাছে এই কোরআন ছাড়া বিশ্ববাসীকে দেয়ার মতো আর কোনো সম্পদ নেই। আজ তারা যদি বিশ্ববাসীকে এই সম্পদটা দিতে পারে, তবে পুনরায় তাদের পরিচিতি, সুনাম বিস্তার লাভ করবে। কেননা বিশ্ব এতে এমন জিনিস পাবে, যা তার জন্যে উপকারী ও কল্যাণকর। কিন্তু তারা যদি বিশ্ববাসীকে কেবল আরব জাতীয়তা উপহার দিতে চায়। তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ জিনিসটার কোনোই মূল্য নেই। এই কেতাব ছাড়া আরব জাতীয়তা মূল্যহীন। বিশ্ববাসী আরবদেরকে যদি চিনে থাকে, তবে তাদের এই কেতাব, এই আকীদা বিশ্বাস এবং এই কেতাব থেকে আহরিত আদর্শ জীবন ব্যবস্থার জন্যেই চিনেছে। নিছক আরব হিসেবে তাদেরকে চেনেনি। কেননা মানবেতিহাসে এর কোনোই গুরুত্ব নেই। সভ্যতার অভিধানে এই জিনিসটা অর্থহীন। আরবরা ইসলামী সভ্যতা ও তার চিন্তাধারার বিস্তার ঘটিয়ে বিশ্বময় পরিচিতি ও সুনাম কুড়িয়েছে। এ জিনিসটা এমন যে, মানবেতিহাসে ও সভ্যতার অভিধানে এর অর্থ আছে। আলোচ্য আয়াতটিতে (আমি তোমাদের কাছে একখানা কেতাব পাঠিয়েছি ....') কোরআন এ দিকেই ইংগিত করেছে। প্রত্যেক নতুন জিনিসকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে, উদাসীনতা উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও উপহাসের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে অভ্যস্ত মোশরেকদেরকে সম্বোধন করে সে একথা বলেছে।

আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনকে আরবদের মধ্যে নাযিল করেছেন, এটাও তাদের জন্যে একটা করুণা স্বরূপ। তাদের কাছে তাদের চাহিদা মোতাবেক কোনো বস্তুগত মোজেযা নাযিল না করে তাদের ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। নচেত পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মতোই দশা হতো তাদেরও– যারা মোজেযাকে অস্বীকার করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কতো জনপদকে, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী ছিলো .... ।' (আয়াত ১১-১৫)

এখানে যে 'কাস্‌ম' শব্দটা ব্যবহার হয়েছে, তা ধ্বংসের ভয়াবহতম রূপকে ফুটিয়ে তোলে। 'কাসম' জড় ও জীবসহ যাবতীয় জিনিসকে সর্বতোভাবে ধ্বংস করা বুঝায়। আর 'ইনশা' বুঝায়, শুধু গঠনকামী ও পুনরুত্থানকামী লোকদের গঠনমূলক কাজকে। ধ্বংসযজ্ঞ যখন ঘটে, তখন তা নগর ও নগরবাসী উভয়কেই ধ্বংস করে। কিন্তু 'গঠন' কাজটা অধিবাসীদেরকে দিয়েই শুরু হয়

এবং তারা গৃহ নির্মাণ পুনরারম্ভ করে। তবে বিষয়টা এখানে যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা ধ্বংসযজ্ঞকে অধিকতর ভয়াবহ আকারে প্রতিফলিত করে। আর কোরআনের চিরাচিরিত শৈল্পিক বর্ণনাভংগী অনুসারে এই বিশেষ ভাবটা বোঝানোই এখানে উদ্দেশ্য।

এরপর আমরা দৃষ্টি দেব আল্লাহর আযাবে নিপতিত সেইসব জনপদের দিকে। আযাব এসে যাওয়ার পরপুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আগে সে জনপদের অধিবাসীরা ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করছিলো।

'যখন তারা আমার আযাব টের পেলো, অমনি তারা সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগলো।' (আয়াত ১২)

অর্থাৎ তারা যখন বুঝতে পেরেছে যে, তারা আল্লাহর আযাবের কবলে পড়তে যাচ্ছে, তখন তারা ছুটাছুটি করো, জনপদ থেকে পালাতে লাগলো। তারা ভেবেছিলো যে, ছুটে পালালে আযাব থেকে বাঁচা যাবে। তারা এতো জোরে দৌড়াবে যে, আযাব তাদেরকে ধরতেই পারবে না। অথচ আসলে দৌড়াদৌড়ি খাঁচার ভেতরে ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ির মতো, যার পেছনে কোনো চিন্তা ও বিচার বিবেচনা নেই।

এই পর্যায়ে তারা শুনতে পায় অত্যন্ত রুঢ় ভাষায় উচ্চারিত পরিহাস।

'পালিয়োনা, বরং যে স্থানে তোমরা বাড়াবাড়ি করেছিলে সেখানে ও তোমাদের বাসস্থানেই ফিরে যাও, হয়তো তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।' (আয়াত ১৩)

অর্থাৎ তোমাদের জনপদ থেকে চলে যেয়ো না, বরং তোমাদের সুখময় ও আনন্দময় বাসস্থানে ফিরে যাও। হয়তো তোমাদেরকে সে সব জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কিভাবে ওগুলোকে কাজে লাগিয়েছো।

প্রকৃত পক্ষে সেখানে কোনো প্রশ্নোত্তরের অবকাশ ছিলো না। এটা ছিলো নিছক এক নির্মম পরিহাস!

এই সময় তাদের হুঁশ ফিরে আসে এবং তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর আযাব থেকে পালানোরও পথ নেই। এ আযাব তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কোনো ছুটোছুটিতে লাভ হবে না। পালিয়ে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তাই তারা তাওবা ও ইসতেগফারের চেষ্টা করবে।

'তারা বললো, হায়! পোড়া কপাল! আমরা তো যুলুম করে ফেলেছি।'

কিন্তু তখন আর সময় নেই। তারা যতো বিলাপই করুক, তাতে আর কোনো লাভ হবে না।

'তাদের এই সব বিলাপ চলতে থাকলো যতোক্ষণ না আমি তোমাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের মতো বানিয়ে ফেললাম।'

কর্তিত শস্য! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! জীবন নেই, নড়াচড়া নেই। একেবারেই নিঝুম ও নিস্তব্ধ! অথচ এক মুহূর্ত আগেও সেখানে জীবনের কতো চাঞ্চল্য ছিলো!

বিশ্ব জগতকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি

ইতিপূর্বে আলোচিত ইসলামী আকীদা বিশ্বাস এবং সে আকীদা বিশ্বাস যে নিয়ম-বিধি অনুসারে চলে ও যে নিয়ম-বিধি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দেন, এখানে তার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সে আকীদা বিশ্বাসের সাথে সেই মহাসত্যের ও মহা বাস্তবতার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে, যার ওপর গোটা বিশ্ব জগত প্রতিষ্ঠিত এবং যার সাথে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

যেহেতু মোশরেকরা কোরআনের যে কোনো নতুন অংশ নাযিল হলেই তার প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো এবং তাতে যতোই সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকুক, তার তোয়াক্কা করতো না, যেহেতু তারা আসন্ন হিসাব নিকাশ ও বিচারের দিনের প্রতি উদাসীন এবং কাফেরদের জন্যে কী শাস্তি অপেক্ষা করছে, তার প্রতি নির্বিকার, তাই মহাসত্যের ব্যাপারেও আল্লাহর নীতি চিরদিনই অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী তিনটি আয়াতে সেই কথাই বলেছেন,

'আকাশ ও পৃথিবীকে আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' .... (আয়াত ১৬, ১৭, ১৮)

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্বকে একটা মহৎ ও নিগুঢ় উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, খেলাচ্ছলে বা তামাশাচ্ছলে নয়। সৃষ্টির পর বিশ্বজগতকে তিনি পরিচালনাও করেছেন বিজ্ঞতার সাথে, আবেগতাড়িত হয়ে নয়, কিংবা বিশৃংখলভাবেও নয়। আর যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে তিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সেই একই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে তিনি নবী ও রসূলকে পাঠিয়েছেন। কেতাব নাযিল করেছেন এবং শরীয়তের বিধান জারী করেছেন। বস্তুত মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে যেমন রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য, তেমনি তার পরিচালনার মূলেও রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য, আবার মানব জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে আকীদা ও আদর্শ মনোনীত করেছেন এবং তাদের মৃত্যুর পর যে বিচার ও হিসেব গ্রহণ করবেন তারও মূলে রয়েছে মহৎ, কল্যাণকর ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

তিনি যদি তামাশা করতেই চাইতেন, তবে নিজে নিজেই তা করতে পারতেন। তার কোনো সৃষ্টিকে এর সাথে জড়িত করতেন না। এটা আসলে নিছক কল্পনা স্বর্বস্ব যুক্তি।

'আমি যদি তামাশা করতে চাইতাম, তবে নিজে নিজেই তা করতাম।'

আরবী ব্যকরণবিদদের মতানুসারে 'লাও' হচ্ছে শর্তমূলক অব্যয়। শর্তে যে ক্রিয়ার উল্লেখ থাকে, তা অঘটিত হওয়ার শর্তাধীন ক্রিয়াকেও তা অঘটিত প্রতিপন্ন করে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তামাশা করতে চাননি, তাই আদৌ কোনো তামাশা বা পরিহাস সংঘটিত হয়নি, নিজের পক্ষ থেকেও নয়, বাইরে থেকেও নয়।

তামাশা পরিহাস কখনো সংঘটিত হবেও না। কেননা আল্লাহ কখনো তা চাননি এবং কখনো সেটা তার ইচ্ছা হয়নি। আমি কখনো তা করিনি।' অর্থাৎ পরিহাস ও তামাশা করতে ইচ্ছা করিনি।

একটা অকাট্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই কল্পনা সর্বস্ব উক্তি করা হয়েছে। এই অকাট্য সত্য হচ্ছে, মহান আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর। কাজেই আল্লাহ তায়ালা যদি পরিহাস করতে চাইতেন, তাহলে সেই পরিহাস কোনো নশ্বর সৃষ্টি কিংবা নশ্বর সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন আকাশ পৃথিবী এবং তার মধ্যকার কোনো বস্তু হতো না। কেননা এগুলো সবই নশ্বর সৃষ্টি। সেটা হতো মহান আল্লাহর সত্ত্বাভুক্ত। তাই সেটা হতো চিরন্তন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর। কেননা তা চিরন্তন ও অবিনশ্বর আল্লাহর সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহর সৃষ্টির চিরন্তন নীতি হচ্ছে, কোথাও পরিহাসচ্ছলে কিছু করা হবে না। যাই করা হবে তা হবে গুরুত্বপূর্ণ, অকৃত্রিম ও অকাট্য সত্য। ফলে এই চিরন্তন আসল সত্য নশ্বর বাতিলের ওপর বিজয়ী হবে।

'বরং আমি সত্যকে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে সত্য বাতিলের মগযকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতপর সহসাই বাতিল হয়ে যায় বিধ্বস্ত।'

এখানে বরং শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনার মোড় পরিহাস বিষয়ক বক্তব্য থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যে এবং আল্লাহর নির্ধারিত চিরন্তন প্রাকৃতিক বিধান সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্যে। এই বিধানটা হলো, সত্যের বিজয় ও বাতিলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

আয়াতে আল্লাহর এই প্রাকৃতিক বিধানটাকে একটা অনুভবযোগ্য, জীবন্ত ও চলন্ত আকৃতি দান করা হয়েছে। যেন সত্য আল্লাহর হাতের মুঠোয় ধারণ করা একটা বিস্ফোরক, যা বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করা হয় এবং তা বাতিলের মগয চূর্ণ করে দেয়, ফলে তা বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত মহাজাগতিক বিধি। বস্তুত সত্য ও ন্যায় হলো মহাবিশ্বের আসল জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতি, মহাবিশ্বের অতলান্ত গভীরে তা উপ্ত, আর বাতিল বা অন্যায় হলো বিশ্বজগতের মূল স্বভাব প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত কৃত্রিম বিষয়। আল্লাহ তায়ালা একে সত্য দিয়ে আঘাত করে চুরমার করে দেন। আল্লাহ তায়ালা যাকে বিতাড়িত করেন, যাকে আঘাত করে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, তার আদৌ কোনো স্থায়িত্ব থাকতে পারে না।

কখনো কখনো মানুষের কাছে মনে হয়, জীবনের বাস্তবতা আল্লাহর নির্ধারিত এই সত্যের পরিপন্থী। সাধারণত সেই সময়েই এরূপ মনে হয়, যখন বাতিল বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হয় এবং সত্যকে পরজিত মনে হয়। তবে এটা নিতান্তই সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যাপার।

আল্লাহ কিছু সময়ের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে এরূপ সংঘটিত করেন। এই সময়টা কেটে গেলে আবার সেই চিরন্তন সত্য পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়, যার ওপর আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপিত এবং একইভাবে যার ওপর আকীদা বিশ্বাস, দাওয়াত ও আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন, তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সত্যতায় কোনই সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে না। তারা অবিচল বিশ্বাস রাখে যে, মহাবিশ্বের ও তার ব্যবস্থাপনার আসল ভিত্তিই হলো সত্য ও ন্যায়। তারা বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত বাতিলের মগয চূর্ণ করে তাকে পর্যুদস্থ করবেন ও সত্যকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ তায়ালা যখন সাময়িকভাবে বাতিলকে বিজয়ী করেন, তখন তারা বুঝতে পারে যে, এটা তাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিকাশ বৃদ্ধির স্বার্থে এরূপ করছেন। কেননা তাদের ভেতরে কিছু কিছু দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চান তাদের এই দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে সত্যকে বিজয়ী করার, বিজয়ী সত্যকে বরণ করে নেয়ার ও তার বিজয়কে স্থায়ী করার ক্ষমতা তাদের ভেতরে জন্ম নিক। তারা যখনই এই দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করার চেষ্টা চালাবে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের এই পরীক্ষার মেয়াদ কমিয়ে আনবেন এবং তাদের হাতে তিনি যা যা বাস্তবায়িত করতে চান করবেন তা করাবেন। চূড়ান্ত পরিণতি তো নির্ধারিতই রয়েছে। সেটা হলো,

'বরং আমি বাতিলের ওপর সত্যকে নিক্ষেপ করি, তখন সত্য বাতিলের মগয চূর্ণ করে এবং বাতিল হয়ে যায় বিধবস্ত ও বিলুপ্ত।'

এভাবে কোরআন মোশরেকদের সামনে সেই অকাট্য সত্য ঘোষণা করে। মোশরেকরা যতোই কোরআন ও রসূলের নামে অপবাদ রটাক, তাকে কবি, যাদুকর ও মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। কেননা রসূলের আনীত সত্য বিধানই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে এবং বাতিলকে পরাভূত করবে। এভাবে বাতিল হবে বিলুপ্ত ও অপসৃত। অতপর তাদের অপবাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছেন,

'আর তোমাদের অপবাদের জন্যে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।'

সকল সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগত

এরপর তাদের উপেক্ষা ও নাফরমানীর বিপরীতে এবাদাত এ আনুগত্যের কিছু নমুনা তুলে ধরা হচ্ছে। এই নমুনা যারা পেশ করেছে তারা সে মোশরেকদের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। তথাপি তারা অব্যাহতভাবে তার এবাদাত ও আনুগত্য করে চলেছে। এতে তাদের নেই কোনো ক্লান্তি, নেই কোনো বিরতি।

আকাশ ও পৃথিবীতে কতো কী আছে এবং কারা কারা আছে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, আর কেউ তার পরিসংখ্যান জানে না। মানুষ যা কিছু জানে, সেটা মানব জাতির সিমীত জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মোমেনরা জ্বিন ও ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কেননা এদের সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা এদের সম্পর্কে কেবল ততোটুকু জানি, যতোটুকু মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে জানিয়েছেন। এরা ছাড়াও পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে অন্য কোনো বুদ্ধিমান সৃষ্টিও থাকতে পারে, যাদের আকৃতি ও স্বভাব সে সব গ্রহ-উপগ্রহের পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ সম্পর্কে সঠিক সত্য এক আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কাজেই আমরা যখন পাঠ করি, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার', তখন এসবের মধ্যে যা কিছু আমাদের জানা চেনা আছে, তা ছাড়া অন্যদের জ্ঞান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

'আর যারা তার কাছে থাকে' .... খুব সম্ভবত এ দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তবে যতোক্ষণ আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করা হয়নি। ততোক্ষণ ফেরেশতা এবং অন্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে আয়াতের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ও নিকটতম বান্দা। 'এন্দা' শব্দটা আল্লাহর সাথে যুক্ত হলে তা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট স্থান ও নির্দিষ্ট গুণ বৈশিষ্ট্য বুঝায় না।

'যারা তার কাছ থাকে তারা তার এবাদাত থেকে অহংকারের সাথে মুখ ফেরায় না।' যেমন মোশরেকরা অহংকার করে এবং অপরাধও করে। ফেরেশতারা এবাদাত ও আনুগত্যে কোনো ত্রুটি করে না। তাদের গোটা জীবনই এবাদাত। তারা দিন রাত কোনো বিরতি ছাড়াই আল্লাহর তাসবীহ ও গুণগান করে কাটায়।

মানুষও তার গোটা জীবনকে এবাদাতে পরিণত করতে পারে। এ জন্যে গোটা সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফেরেশতাদের মতো সদা সর্বদা কেবল তাসবীহ জপার প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলাম মানুষের প্রতিটা কাজকে ও প্রতিটা শ্বাস প্রশ্বাসকে এবাদাত রূপে গন্য করে, যদি সে প্রতিটা কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও তার হুকুম অনুযায়ী করে। এ ধরনের কাজ যদি পবিত্র ও হালাল উপকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের কাজও হয় তাহলেও তা এবাদাতে পরিণত হয়।

আকাশ পৃথিবী ও অন্য যাবতীয় সৃষ্টির মালিক এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই অবিরত তাসবীহের প্রেক্ষাপটে মোশরেকদের বহু-ইশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাবাদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দা জানানো হয়েছে পরবর্তী কয়েকটা আয়াতে। এতে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি গোচর নিয়মবিধিকে আল্লাহর একত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী কেতাবসমূহেরও বরাত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা কি পৃথিবীর বস্তুসমূহ থেকে কিছু মাবুদ গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কাউকে জীবন দান করতে পারে? যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ থাকতো, তাহলে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো ....।' (আয়াত ২১-২৫)

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্যদেরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করা সংক্রান্ত প্রশ্ন হলো তাদের বাস্তব অবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশমূলক প্রশ্ন। এতে তাদের গৃহীত দেব-দেবতাকে পরিহাস ও বিদ্রূপ করা হয়েছে। কেননা মাবুদ হবার যোগ্যতার প্রথম গুণটাই হলো মৃতকে জীবন দান। তারা যে সব মাবুদকে গ্রহণ করেছে, তারা কি এ কাজ করতে সক্ষম? নিশ্চয়ই নয়। এমনকি স্বয়ং

পৌত্তলিকরাও দাবী করে না যে, তাদের দেব-দেবীরা ও মূর্তিগুলো কারো জীবন সৃষ্টি বা পুনসৃষ্টি করতে পারে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, সেসব বাতিল মাবুদ প্রকৃত মাবুদ হবার প্রথম গুণ থেকে বঞ্চিত।

এটা ছিলো পৃথিবীতে বিদ্যমান ও দৃশ্যমান বাস্তবানুগ প্রমাণ। এ ছাড়া মহাবিশ্বের বাস্তবতা থেকে গৃহীত হয়েছে এর প্রাকৃতিক প্রমাণ,

'আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ থাকতো, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেতো।'

বস্তুত মহাবিশ্ব একটা মাত্র প্রাকৃতিক বিধির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই একটা মাত্র প্রাকৃতিক বিধিই মহা বিশ্বের সকল অংশের মাঝে বন্ধন রক্ষা করে চলেছে, সকল অংশের মধ্যে সমন্বয় বিধান করে চলেছে এবং এই অংশগুলোর তৎপরতায় ও সমগ্র বিশ্ব জগতের তৎপরতায় ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এই প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে একই বিশ্ব প্রভুর একক ইচ্ছার ফল। বিশ্ব প্রভু যদি একাধিক হতো তাহলে তাদের ইচ্ছাও ভিন্ন ভিন্ন হতো এবং স্বভাবতই প্রাকৃতিক নিয়মও ভিন্ন ভিন্ন হতো। কেননা স্বাধীন ইচ্ছাই স্বাধীন সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য। আর প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে সক্রিয় ইচ্ছার ফল। এভাবে একাধিক বিশ্ব প্রভুর ইচ্ছার বিভিন্নতা ও মতের বিভিন্নতার ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলে মহাবিশ্বের শৃংখলা ও ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যেতো। এর রীতিনীতি ও আচরণও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অরাজকতা ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দিতো; বিশ্ব প্রকৃতিতে যে সমন্বয় ও ভারসাম্য একটা দিব্য সত্য এবং যাকে চরম নাস্তিকও অস্বীকার করতে পারে না, তার কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিবেক সমগ্র সৃষ্টিজগতে একক প্রাকৃতিক নিয়মের কর্তৃত্ব অনুভব করে। তাই সুস্থ বিবেক স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাকৃতিক নিয়মের একত্ব, প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টার একত্ব এবং সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ মহাবিশ্বের প্রাজ্ঞ স্রষ্টার একত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা এ মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক কাঠামোতে এবং তার ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোনো অরাজকতা ও বৈকল্য নেই,

'তাই আরশের অধিপতি আল্লাহ তাদের সমস্ত অপবাদ থেকে পবিত্র।'

তারা অপবাদ দেয় যে, আল্লাহর শরীক রয়েছে। অথচ আরশের অধিপতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র। 'আরশ' হচ্ছে রাজত্ব, আধিপত্য ও পরাক্রমের প্রতীক। আল্লাহ স্বয়ং যেমন এই অপবাদ থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করছেন, তেমনি গোটা সৃষ্টি জগত তার সুশৃংখল, ত্রুটি মুক্ত ও নৈরাজ্য মুক্ত অবস্থান দ্বারা তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

'তিনি যা করেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হয়।'

যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ও সর্বময় কর্তা, তিনি কবেই বা জিজ্ঞাসিত হয়েছেন? তাকে কেইবা জিজ্ঞেস করবে? তিনি তো তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত, তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবাধ ও স্বাধীন, অন্য কারো ইচ্ছা তাকে প্রভাবিত বা সীমিত করে না, এমনকি যে প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁর ইচ্ছা দ্বারা অনুমোদিত এবং যে প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁর ইচ্ছা দ্বারা বিশ্ব জগতের শাসক ও পরিচালককে পরিণত হয়েছে, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম বিধিও তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। জিজ্ঞাসা ও জবাবদিহিতা শুধু নির্দিষ্ট সীমা ও মাপকাঠির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এই সীমা ও মাপকাঠি কেবল অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী কোনো সর্বময় কর্তাই নির্ধারণ করে থাকেন অথচ সৃষ্টি জগতের জন্যে নির্ধারিত সীমা ও মাপকাঠি দ্বারা তিনি নিজে

মোটেই সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত হন না। একমাত্র তিনি স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হতে চাইলেই তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। পক্ষান্তরে সৃষ্টিজগত তাঁর নির্ধারিত সীমা ও বিধিনিষেধের অধীন, তাই তারা জিজ্ঞাসিত হবেই।

অবশ্য সৃষ্টি কখনো কখনো সদম্ভ ধৃষ্টতা দেখিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ কেন এটা সৃষ্টি করলেন? এ সৃষ্টির পেছনে কোনো রহস্য ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে? যেন তারা বলতে চায়, এই সৃষ্টির পেছনে তারা কোনো যৌক্তিকতা দেখতে পাচ্ছে না। অথচ এ ধরনের প্রশ্ন তুলে তারা একদিকে যেমন মহান আল্লাহর সাথে বেআদবী করে, অপরদিকে তেমনি মানবীয় বোধ শক্তির সীমা অতিক্রম করে যা কিনা একটা সীমাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে থাকার কারণে সব কিছুর কারণ ও উদ্দেশ্য জানতে পারে না।

যিনি সব কিছু জানেন, সব কিছুকে পরিচালিত করেন, সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই সব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং শাসন করেন। কাজেই তিনি যা কিছু করেন, তার সম্পর্কে কোনো জবাবদিহি করেন না, বরং তাঁর বান্দাদেরকেই জবাবদিহি করতে হয়।

নিরংকুশ তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই নবীদের মিশন

এই প্রাকৃতিক প্রমাণের পাশাপাশি তাদেরকে আল্লাহর সেই গতানুগতিক অনুকরণ সর্বস্ব প্রমাণ ও জিজ্ঞেস করেছেন, যাকে তারা তাদের শেরকের দাবীর ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মনে করে। অথচ শেরকের আদৌ কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই,

'তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদকে গ্রহণ করেছে? বলো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো। এ হচ্ছে আমার সাথীদের স্মরণিকা এবং আমার পূর্ববর্তীদের স্মরণিকা।'

অর্থাৎ এ হচ্ছে কোরআন, যাতে রসূল (স.)-এর সমকালীনদের উল্লেখ রয়েছে এবং পূর্ববর্তী নবীদের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে রসূলরা যেসব কেতাব নিয়ে এসেছেন, তাতে আল্লাহর কথিত শরীকদের কোনো উল্লেখ নেই। কেননা সকল নবীই তাওহীদ বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম প্রচার করেছেন। কাজেই মোশরেকরা কিসের ভিত্তিতে শেরকের দাবী করে? বিশ্ব জগতের স্বভাব প্রকৃতিই তো তাদের ও দাবী খন্ডন করে। আর পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলোতেও এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'বরঞ্চ তাদের অধিকাংশই সত্যকে জানেন। তাই তাকে উপেক্ষা করে। 'আর তোমার পূর্বে আমি যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে ওহী করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই এবাদাত করো।'

বস্তুত পৃথিবীতে যেদিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন, সেদিন থেকেই তাওহীদ সকল ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি ছিলো। এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং কখনো হবেও না। এই তাওহীদ বলতে বুঝানো হয় ইলাহও এক, এবং মাবুদও এক। কাজেই প্রভুত্ব ও ইলাহত্বে কোনো পার্থক্য নেই এবং ইলাহত্ব ও এবাদাতে শেরকের কোনো অবকাশ নেই। তাই বলা যায়, তাওহীদ এমন এক অটুট ভিত্তি যা প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর মতোই অটুট ও স্থীতিশীল। তাওহীদ এইসব প্রাকৃতিক নিয়মের সাথেই যুক্ত এবং তারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এরপর উল্লেখ করা হচ্ছে মোশরেকদের এই উদ্ভট দাবী যে, আল্লাহর ছেলে আছে। এটা আরবের জাহেলী সমাজের একটা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উক্তি,

'তারা বলে, দয়াময় একটা সন্তান গ্রহণ করেছেন ....।' (আয়াত ২৬-২৯)

বিভিন্ন যুগের জাহেলী সমাজে আল্লাহর সন্তান গ্রহণের এই দাবীটা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। আরবের মোশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে আখ্যায়িত করতো। ইহুদী মোশরেকরা বলতো, হযরত ওযায়ের আল্লাহর ছেলে। আর খৃষ্টান মোশরেকরা বলে, হযরত ঈসা আল্লাহর ছেলে। অথচ এ সবই জাহেলিয়াতের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি মাত্র, যা সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র।

এ আয়াতে আরবদের এই দাবীকেই বুঝানো হয়েছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। কোরআন তাদের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে ফেরেশতাদের স্বভাব প্রকৃতি বর্ণনা করার মাধ্যমে। বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর মেয়ে নয়, বরং সম্মানিত বান্দা। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সম্মানিত। তারা আনুগত্য, সম্মান ও আদবের খাতিরে আল্লাহকে কোনো পরামর্শ পর্যন্ত দেয় না। তারা কেবল আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কাজ করে, কাজের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করে না। আল্লাহর জ্ঞান তাদের জীবনকে চারদিক থেকে বেষ্টিত করে রেখেছে। আল্লাহর পূর্ব সম্মতি ছাড়া তাদের কেউ তার কাছে সুপারিশও করতে পারে না। তারা স্বাভাবিকভাবেই এবং স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে। তারা অত্যন্ত পবিত্র, আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সর্বাত্মক ও শর্তহীনভাবে আল্লাহর অনুগত। কখনো এ ক্ষেত্রে কোনো হেরফের হয় না। তারা কখনো নিজেদেরকেই ইলাহ বলে দাবী করে না। যদি তা করতো তবে তার জন্যে তাদের শাস্তি হতো জাহান্নাম। এটাই অন্যায়কারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি, যারা এমন অন্যায় দাবী করে।

মোশরেকরাও যদি এ ধরনের দাবী করতো তবে তার জন্যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতো। তবে তারা এমন উদ্ভট, অন্যায় ও অসম্ভব দাবী করে না।

সুস্থ বিবেক এটাও অনুভব করে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর পরম অনুগত ও তাঁর ভয়ে ভীত। অথচ মোশরেকরা দাম্ভিক ও বড়ো বড়ো দাবী করে থাকে।

আল্লাহর একত্বের প্রাকৃতিক প্রমাণ, একাধিক মাবুদের পক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকা এবং বিবেকগ্রাহ্য প্রমাণাদি পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ মানব হৃদয়কে প্রকৃতির বিশাল প্রান্তরে নিয়ে যায়, যাকে আল্লাহ তায়ালা গভীর প্রজ্ঞার সাথে পরিচালনা করেন। অথচ মোশরেকরা আল্লাহর সেইসব নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, যা হৃদয় ও চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

আল কোরআনে প্রাকৃতিক ও প্রাণীজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব

'যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করেছিলাম। (আয়াত ৩০-৩৩)

এ হচ্ছে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতে পরিভ্রমণ। অনেকের মন প্রকৃতির বড়ো বড়ো নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন। অথচ মুক্ত মন, বুদ্ধি বিবেক ও সচেতন অনুভূতি নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে প্রকৃতিতে মানুষের হৃদয়কে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়ার মতো বহু জিনিস রয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর প্রথমে যুক্ত থাকা এবং পরে উভয়কে পৃথক করে দেয়ার বিষয়টা গভীর চিন্তা গবেষণার দাবী রাখে। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের ব্যাখ্যার চেষ্টায় মহাশূন্য সংক্রান্ত মতবাদগুলো ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমানে কোরআন বর্ণিত এই তত্ত্বের চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

অধুনা যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা হলো, নক্ষত্র মন্ডল– বিশেষত সূর্য ও সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণরত গ্রহ উপগ্রহসমূহ যথা পৃথিবী ও চাঁদ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত সৌরমন্ডল আগে ছিলো অস্পষ্ট মেঘমালার মতো। পরে পৃথক পৃথকভাবে গোলাকার পিন্ডের আকৃতি ধারণ করে। আর পৃথিবী ছিলো সূর্যের অংগীভূত। পরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও ঠান্ডা হয়ে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে।

কিন্তু এটা মহাশূন্য সংক্রান্ত নিছক একটা মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ এ মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু আগামীকাল এটা বাতিল বলেও গণ্য হতে পারে এবং এর স্থলে অন্য একটা মতবাদও চালু হয়ে যেতে পারে, যা হয়তো ভিন্ন কোনো অনুমানের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার যোগ্যতা লাভ করবে, আর সেই অনুমান একটা মতবাদে পরিণত হতে পারে।

আমরা যারা ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী, কোরআনের সুনিশ্চিত বক্তব্যকে কোনো অনিশ্চিত ও সন্দেহপূর্ণ মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি না, যা আজ স্বীকৃত ও সমাদৃত হলেও কাল প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেতে পারে। এ জন্যে আমি আমার এ তাফসীর গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও কোরআনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করি না। কেননা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এক জিনিস, আর বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা আর এক জিনিস। বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত, যেমন উত্তাপ দ্বারা ধাতব পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়া ও পানির বাষ্পে পরিণত হওয়া এবং ঠান্ডায় পানি বরফ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো বৈজ্ঞানিক মতবাদ থেকে ভিন্ন, একথাগুলোই আমি যিলালুল কোরআনে ইতিপূর্বে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছি।

কোরআন বৈজ্ঞানিক মতবাদের গ্রন্থ নয়। এটা কোনো অভিজ্ঞতার ভান্ডার হয়েও আসেনি। কোরআন হলো সমগ্র জীবনের বিধান। এটা হচ্ছে মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে বিশুদ্ধি করণের পদ্ধতি, যাতে বিবেক নিজ সীমানার ভেতরে থেকে সঠিকভাবে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে। কোরআন গোটা সমাজের বিশুদ্ধি করণেরও পদ্ধতি, যাতে সমাজ বিবেককে কাজ করার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেয় এবং নিছক তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। কেননা বিবেককে বিশুদ্ধ ও স্বাধীন করে দেয়ার পর এ কাজটা বিবেকের ওপরই ন্যস্ত হবে।

কখনো কখনো কোরআন কিছু কিছু প্রাকৃতিক তথ্য উপস্থাপন করে থাকে, যেমন এখানে করেছে, 'আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর যুক্ত ছিলো, পরে আমি উভয়কে পৃথক করেছি।' এ তথ্যটা কেবলমাত্র কোরআনে উপস্থাপিত হওয়ার কারণেই আমরা বিশ্বাস করি। যদিও এ দ্বারা আমরা এটা জানতে পারছিলাম না যে, কিভাবে আকাশ ও পৃথিবীকে আলাদা করা হয়েছিলো। কোরআনের বিঘোষিত এই সামগ্রিক তথ্যের বিরোধিতা করেনা– এমন সকল বৈজ্ঞানিক মতবাদকেও আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমরা কোরআনকে নিয়ে যে কোনো মহাশূন্য তত্ত্বের পেছনে ছুটতে পারি না এবং মানবীয় মতবাদসমূহের মধ্যে কোরআনের সমর্থন খুঁজে বেড়াতে পারি না। কেননা কোরআন হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সত্য। বড়ো জোর যে কথাটা বলতে পারি তা হলো, আজকের প্রচলিত মহাশূন্য তত্ত্ব কোরআনের এই আয়াতের সার্বিক মর্মের বিরোধী নয়। অথচ কোরআনের এই বক্তব্য এসেছে বহু প্রজন্ম আগে।

পানি থেকে প্রত্যেক বস্তুর জীবন দান করা

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে,

'আর আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুকে তৈরী করেছি।'

এ থেকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞানীরা এ তথ্যটার প্রকাশকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অভিহিত করেছেন। এ তথ্যটার সন্ধান লাভের জন্যে তারা ডারউইনকে অভিনন্দিত করেন। কেননা ডারউইন ঘোষণা করেছেন যে, জীবনের প্রথম উৎস হলো পানি।

এটা যথার্থই একটা সাড়া জাগানো তথ্য, যদিও কোরআনে এটার উল্লেখ থাকায় আমরা তেমন বিস্মিত হই না এবং কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় বৃদ্ধি পাওয়া এর ওপর নির্ভর করে না। বস্তুত এ তথ্য যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এই বিশ্বাসই এর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে অটুট প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট– বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন ও মতবাদের সাথে কোরআনের বক্তব্যের মিল খাওয়ার ওপর তা নির্ভরশীল নয়। এ ক্ষেত্রে বড়ো জোর এতোটুকু বলা যায় যে, এই বিশেষ কথাটার ব্যাপারে বিবর্তনবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ কোরআনের বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। (১)

তেরো শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে কোরআন কাফেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি এবং এতো প্রকাশ্যভাবে ও স্বচ্ছভাবে দৃশ্যমান নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন না করায় অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছে। কোরআন বলেছে, 'তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?' অর্থাৎ তাদের চারপাশের প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রতিটি জিনিস মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করা সত্তেও তারা ঈমান আনবে না?

এরপর প্রকৃতির অন্যান্য বৃহৎ দৃশ্যাবলী উপস্থাপন করে বলা হয়েছে,

'আর পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে।'................

এখানে বলা হচ্ছে যে, এইসব বড়ো বড়ো পাহাড়-পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করছে, ফলে পৃথিবী একদিকে ঝুঁকে পড়ছে না এবং নড়বড় করছে না। ভারসাম্য নানাভাবে রক্ষা করা হচ্ছে। পৃথিবীর ওপর বহিরাগত চাপ ও আভ্যন্তরীণ চাপের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা, যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অথবা, পৃথিবীর একস্থানে পর্বত সৃষ্টি দ্বারা অন্য জায়গায় ভূমির নিম্নতার সমতা বিধান করা। যেভাবেই হোক, আয়াতের এ অংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর স্থীতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষায় পাহাড়-পর্বতের ভূমিকা রয়েছে। এখন কেননা পন্থায় এই ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে, সেটা উদঘাটন করার কাজটা আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ন্যস্ত করতে পারি। কেননা ওটাই তার আসল কর্মক্ষেত্র। কোরআনের কাছ থেকে আমরা শুধু এতোটুকু জানাই যথেষ্ট মনে করতে পারি যে, এই মহাবিশ্বের ওপর তাঁর মহাশক্তিশালী হাত নিরন্তর সক্রিয় অবদান রেখে চলেছে,

'আর এখানে আমি প্রশস্ত রাস্তাসমূহ তৈরী করেছি, যাতে তারা গন্তব্যের সন্ধান পায়।'

পাহাড় পর্বতে প্রশস্ত রাস্তার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পর্বতের উচ্চস্তরগুলোতে বিদ্যমান ফাঁকা জায়গা, যাকে রাস্তা বা গিরিপথে পরিণত করা হয়। এই প্রশস্ত রাস্তাগুলো উল্লেখের পাশাপাশি গন্তব্যের সন্ধান লাভের কথা বলে প্রথমত বাস্তব সত্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

(১) মহাশূন্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত অতি সাম্প্রতিক তথ্যে এটা জানা গেছে যে, মংগলগ্রহ সহ আরো দু' একটি গ্রহে পানির কিছু উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার ওপর ভিত্তি করে এখন অনেকেই বলছেন, যেহেতু মংগল গ্রহে পানির একটা দূরতম সন্ধান পাওয়া গেছে তাই আধুনিক বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ীই এটা বলা চলে যে, কোনো না কোনো দূর অতীতে এখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো। বিজ্ঞানীরা বলছেন আজ থেকে প্রায় দশ বিলিয়ন বছর আগে এসব জায়গায় প্রাণের অস্তিত্ব ছিলো। জানা কথাই যে সূত্র ধরে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, 'যেখানেই পানি থাকবে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে'। কোরআনে বর্ণিত এই সূত্র ধরে ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক কিছুই হয়তো জানতে পারবো। উৎসাহী পাঠকদের এ ব্যাপারে আরো পড়া শোনা করার অনুরোধ করছি।–সম্পাদক

অতপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আকীদা ও বিশ্বাসের জগতে একটা তাৎপর্যময় ইংগিত করা হয়েছে যে, গিরিপথে যেমন তারা গন্তব্যের সন্ধান পায়, তেমনি আশা করা যায় যে তারা ঈমানের পথেরও সন্ধান পাবে।

'আর আমি আকাশকে বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ।'

আরবী 'সামা' শব্দটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যে কোনো উর্ধের বস্তু। আমাদের মাথার ওপর আমরা ছাদ সদৃশ একটা জিনিস দেখতে পাই। কোরআন জানাচ্ছে যে, আকাশ একটা সুরক্ষিত ছাদ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের যে কোনো বিকৃতি ও বৈকল্য থেকে সুরক্ষিত অথবা আল্লাহর ওহী নাযিলের উৎসস্থলের প্রতীক হিসেবে আকাশ সব রকমের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। আয়াতের শেষাংশে এ দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'তারা আমার নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।'

'তিনি সেই সত্ত্বা, যিনি রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। সবাই এক আকাশে সাঁতার কেটে চলেছে।'

রাত ও দিন দুটো প্রাকৃতিক উপাদান। সূর্য ও চন্দ্র দুটো বিশাল বিশাল পিন্ড, যার মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে এবং সমগ্র জীবনের সাথে গভীর ও অটুট সম্পর্ক রয়েছে। রাত ও দিনের এই অবিরত আবর্তন, যা এক মুহূর্তের জন্যে বিশৃংখলার শিকার হয় না এবং সূর্য ও চন্দ্রের এই বিরামহীন ও ত্রুটিহীন আনাগোনা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মহা শক্তিশালী ও প্রাজ্ঞ স্রষ্টার একত্ব, তাঁর ইচ্ছার একত্ব ও প্রাকৃতিক নিয়মের একত্বে বিশ্বাস গড়ে ওঠার আশা করা যায়।

কোনো সৃষ্টিই চিরঞ্জীব নয়

অধ্যায়টার শেষভাগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও তৎপরতার নিয়ম এবং মানব জীবনের প্রকৃতি, অবসান ও পুনরুজ্জীবনের নিয়মের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে,

'আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব দেইনি। তুমি যদি মারা যাও, তবে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করবো, তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে।'

'তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব দেইনি।' বস্তুত প্রত্যেক সৃষ্টিই ধ্বংসশীল। যে জিনিসেরই শুরু আছে, তার শেষও আছে। রসূল (স.) যদি ইন্তেকাল করেন, তাহলে তারা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে? যদি না থাকে তাহলে তারা কেন মরণশীল মানুষের মতো কাজ করেছ না? কেন চিন্তা ভাবনা করে না ও বিবেক বুদ্ধি খাটায় না?

'প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।'

এটাই হচ্ছে জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক বিধান। এটা সেই অমোঘ বিধি, যার কোনো ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং সকল প্রাণীর উচিত অবধারিত এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের কথা মনে রেখে সব কাজ করা।

মৃত্যুই হলো প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি এবং পৃথিবীতে তার সংক্ষিপ্ত সফরের পরিসমাপ্তি। সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। এই সফর চলাকালে মানুষকে যে সুখ বা দুঃখের মোকাবেলা করতে হয়। সেটা তার জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ,

'তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করি।'

মন্দ বা দুঃখ দিয়ে যে পরীক্ষা করা হয় তা সহজেই বোধগম্য। এ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ধৈর্য, সহনশীলতা, আল্লাহর ওপর আস্থা ও তাঁর রহমতের আশার দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু ভালো ও সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে কিভাবে পরীক্ষা করা হয়, সেটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

সুখ ও সচ্ছলতা দিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়, তা অধিকতর বিপজ্জনক ও কঠিন– যদিও মনে হয় দুঃখজনিত পরীক্ষার চেয়ে সহজ। কেননা বিপদ ও দুঃখের পরীক্ষায় অনেকেই উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সুখের পরীক্ষায় খুব কম লোকই পাস করতে পারে। প্রাচুর্য ও সামর্থের পরীক্ষায় খুব কম লোক ধৈর্যধারণ করতে পারে। শক্তি সামর্থের প্রবলতার চাপকে সংযত করতে অনেকেই সক্ষম হয় না।

দারিদ্র ও বঞ্চনার পরীক্ষায় অনেকেই উত্তীর্ণ হয়। ফলে তাদের পদস্খলন হয় না এবং হীনতায় আক্রান্ত হয় না। কিন্তু প্রাপ্তি ও প্রাচুর্যের পরীক্ষায় অনেকেই উত্তীর্ণ হয় না। ভোগ বিলাসের আতিশয্যে অনেকেই সীমা অতিক্রম করে যায়।

যুলুম নিপীড়ন ও শোষণ নিষ্পেষণে অনেকেই ধৈর্যধারণ করে, সন্ত্রাস শাসানি ও রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটিতেও অনেকে ভয় পায় না। কিন্তু ভোগ, পদ ও প্রাচুর্যের প্রলোভনে খুব কম লোকই ধৈর্যধারণ করতে সমর্থ হয়।

জীবনের কঠোর সাধনা ও সংগ্রামে অনেকে ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু আয়েশী জীবনের সুখ সম্ভোগে খুব কম লোকই স্থির থাকতে পারে। লোভ লালসার কাছে অনেকেই মাথা নোয়ায় এবং উদারতা ও শৈথিল্য অনেককে ভীরু কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।

বিপদমুসিবত ও দুঃখ কষ্ট অনেকের মধ্যে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চেতনা গড়ে তোলে, সৃষ্টি করে দুর্জয় মনোবল ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। পক্ষান্তরে সুখ শান্তি স্নায়ুমন্ডলকে শিথিল উদাসীন করে দেয় এবং জাগৃত ও প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস করে।

তাই অনেকে বিপদ মুসিবতে ও দুঃখ কষ্টের স্তর সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে। কিন্তু যেই সুখ ও সমৃদ্ধি আসে, অমনি পরীক্ষায় পড়ে যায়। এটাই মানুষের স্বভাব। তবে আল্লাহ তায়ালা অনেককে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। তাদের সম্পর্কেই রসূল (স.) বলেছেন, 'মোমেনের অবস্থাটা বড়োই বিস্ময়কর' তার সব কিছুই কল্যাণকর। এটা মোমেন ছাড়া আর কারো বেলায় খাটে না। সে যদি সুখ লাভ করে, তবে শোকর করে। সেটা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি দুঃখ লাভ করে, তবে ধৈর্যধারণ করে। সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়।' (সহীহ মুসলিম)

তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

সুতরাং সুখের পরীক্ষায় সচেতনতা ও সতর্কতা দুঃখের পরীক্ষার সতর্কতা ও সচেতনতার চেয়ে অগ্রগণ্য। উভয় অবস্থায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাই সফলতা রক্ষা করা।

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي
يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ
عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ
وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ
مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ
مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ

৩৬. কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখন (মনে হয়) তারা তোমাকে কেবল তাদের বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা (তোমার দিকে ইশারা করে) বলে, এ কি সে ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব দেবীদের (মন্দভাবে) স্মরণ করে, অথচ (এরা নিজেরাই) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার স্মরণকে অস্বীকার করে। ৩৭. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে তাড়াহুড়ো (করার প্রকৃতি) দিয়ে, অচিরেই আমি তোমাদের আমার (কুদরতের) নিদর্শনগুলো দেখিয়ে দেবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়ো কামনা করো না। ৩৮. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বলো কেয়ামতের এই ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে? ৩৯. কতো ভালো হতো যদি এ কাফেররা (সে ক্ষণটির কথা) জানতো! (বিশেষ করে) যখন তারা তাদের সামনে ও তাদের পেছন থেকে আসা আগুন কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না, (সে সময়ে) তাদের (কোনো রকম) সাহায্যও করা হবে না। ৪০. (মূলত কেয়ামত) তাদের ওপর আসবে হঠাৎ করে, এসেই তা তাদের হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তাকে তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না, আর না তাদের (এ জন্যে) কোনো অবকাশ দেয়া হবে! ৪১. (হে নবী,) তোমার আগেও অনেক রসূলকে (এভাবে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিলো, পরে (দেখা গেলো) তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলো তাই তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছে।

রুকু ৪

৪২. (হে নবী), তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালার আযাব থেকে রক্ষা করবে- তা রাতের বেলায় আসুক কিংবা দিনের বেলায় আসুক, কিন্তু (সে কথা না ভেবে) এরা নিজেদের মালিকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ৪৩. তবে কি তাদের আরো কোনো মাবুদ আছে যারা আমার (আযাব) থেকে তাদের বাঁচাতে

وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ ۗ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۗ اَفَهُمُ
الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا
يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا
كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

পারবে; তারা তো নিজেদেরই কোনো সাহায্য করতে পারবে না, না তারা আমার কাছ থেকে সেখানে কোনো সাহায্যকারী পাবে! ৪৪ (মূলত) আমি এদের এবং এদের পিতৃপুরুষদের যাবতীয় ভোগসম্ভার দান করে যাচ্ছিলাম এবং এভাবে এদের ওপর দিয়ে (সমৃদ্ধির) এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; এখন কি তারা দেখতে পাচ্ছে না, আমি যমীনকে চারদিক থেকে তাদের ওপর সংকুচিত করে আনছি, তারপরও কি তারা বিজয়ী হবে (বলে আশা করে)? ৪৫. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি তো শুধু ওহী দিয়ে তোমাদের (জাহান্নামের) ভয় দেখাই, কিন্তু এই বধিররা ডাক শুনতে পায়না, (বার বার) তাদের সতর্ক করা হলেও (তারা সে সতর্কবাণীর কিছুই শুনতে পায় না)। ৪৬. (অথচ) তোমার মালিকের আযাবের সামান্য কিছু অংশও যদি এদের স্পর্শ করে তখন এরা বলে উঠবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা সত্যিই যালেম ছিলাম! ৪৭. কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের জন্যে একটি মানদন্ড স্থাপন করবো, অতপর সেদিন কারো (কোনো মানব সন্তানের) ওপরই কোনো রকম যুলুম হবে না; যদি একটি শস্য দানা পরিমাণ কোনো আমলও (তার কোথাও লুকিয়ে) থাকে, (হিসাবের পাল্লায়) তা আমি (যথার্থই) এনে হাযির করবো, হিসাব নেয়ার জন্যে আমিই যথেষ্ট।

তাফসীর
আয়াত ৩৬-৪৭

এ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিধান, মহাবিশ্বের বিভিন্ন উপাদান, দাওয়াত ও আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, মানুষের শেষ পরিণতি, কাফেরদের ধ্বংসের ইতিবৃত্ত............. ইত্যাদি সম্বলিত সুদীর্ঘ আলোচনার পর পুনরায় সেই বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে, যা সূরার শুরুতে আলোচিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে, রসূল (স.) ও তার কাছে আগত ওহীর সাথে মোশরেকদের আচরণ, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও শেরকের ওপর জিদ ইত্যাদি।

এরপর মানুষের দ্রুততা প্রীতিজনিত স্বভাব ও তাড়াতাড়ি আযাব নিয়ে আসার দাবী নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তারপর তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে রসূল (স.)-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিণতি সম্পর্কে, পৃথিবীতে যারা প্রতাপশালী এবং রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী তাদের পরকালীন আযাবের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে।

অতপর এ অধ্যায়টার শেষ পর্যায়ে কেয়ামতের হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এই হিসাব ও কর্মফলকে প্রাকৃতিক বিধান মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনে ও আন্দোলনে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

অবিশ্বাসীদের ঘৃণ্য চরিত্র ও তার পরিণতি

'যখন তারা তোমাকে দেখে, অমনি উপহাস করে............।' (আয়াত ৩৬)

এই কাফেররা সেই মহা দয়াবান আল্লাহর প্রতি কুফরী করে, যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তারা রসূল (স.)-এর কাজের নিন্দা-সমালোচনা করে, কেননা তিনি তাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করেন। অথচ তারা আল্লাহর প্রতি কুফরী করেও কোনো অনুশোচনা বোধ করে না। এটা যথার্থই বিস্ময়ের ব্যাপার।

তারা রসূল (স.)-এর সাথে দেখা হলেই ব্যংগ বিদ্রূপ করে এবং বলে, 'এই নাকি সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের দেব-দেবী সম্পর্কে কথা বলেন?' তারা এটা করে শুধু রসূল (স.)-এর ওপর চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, যাতে তিনি তাদের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভেবে নীরবতা অবলম্বন করেন। অথচ তারা নিজেরা আল্লাহর বান্দা হয়েও তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একটুও সচেতন হয় না, তাঁর প্রতি কুফরী থেকে বিরত হয় না এবং কোরআনের প্রতি বিমুখ থাকে! এ এক বিস্ময়কর চারিত্রিক বৈষম্য, যা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের স্বভাব প্রকৃতি একেবারেই বিকৃত হয়ে গেছে এবং তারা কোনো বিষয়েরই সঠিক মূল্যায়ন করে না।

তাছাড়া রসূল (স.) তাদেরকে যে আযাবের হুঁশিয়ারী দেন, সেই আযাবকে দ্রুত সংঘটিত করার জন্যেও তারা আবদার ধরে। কারণ মানুষ স্বভাবতই দ্রুততা প্রিয়,

'মানুষ দ্রুততা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। আমার নিদর্শনাবলী অচিরেই দেখাবো।..........' (আয়াত ৩৭-৩৮)

'মানুষ দ্রুততা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে' এ উক্তি থেকে বুঝা গেলো, দ্রুততা প্রীতি মানুষের মজ্জাগত স্বভাব, তার দৃষ্টি সময় উঁকি দিয়ে থাকে বর্তমান মুহূর্তের ওপারে কী আছে, তা নাগালে পাওয়ার জন্যে, কোনো জিনিস তার কল্পনায় উপস্থিত হলেই সে উন্মুখ হয়ে ওঠে তাকে তৎক্ষণাত বাস্তবায়িত দেখার জন্যে, তাকে দেয়া যে কোনো প্রতিশ্রুতির তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন দেখতে সে উৎসুক হয়ে ওঠে– এমনকি তাতে যদি তার ক্ষতি ও কষ্ট অনিবার্য হয় তবুও। তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, তবে সে সর্বাবস্থায় নিশ্চিন্ত ও স্থির থাকে। সব কিছুকে সে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে। তাই আল্লাহর ফয়সালা লাভের জন্যে তাড়াহুড়ো করে না। কেননা আস্থা ও ধৈর্যেরই নাম ঈমান।

মক্কার মোশরেকরা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ো করতো এবং জিজ্ঞেস করতো কবে পূর্ণ হবে দুনিয়া ও আখেরাতে আযাব নাযিল হওয়ার প্রতিশ্রুতি। এর জবাবে কোরআন তাদের সামনে আখেরাতের আযাবের একটা দৃশ্য তুলে ধরেছে এবং পূর্ববর্তী ব্যংগ বিদ্রূপকারীরা দুনিয়াতে যে ভয়াবহ আযাব ভোগ করেছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হুশিয়ার করেছে,

'কাফেররা যদি জানতো, যেদিন তারা তাদের সামনে থেকে ও পেছন থেকে আগত আগুনকে ফেরাতে পারবে না ....।' (আয়াত ৩৯-৪১)

অর্থাৎ আখেরাতে যা ঘটবে তা জানলে তাদের আচরণ অন্যরকম হতো এবং তারা ঠাট্টা-মস্করা ও তাড়াহুড়ো করতো না। ঠিক আছে, যা হবে তার অপেক্ষায় বসে থাকুক।

এখানে যে দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আগুন যেন তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছি। তারা মরিয়া হয়ে তা ঠেকাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সে আগুনকে না পারছে

সামনের দিক থেকে ঠেকাতে, না পারছে পেছন দিক থেকে ঠেকাতে, না পারছে আগুনকে ক্ষনেকের জন্যে হলেও দূরে সরিয়ে রাখতে।

আখেরাতে আগুনের এই আকস্মিক ও সর্বাত্মক আক্রমণ হলো তাদের ত্বরিত আযাব কামনার শাস্তি। তারা জিজ্ঞেস করতো আযাব কবে আসবে। এর জবাব দেয়া হবে এই ভয়াবহ আকস্মিক শাস্তি দিয়ে, যা তাদেরকে দিশেহারা করে ছাড়বে, তাদের চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেবে না।

ওটা তো আখেরাতের আযাব। বাকী রইলো দুনিয়ার আযাবের ব্যাপারটা। দুনিয়ার আযাব পূর্ববর্তী বিদ্রূপকারীদের ওপর এসেছে। বর্তমান কাফেরদের ওপর যদি পূর্ববর্তীদের মতো নিশ্চিহ্নকারী আযাব নাও আসে, তবে নিহত হওয়া, বন্দী হওয়া ও পরাজিত হওয়ার মতো আযাব তো অবশ্যই আসতে পারে। নবী রসূলদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। নচেত বিদ্রূপকারীদের শাস্তি কেমন, তা কারো অজানা নেই। অতীতের ইতিহাসই এর সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। সেই ঐতিহ্য কখনো বদলাবে না।

এ প্রসংগে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, সেই পার্থিব আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ আছে কি, যিনি তাদেরকে সারা দিন রাত পাহারা দিয়ে চলেছেন। (আয়াত ৪২-৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহই প্রত্যেক প্রাণীর জন্যে দিনে রাতে একমাত্র প্রহরী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো সর্বোচ্চ মানের দয়া ও করুণা। তিনি ছাড়া আর কোনো রক্ষক ও প্রহরী নেই। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের আর কোনো রক্ষক আছে কি?

আসলে এটা নেতিকবাচক প্রশ্ন। তিনি ছাড়া কোনো রক্ষক নেই এবং এ কারণে তাঁর স্মরণ থেকে তাদের উদাসীন হওয়ার কোনো যুক্তি নেই– এ কথা বুঝানোর জন্যেই এ প্রশ্ন করা হয়েছে। 'বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে উদাসীন।'

পুনরায় তাদেরকে নতুনভাবে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তাদের এমন কিছু 'ইলাহ' আছে নাকি, যারা তাদেরকে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে? না কখনো নয়। 'ওরা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না।' সুতরাং অন্যের সাহায্য করার তো প্রশ্নই ওঠে না। 'তারা আমার সাহচর্যেও থাকে না।' কাজেই সাহচর্য দ্বারা যে শক্তি ও সাহায্য পাওয়া যায় তাও তারা পায় না, যেমন পেয়েছিলেন হযরত মূসা ও হারূন। আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি, দেখছি ও শুনছি।'

বস্তুত মোশরেকদের দেব-দেবী ও মূর্তির না আছে নিজস্ব কোনো শক্তি, না আছে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া কোনো শক্তি। কাজেই তারা একেবারেই অক্ষম ও অথর্ব।

সম্পদের প্রাচুর্য পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার পরিণতি

এই জোরদার যুক্তি তর্কের মাধ্যমে মোশরেকদের আকীদা-বিশ্বাসের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার পর পরবর্তী আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের বিভ্রান্তির কারণ উদঘাটন করা হয়েছে। অতপর বিজয়ী শক্তির পদদলিত হয়ে পৃথিবীর ব্যাপকতা ও বিশালতা কমে ক্রমেই যে তা সংকীর্ণ হয়ে আসছে, সেই সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে,

'বরং আমি তাদেরকে ও তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে অনেক ভোগের উপকরণ দিয়েছি..............।' (আয়াত ৪৪)

অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশালায়তন ভূ-সম্পত্তি ও ভোগের উপকরণ তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছে। বিলাসিতা, প্রাচুর্য ও ভোগবাদ সাধারণত মনমগযকে বিকারগ্রস্ত করে দেয় এবং চেতনা অনুভুতিকে বিকল করে দেয়। পরিণামে আল্লাহর সংক্রান্ত অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায় এবং নিদর্শনাবলীর প্রতি কৌতুহলতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার স্পৃহা কমে যায়। এটাই হচ্ছে সম্পদ ও প্রাচুর্যের পরীক্ষা। মানুষ যখন নিজেকে জাগ্রত ও সচেতন করতে চায় না এবং নিজেকে সতর্কভাবে পাহারা দেয় না, তখন সে এ পরীক্ষায় বিফল হয়। আর যখন সে নিজেকে আল্লাহর সাথে যুক্ত রাখে, তখন সে প্রাচুর্যের মধ্যেও আল্লাহকে ভুলে না।

এ জন্যেই এ আয়াতে মানুষের চেতনা ও অনুভূতিকে নাড়া দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে প্রতিনিয়ত সংঘটিত ঘটনাবলীকে তার সমনে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্তে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো বৃহৎ দেশকে গুটিয়ে ফেলে ক্ষুদ্রতর ও সংকীর্ণতর দেশে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে তা ছিলো এক একটা সাম্রাজ্য। একদিন যে দেশ ছিলো বিজয়ী, তা আজ সহসা হয়ে যাচ্ছে বিজিত। একদিন যে দেশ ছিলো বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত, সহসা তা হচ্ছে যচ্ছে জনবিরল। একদিন যে দেশ ছিলো উন্নত ও সমৃদ্ধ, সহসা তা হয়ে যাচ্ছে দরিদ্র ও দেউলে।

এ আয়াত এমন একটা দৃশ্য অংকিত করেছে যেন আল্লাহ তায়ালা নিজের অসীম শক্তিশালী হাত দিয়ে পৃথিবীর ভূ-ভাগকে গুটিয়ে আনছেন এবং প্রান্তসীমা সংকুচিত করে আনছেন। ফলে তা যেন এক গুরুগম্ভীর ও মায়াবী ভুবনে রূপ নিচ্ছে।

'তবে কি তারা বিজয়ী?' অর্থাৎ তারা কি ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে, অন্যদের ওপর যেসব দুর্যোগ ও আযাব নামে, তা তাদের ওপর নামতে পারবে না?

এই হৃদয় কাঁপানো দৃশ্যের নিরীখে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হচ্ছে যেন তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন,

'বলো, আমি তোমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করছি মাত্র। যারা বধির তারা তো কোনো সতর্কবাণী শুনতে পায় না।'

অর্থাৎ তারা যেন সেই বধিরদের মতো না হয়, যারা শুনতে পায় না। তাহলে তাদের পায়ের তলা থেকে ভূমন্ডলকে গুটিয়ে সংকীর্ণ করে ফেলা হবে এবং সেখানে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হবে।

এই সাথে তাদের মনে যাতে উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য আরো গভীরভাবে রেখাপাত করে। সে জন্যে তাদের সামনে তাদের আল্লাহর আযাবে পতিত হওয়ার সম্ভাব্য দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে,

'আর যদি তাদের ওপর তোমার প্রভুর আযাবের একটা ঝাপটাও আসে, তবে তারা অবশ্যই আর্তনাদ করে ওঠবে যে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সত্যি দুরাচারী ছিলাম।'

'নাফ্হা' (ঝাপটা) সাধারণ আনন্দদায়ক ঘটনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তা আযাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের মর্ম এই যে, তোমার প্রভুর আযাবের সামান্যতম ধাক্কা খেলেও তারা দিশেহারা হয়ে পড়বে এবং নিজেদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে আরম্ভ করবে। কিন্তু তখন আর স্বীকারোক্তিতে কোনো লাভ হবে না। ইতিপূর্বে সূরার অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব অপরাধী জাতির ওপর আল্লাহর আযাব এসেছে, তারাও বিলাপ করছে যে, হায় আমাদের পোড়া কপাল, আমরা যুলুম করে ফেলেছি। কিন্তু তারা বিলাপরত থাকা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে কর্তিত ফসল ও নিভানো আগুনের মতো স্পন্ধনহীন বানিয়ে দিয়েছি।' (আয়াত ১৪-১৫)

এ থেকে জানা গেলো, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর এই স্বীকারোক্তি ও বিলাপ সম্পূর্ণ নিস্ফল। এর চেয়ে বরং সময় থাকতে এবং আযাব এসে যাওয়ার আগে ওহীর হুশিয়ারী শুনে সতর্ক হওয়া শ্রেয়।

এ পর্বের সর্বশেষ যে আয়াতে কেয়ামতের দিনের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা হলো,

কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের খাতিরে দাড়িপাল্লা স্থাপন করবো। কাজেই কারো ওপর একবিন্দুও যুলুম হবে না। যদি সরিষার বীজ পরিমাণও কোনো কাজ থেকে থাকে, তবে আমি তা উপস্থাপন করবো। হিসেব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট।'

'সরিষার বীজ' দ্বারা খালি চোখে দর্শনযোগ্য এমন ক্ষুদ্রতম জিনিসকে বোঝানো হয়েছে, যার ভার দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে কম। কেয়ামতের দিন এটাও পরিত্যক্ত হবে না ও বৃথা যাবে না। আল্লাহর সূক্ষ্ম দাড়িপাল্লায় তার যথাযথ ও নিখুঁত পরিমাপ হবে।

অতএব প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত পরকালের জন্যে কি সম্বল যোগাড় করেছে। আল্লাহর হুশিয়ারীর প্রতি প্রত্যেকের গুরুত্ব দেয়া উচিত। যারা পার্থিব অলসতা, উদাসীনতা ও ব্যংগ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, তাদের দুনিয়া বা আখেরাতে আযাবের শিকার হওয়ার আগেই সংযত হওয়া উচিত। যদি দুনিয়ার আযাব থেকে কোনো পাপী বেঁচেও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। সেখানে দাড়িপাল্লা থাকার কারণে কারো যুলুমের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং কারো কণা পরিমাণও ভালো মন্দ কাজ নিষ্ফল হবে না।

এভাবে আখেরাতের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত দাড়িপাল্লার সাথে দুনিয়ার সূক্ষ্ম ও নির্ভুল প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। সমন্বয় ঘটানো হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বভাব প্রকৃতির সাথে। আর এই পরিপূর্ণ সমন্বয় ও ঐক্যতান সহকারে সকল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভাগ্য মহান আল্লাহর একক ইচ্ছা ও মর্জির হাতে সমর্পিত হয়েছে। এভাবে তাওহীদের আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে, যা এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ
اَنْزَلْنٰهُ ۖ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ
لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ
وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾
قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى
ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৪৮. অবশ্য আমি মূসা ও হারূনকে (ন্যায় অন্যায়ের) ফয়সালাকারী একটি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, পরহেযগার লোকদের জন্যে দিয়েছিলাম (আঁধারে চলার) আলো ও (জীবনে চলার) উপদেশ, ৪৯. (এটা তাদের জন্যে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে না দেখেও ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ৫০. আর এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ উপদেশ, এটি আমিই নাযিল করেছি, তোমরা কি এর অস্বীকারকারী হতে চাও?

রুকু ৫

৫১. আমি আগে ইবরাহীমকে ভালোমন্দ বিচারের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি সে সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম, ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার জাতির (লোকদের) বললো, এ (নিষ্প্রাণ) মূর্তিগুলো আসলে কি – যার (এবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো। ৫৩. তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এগুলোর এবাদাত করতে দেখেছি (এর চাইতে বেশী কিছু আমরা জানি না)। ৫৪. সে বললো, (এগুলোর পূজা করে) তোমরা নিজেরা (যেমন আজ) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছো, (তেমনি) তোমাদের পূর্বপুরুষরাও (গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো)। ৫৫. তারা বললো, তুমি কি আসলেই আমাদের কাছে কোনো সত্য নিয়ে এসেছো, না অযথাই (আমাদের সাথে) তামাশা করছো। ৫৬. সে বললো (না, এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়), বরং তোমাদের মালিক যিনি, তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, আর আমি নিজেই হচ্ছি এ ব্যাপারে সাক্ষীদের একজন। ৫৭. আল্লাহ তায়ালার শপথ, তোমরা এখান থেকে সরে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কৌশল অবলম্বন করবো।

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْا مَنْ

فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ

يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ

هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا

اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ

يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا

يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৫৮. অতপর (তারা চলে গেলে) ওদের বড়োটি ছাড়া অন্য মূর্তিগুলোকে সে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলো, যাতে করে তারা তার (ঘটনা জানার জন্যে এ বড়োটার) দিকেই ধাবিত হতে পারে। ৫৯. (যখন তারা ফিরে এসে মূর্তিদের এ দুরবস্থা দেখলো,) তখন তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরণ করলো কে? যে-ই করেছে নিসন্দেহে সে যালেমদেরই একজন। ৬০. লোকেরা বললো, আমরা শুনেছি এক যুবক ওদের সমালোচনা করছিলো, (হ্যাঁ) সে যুবককে বলা হয় ইবরাহীম; ৬১. তারা বললো, (যাও) তাকে সব মানুষের চোখের সামনে এনে হাযির করো, যাতে করে তারা (তার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে। ৬২. (ইবরাহীমকে আনার পর) তারা (তাকে) জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের মাবুদগুলোর সাথে এ আচরণ করেছো; ৬৩. (সে বললো,) বরং ওদের বড়োটিই সম্ভবত (এসব কিছু) ঘটিয়েছে, তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো না, তারা যদি কথা বলতে পারে (তাহলে তারাই বলবে কে তাদের সাথে এ আচরণ করেছে)! ৬৪. (ইবরাহীমের এ অভিনব যুক্তি শুনে) তারা (নিজেরা চিন্তা করে) নিজেদের দিকেই ফিরে এলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো (যালেম তো সে নয়, যে ওটা ভেংগেছে), যালেম তো হচ্ছো তোমরা (যারা এর পূজা করো), ৬৫. অতপর (লজ্জায়) ওদের মাথা অবনত হয়ে গেলো, ওরা বললো (হে ইবরাহীম), তুমি তো (ভালো করেই) জানো, এরা কথা বলতে পারে না। ৬৬. সে বললো, তাহলে তোমরা কেন আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর পূজা করো যারা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, তোমাদের কোনো অপকারও করতে পারে না। ৬৭. ধিক তোমাদের জন্যে এবং আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করো তাদের জন্যেও; তোমরা কি (এদের এ অক্ষমতাটুকু) বুঝতে পারছো না।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۞ ٦٨ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ

بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۞ ٦٩ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۞ ٧٠

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۞ ٧١ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ

اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۞ ٧٢ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً

يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ

الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۞ ٧٣ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ

الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۞ ٧٤

وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ ٧٥ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۞ ٧٦

৬৮. (এ সময় রাজার) লোকেরা বললো, একে আগুনে পুড়িয়ে দাও, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে (আগে গিয়ে) তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করো। ৬৯. (অপরদিকে) আমি (আগুনকে) বললাম, হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও, ৭০. ওরা তার বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইলো, আর আমি (উল্টো) তাদের ক্ষতিগ্রস্ত (ও ব্যর্থ) করে দিলাম, ৭১. অতপর আমি তাকে এবং (আমার নবী) লূতকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি দুনিয়াবাসীর জন্যে অনেক কল্যাণ রেখেছি। ৭২. অতপর আমি ইবরাহীমকে (তার ছেলে হিসেবে) ইসহাক দান করলাম; তার ওপর অতিরিক্ত দান করলাম (পৌত্র হিসেবে) ইয়াকুব; এদের সবাইকেই আমি ভালো (মানুষ) বানিয়েছিলাম, ৭৩. আমি তাদের (দুনিয়ার মানুষদের) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) সুপথ দেখাতো, নেক কাজ করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি, তারা (সর্বত্রই) আমার আনুগত্য করতো। ৭৪. (ইবরাহীমের মতো) আমি লূতকেও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম, তাকেও আমি এমন একটি জনপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজ করতো; সত্যিই তারা ছিলো জঘন্য বদ ও গুনাহগার জাতি, ৭৫. আর আমি তাকে আমার (অপরিসীম) অনুগ্রহের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি; নিসন্দেহে সে ছিলো একজন সৎকর্মশীল (নবী)।

রুকু ৬

৭৬. (হে নবী, তুমি নূহের কাহিনীও তাদের শোনাও,) নূহ যখন আমাকে ডেকেছিলো, (ডেকেছিলো ইবরাহীমেরও) আগে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজনদের আমি এক মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَٰلِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَٰفِظِينَ ﴿٨٢﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا

৭৭. আমি তাকে এমন এক জাতির মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো; (আসলেই) তারা ছিলো বড়ো খারাপ জাতের লোক, অতপর আমি তাদের সবাইকে (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দিয়েছি। ৭৮. দাউদ ও সোলায়মানের ঘটনাও (তাদের শোনাও), যখন তারা একটি ক্ষেতের ফসলের (মোকদ্দমায়) রায় প্রদান করছিলো। (মোকদ্দমাটা ছিলো এমন), রাতের বেলায় (মানুষদের) কিছু মেষ (অন্য মানুষদের ক্ষেতে ঢুকে) তা তছনছ করে দিলো, এই বিচারপর্বটি আমি নিজেও তাদের সাথে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, ৭৯. অতপর আমি (সঠিক রায় যা–) তা সোলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, (অবশ্য) আমি তাদের (উভয়কেই) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম, আমি পাহাড় পর্বত এবং পাখ-পাখালিকেও দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম যেন তারাও (তার সাথে) আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারে; আর আমিই (এ সব কিছু) ঘটাচ্ছিলাম। ৮০. আর আমি তাকে তোমাদের (যুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছি, যাতে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের সময় (পরস্পরের আক্রমণ থেকে) নিজেদের বাঁচাতে পারো, তারপরও কি তোমরা (আমার) শোকরগোযার হবে না? ৮১. আমি প্রবল হাওয়াকে সোলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, তা তার আদেশে সে দেশের দিকে ধাবিত হতো যেখানে আমি প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছি; (মূলত) আমি প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারেই সম্যক অবগত আছি। ৮২ শয়তানদের মাঝে (তার) কিছু (জ্বিন অনুসারী) তার জন্যে (সমুদ্রে) ডুবুরীর কাজ করতো, তার জন্যে এ ছাড়াও এরা বহু কাজ আঞ্জাম দিতো, তাদের রক্ষক তো আমিই ছিলাম, ৮৩. (স্মরণ করো,) যখন আইয়ূব তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (আমায় তুমি) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু,

بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى
لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٨٥﴾
وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ
مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ
اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ
الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا
تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى
وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا

৮৪. অতপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিলো তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম। ৮৫. (আরো স্মরণ করো,) ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফলের (কথা), এরা সবাই (আমার) ধৈর্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, ৮৬. আমি তাদের আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করলাম, কেননা তারা ছিলো নেককার মানুষদের দলভুক্ত। ৮৭. আর (স্মরণ করো) 'যুন্নুন' (-এর কথা), যখন সে রাগ করে নিজের লোকজনদের ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছিলো, সে মনে করেছিলো আমি (বুঝি) তাকে ধরতে পারবো না (অতপর আমি যখন তাকে সত্যি সত্যিই ধরে ফেললাম), তখন সে (মাছের পেটের) অন্ধকারে বসে আমাকে (এই বলে) ডাকলো, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি, ৮৮. অতপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে আমি উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মোমেন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি। ৮৯. আর (স্মরণ করো,) যাকারিয়া (-র কথা), যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো, হে আমার মালিক, তুমি আমাকে একা (নিসন্তান করে) রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী, ৯০. অতপর আমি তার জন্যেও সাড়া দিয়েছিলাম, তাকে দান করেছিলাম (নেক সন্তান) ইয়াহইয়া এবং তার (মনের আশা পূরণের) জন্যে আমি তার স্ত্রীকে (বন্ধ্যাত্বমুক্ত করে সম্পূর্ণ) সুস্থ (সন্তান ধারণোপযোগী) করে দিয়েছিলাম; (আসলে) এ লোকগুলো (হামেশাই) সৎকাজে (একে অন্যের সাথে) প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকতো; তারা সবাই ছিলো

رَغَبًا وَّرَهَبًا ، وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا

فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً

وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾

আমার অনুগত (বান্দা)। ৯১. (স্মরণ করো সেই পুণ্যবতী নারীকে,) যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিলো, অতপর তার মধ্যে আমি আমার পক্ষ থেকে এক (বিশেষ সম্মানী) আত্মা ফুঁকে দিলাম, এভাবে আমি তাকে এবং তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্যে এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছিলাম। ৯২. (যাদের কথা আমি বললাম,) এ হচ্ছে তোমাদেরই স্বজাতি, এরা সবাই একই জাতি, আর আমি (এদের) তোমাদের সবাইর মালিক, অতএব তোমরা আমারই গোলামী করো।

তাফসীর

আয়াত ৪৮-৯২

সূরার এই তৃতীয় পর্বে নবী ও রসূলদের উম্মাতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এদের কারো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং কারো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও রসূলদের ওপর কতো সদয়, আর যারা নবী ও রসূলদেরকে অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে রয়েছে কী ভয়াবহ পরিণাম। অনুরূপভাবে কতিপয় নবী রসূলকে সুখ ও দুঃখ দিয়ে বিভিন্ন সময় কিভাবে পরীক্ষা করেছেন এবং তারা কিভাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারও বিবরণ এই সূরায় রয়েছে।

আরো রয়েছে যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকে নবী ও রসূল প্রেরণের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ও রীতি এবং সকল যুগের সকল নবীর আকীদা ও জীবন পদ্ধতির ঐক্যের কথাও। এই ঐক্যের ফলে নবী ও রসূলরা ও তাদের অনুসারীরা স্থান ও কালের ব্যবধান অতিক্রম করে একই জাতি ও উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

আর এই ঐক্য স্বয়ং আল্লাহর একত্বেরও অকাট্য প্রমাণ। এটা আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার একত্ব এবং প্রাকৃতিক নিয়মেরও একত্ব প্রমাণ করে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্ব জগতে কার্যকর আল্লাহর শাশ্বত বিধানের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে এবং তাকে একক মাবুদের অনুগত করে। 'আমি তোমাদের প্রভু। কাজেই আমার এবাদাত করো।'

তাওরাত ও কোরআনের অভিন্ন বৈশিষ্ট

'আমি মূসা ও হারুনকে সত্য মিথ্যায় পার্থক্যকারী, আলো ও স্মরণিকা দিয়েছিলাম আল্লাহভীরুদের জন্যে।'.......... *(আয়াত ৪৮, ৪৯ ও ৫০)*

ইতিপূর্বে এ সূরার বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোশরেকরা রসূল (স.)-কে এই বলে ব্যংগ-বিদ্রূপ করতো যে, একজন মানুষ হয়েও তিনি নাকি রসূল হয়েছেন! তারা তার ওহীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো, এটা যাদু অথবা কবিতা মনগড়া সাহিত্য।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা জানাচ্ছেন যে, মানুষ থেকে রসূল পাঠানো একটা চিরাচরিত রীতি। আর রসূলদের ওপর কেতাব নাযিল হওয়া কোনো বিস্ময়কর ও নতুন ব্যাপার নয়। মূসা ও হারুনকেও আল্লাহ তায়ালা কেতাব দিয়েছিলেন।

এই কেতাবের নাম 'আল ফোরকান'। এটা কোরআনেরও গুণবাচক নাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর কেতাবগুলোর নামেও ঐক্য রয়েছে। এই ঐক্য এভাবে রয়েছে যে, আল্লাহর নাযিল করা সব কটা কেতাবই কোরআন অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে, হেদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে এবং জীবন যাপনের ন্যায় ও অন্যায় পন্থার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। এই দিক দিয়ে সব কটা আসমানী গ্রন্থই 'ফোরকান'। এটা কোরআন ও তাওরাতের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তায়ালা তাওরাতকে 'আলো'ও বানিয়েছেন, যা দ্বারা হৃদয়ের অন্ধকার, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তার অন্ধকার এবং গোমরাহী ও বাতিলের অন্ধকার দূরীভূত করেছেন। এসব অন্ধকার মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় ও বিপথগামী করে দেয়। মানুষের হৃদয়ে যতোক্ষণ ঈমানের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত না হয়, ততোক্ষণ তার মন তমসাচ্ছন্ন থাকে। ঈমানের আলোই তার জীবন পথকে আলোকিত করে। ন্যায় ও অন্যায়কে স্পষ্ট করে দেয় এবং ভালো ও মন্দ মূল্যবোধের মিশ্রন ও জট পাকানোর সুযোগ খতম করে দেয়।

কোরআনের মতো তাওরাতকেও আল্লাহ তায়ালা 'আল্লাহভীরুদের জন্যে স্মরণিকা' বা গাইড বানিয়ে দিয়েছেন। এই গাইড তাদেরকে প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর কথা ও তাঁর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সাথে মানব সমাজেও আল্লাহভীরুদেরকে স্মরণীয় করে রাখে। তাওরাতের আগে বনী ইসরাঈলের অবস্থা কেমন ছিলো? তারা ছিলো ফেরাউনের স্বৈরাচারী শাসনের অধীন নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও লাঞ্ছিত। তাদের নারী সন্তানকে জীবিত রেখে পুরুষ সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো এবং তাদেরকে ব্যংগ-বিদ্রূপ ও উৎপীড়নের শিকার করা হতো।

এই আল্লাহভীরুদের গুণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, 'যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে।' কেননা আল্লাহকে না দেখা সত্ত্বেও যাদের অন্তরে তার ভয় জাগরুক থাকে, আর 'যারা কেয়ামতের ভয়ে শংকিত এবং সে জন্যে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি লাভের লক্ষ্যে কাজ করে ও প্রস্তুতি নেয়, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কেতাবের আলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং তার পথনির্দেশ অনুসারে চলে। এভাবে আল্লাহর কেতাব তাদের জন্যে স্মরণিকা হয়ে যায়। তা হলো তাদেরকেও যেমন আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি কেতাবের অনুসারীদেরকেও মানব জাতির কাছে স্মরণীয় করে রাখে।

মূসা ও হারুনের বিষয়ে আলোচনার পর বর্তমান গ্রন্থ কোরআনের প্রসংগ তোলা হয়েছে।

'আর এ হচ্ছে এক কল্যাণময় স্মরণিকা, যা আমি নাযিল করেছি।'

অর্থাৎ এটা কোনো অভিনব ও বিস্ময়কর কিছু নয়। এটা একটা চিরন্তন ও সুপরিচিত ধারা।

'তোমরা কি এটা অস্বীকার করতে চাও?'

এর কোনটা অস্বীকার করতে চাও? পূর্ববর্তী নবীরাও তো এরূপ কেতাব এনেছেন।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ.)—এর সংগ্রাম

হযরত মূসা ও হারুনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর শুরু হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনের একটা পূর্ণাংগ ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সমগ্র আরব জাতির শ্রেষ্ঠতম পূর্ব পুরুষ। তিনিই ছিলেন পবিত্র কা'বার নির্মাতা। যার ভেতরে কাফেররা বহুসংখ্যক মূর্তি স্থাপন করেছিলো এবং সেই মূর্তির পূজা করতো। হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তি ভেংগেছেন। আলোচ্য

আয়াতগুলোতেও তাঁকে এভাবেই পেশ করা হয়েছে যে, তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ করেন এবং মূর্তিকে ভাংতেও দ্বিধা করেন না।

এখানে কাহিনীটা যে নবুওত ও রেসালাত সংক্রান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কাহিনী কয়েকটা ধারাবাহিক দৃশ্যপটে বিভক্ত, যার মাঝে মাঝে সামান্য কিছু ঘটনা উহ্য রয়েছে। এই কাহিনীর সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আগেই সত্যের অর্থাৎ তাওহীদের সন্ধান দেয়া হয়েছিলো। বস্তুত এটাই সবচেয়ে বড়ো সত্য, যাকে এখানে 'রুশদ' শব্দটা দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

'আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সত্যের সন্ধান দিয়েছিলোম এবং তার সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম।'

অর্থাৎ তার অবস্থা জানতাম এবং নবী ও রসূলদের যে দায়িত্ব বহন করতে হয়, সেই দায়িত্ব বহনে তার যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম।

'যখন সে তার পিতাকে ও জনগণকে বললো, এই মূর্তিগুলো কী যে তোমরা এগুলোর বন্দনায় পড়ে রয়েছো?'

ইবরাহীম (আ.)-এর এই উক্তিটাই প্রমাণ করেছিলো যে, তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। পাথর ও কাঠের তৈরী মূর্তিগুলোকে তিনি দেবতা নামে আখ্যায়িত না করে মূর্তি বলে অভিহিত করেছেন এবং তার বন্দনার প্রতি কটাক্ষ করছেন। 'আকেফুন' শব্দটা দ্বারা অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক বন্দনা বুঝায়। যদিও মোশরেকেরা সর্বক্ষণ মূর্তিপূজা করে না, কিন্তু সে মূর্তির প্রতি তারা সর্বক্ষণ ভক্তি ও অনুরাগ পোষণ করে। তাই এটাকে কার্যত সার্বক্ষণিক পূজা বন্দনা হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। এই ভক্তি ও অনুরাগের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন এবং সর্বক্ষণ মূর্তিগুলোর পূজা নিয়ে পড়ে থাকে– এরূপ মন্তব্য করে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

তাদের একমাত্র জবাব ও যুক্তি ছিলো এই-

'তারা বললো, আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদের এগুলোর পূজো করতে দেখেছি।'

এ জবাব থেকে বুঝা যায় যে, তাদের মূর্তি পূজার পেছনে কোনো যুক্তি ছিলো না। ছিলো শুধু প্রাণহীন ঐতিহ্যের ছকে আবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্বিক গোয়ার্তুমী। ছিলো না ঈমানের স্বাধীনতা, ছিলো না দৃষ্টি ও চিন্তার স্বাধীনতা, ছিলো না প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও মূল্যবোধের পরিবর্তে প্রকৃত মূল্যবোধের আলোকে পরিস্থিতি ও জিনিসপত্রের মূল্যায়ন। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো পুরুষানুক্রমিক ও কল্পনাসর্বস্ব ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অযৌক্তিক একগুয়েমি থেকে মুক্তি লাভ,

'ইবরাহীম বললো, তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।'

বস্তুত পূর্ব পুরুষদের পূজা উপাসনার দরুণ এসব মূর্তি এমন কোনো মর্যাদা ও ধর্মীয় গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হয় না, যার অধিকারী তারা আসলেই নয়। পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ থেকে কোনো কিছুর মর্যাদার সৃষ্টি হয় না। একমাত্র মুক্ত ও স্বাধীন বিচার বিবেচনা ও মূল্যায়ন দ্বারাই কোনো জিনিসের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাদের কাছে এই মুক্ত ও স্বাধীন বিচার বিবেচনার আবশ্যকতা তুলে ধরলেন এবং ফয়সালার এই স্বচ্ছতা কামনা করলেন, তখন তারা প্রশ্ন তুললো,

'তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছো, নাকি (আমাদের সাথে) তামাশা করছো?'

এটা এমন অস্থিরমতি লোকদের জিজ্ঞাসা, যারা নিজেদের ধারণা বিশ্বাস নিয়ে সংশয়াপন্ন থাকে। কেননা তা নিয়ে তারা চিন্তাগবেষণা করেনি এবং কোন ধারণা সঠিক, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়নি। তবে ভিত্তিহীন অলীক ধ্যান ধারণা ও পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের প্রভাবে তার বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তা চেতনাও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কেননা কোন কথা সঠিক তা সে জানে না। আর এবাদত উপাসনা শুধুমাত্র নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করা সম্ভব, যুক্তি প্রমাণহীন নড়বড়ে ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে নয়। এ কারণেই যারা আপন বিবেক বুদ্ধির কাছে সন্দেহাতীতভাবে সঠিক ও স্বচ্ছ তাওহীদ বিশ্বাসের অনুসারী নয়, তারা এক কুলকিনারাহীন মরীচীকার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন এর বিপরীত। তিনি আল্লাহকে চিনতেন এবং তাঁর প্রতি তার বিশ্বাস ছিলো অবিচল ও সন্দেহাতীত। সে বিশ্বাস প্রতিফলিত হতো তার চিন্তায় চেতনায় ও বক্তব্যে। তাই তার মতো নিশ্চিত ঈমানধারী মোমনদের পক্ষে যে বলা স্বাভাবিক, তিনিও তাই বলেছিলেন।

'ইবরাহীম বললো, আসলে তোমাদের প্রভুতো তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। এ ব্যাপারে আমি একজন সাক্ষী।'

অর্থাৎ আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের প্রভু ভিন্ন ভিন্নজন নয় বরং একই জন। তার প্রভুত্বের কারণ শুধু এই যে, তিনি এ সবের সৃষ্টিকর্তা। বস্তুত আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা-এই দুটো বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য। এ সংক্রান্ত বিশ্বাসটাও ধ্রুব সত্য ও বিশুদ্ধ। অথচ মোশরেকরা বিশ্বাস করে যে, তাদের সেসব দেবতারা ও মূর্তিগুলোই তাদের প্রভু ও বিধাতা। অথচ তারা এটাও জানে ও বিশ্বাস করে যে, দেবতারা বা মূর্তিগুলো কিছুই সৃষ্টি করে না এবং করতেও পারে না, বরং সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এটা জানা সত্তেও তারা সেসব অক্ষম দেব-দেবী ও বিগ্রহের পূজা করে।

এই সত্যের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রত্যয় ছিলো একটা সন্দেহাতীত বাস্তব ঘটনার চাক্ষুস দর্শকের মতো। তাই তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি একজন সাক্ষী।'

এ কথা সত্য যে, ইবরাহীম (আ.) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার নিজের ও তার জাতির সৃষ্টির ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেননি। কিন্তু ঘটনাটা এতো স্পষ্ট ও এমন ধ্রুবসত্য যে, এর প্রতি বিশ্বাসীরা বলিষ্ঠভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে। বিশ্ব চরাচরের যেখানে যা কিছু আছে, তা সমগ্র বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও পরিচালকের একত্বের সাক্ষ্য দেয়। অনুরূপভাবে, মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে যেখানে যা কিছুই আছে তাও তাকে বিশ্বের স্রষ্টা ও বিধাতার একত্ব মেনে নিতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি যে প্রাকৃতিক নিয়ম বিশ্ব জগতকে পরিচালনা করে তাকেও এক ও অভিন্ন বলে স্বীকৃতি দিতে প্রেরণা যোগায়।

এরপর ইবরাহীম (আ.) তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত স্বজাতীয়দেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন, যা আর কখনো প্রত্যাহার করা হবে না,

'আল্লাহর কসম, তোমরা এখান থেকে সরে গেলে আমি তোমাদের মুর্তিগুলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবোই।'

এ সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করবেন তা স্পষ্টভাবে জানাননি। আর এই হুমকির কী জবাব তার জাতি দিয়েছিলো, কোরআন তারও উল্লেখ করেনি।

সম্ভবত তারা ইবরাহীম (আ.)-কে কিছুই বলেনি। কারণ তারা নিশ্চিত ছিলো যে, তিনি তাদের মূর্তিগুলোর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না।

'অতপর সে মূর্তিগুলোকে চুরমার করে দিলো তাদের বড়োটা ছাড়া, যাতে তারা তার কাছে (জিজ্ঞাসার জন্যে) ফিরে আসে।' (আয়াত ৫৮)

যেসব মূর্তি এতো দিন দেবতা হিসেবে পূজো উপাসনা পেয়ে আসছিলো, তারা কতকগুলো ছিন্নভিন্ন পাথর ও কাঠের টুকরোয় পরিণত হলো। কেবল বড়ো মূর্তিটাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) অক্ষত রেখে দিলেন। 'যাতে জনগণ তার কাছে ফিরে আসে' অতপর তাকে জিজ্ঞেস করে যে, এমন একটা দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটলো এবং সে উপস্থিত থেকেও কেন ছোটো খাটো মূর্তিগুলোকে রক্ষা করলো না? তিনি ভেবেছিলেন যে, ওকে যখন ওরা জিজ্ঞেস করবে, তখনই পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তারা ভাববার অবকাশ পাবে, প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবে এবং বুঝবে যে, এই সব মূর্তির পূজা করাটা নিতান্তই বোকামি ও ফালতু কাজ।

যথাসময়ে তারা ফিরে এসে দেখতে পেলো তাদের বড়ো মূর্তিটা ছাড়া আর সবগুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তারা বড়ো মূর্তিটার কাছেও জিজ্ঞেস করলো না। নিজেরাও ভেবে দেখলো না যে, এরা যদি দেবতা হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ওপর এমন সর্বনাশা আঘাত নেমে এলো কি করে এবং তারা সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলো না কেন? বড়ো দেবতাটাই বা কি করে নিজেকে ও অন্যদেরকে রক্ষা না করে বসে থাকলো? এ প্রশ্নটা তাদের মাথায় আসেনি। কেননা কুসংস্কার তাদের বিবেক বুদ্ধির চিন্তা করার শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলো। পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ তাদের মনমগয থেকে চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। তবুও প্রশ্নটা স্বভাবতই না উঠে পারেনি। যে ব্যক্তি তাদের দেবতাদেরকে ধ্বংস করেছে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব নিয়েই তারা প্রশ্ন তুললো,

'তারা বললো, আমাদের দেবতাদের সাথে এমন আচরণ কে করলো? সে নিশ্চয়ই একজন যুলুমবাজ।'

অনেকে ইতিপূর্বে শুনেছিলো যে, ইবরাহীম (আ.) তার বাবা ও তার বাবার ঘনিষ্ঠজনদের মূর্তিপূজোয় আপত্তি তুলেছে এবং হুমকিও দিয়েছে যে, তারা যখন মূর্তিগুলোর কাছ থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে, তখন সে মূর্তিগুলোর ক্ষতি সাধন করবে। যারা এ খবর শুনেছিলো তাদের এবার মনে পড়ে গেলো।

'তারা বললো, আমরা ইবরাহীম নামক এক যুবকের কথা শুনেছি। সে নাকি এদের সম্পর্কে নানা কথা বলে।'

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইবরাহীম (আ.) এ সময় একজন তরুণ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে সত্যের জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই তিনি মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন এবং মূর্তিগুলোকে এভাবে ধ্বংস করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, তিনি কি ওই সময়ে ওহী ও নবুওত লাভ করেছিলেন? নাকি নবুওতের পূর্বেই তিনি এই আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এই সত্যজ্ঞান লাভ করেন, সেই দিকেই তিনি তার পিতাকে দাওয়াত দেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি তার জাতির অনুসৃত পৌত্তলিকতার সমালোচনা করেন?

শেষোক্ত ধারণাটা অগ্রগণ্য।

এমনও হতে পারে যে, 'আমরা ইবরাহীম নামক এক যুবকের নাম শুনেছি'– এই কথাটা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে গুরুত্বহীন ও অবিপজ্জনক বলে বুঝানো হয়েছে। এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণাটাই অগ্রগণ্য মনে হয় যে, তিনি ওই সময় একজন অল্পবয়সী তরুণ ছিলেন।

'তারা বললো! তাহলে তাকে জনগণের সামনে হাযির করো। হয়তো বা তারা সাক্ষ্য দেবে।' (আয়াত ৬১)

এ বক্তব্য দ্বারা আসলে ইবরাহীম ও তার কাজটা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছিলো।

'তারা বললো, হে ইবরাহীম, আমাদের দেবতাদের সাথে এই কান্ডটা কি তুমি করেছো?

মূর্তিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে থাকা সত্তেও তারা ওগুলোকে দেব-দেবী হিসেবে মানা অব্যাহত রাখলো। অথচ ইবরাহীম (আ.) তাদের প্রতি কটাক্ষ করতে ও উপহাস করতে লাগলেন। তিনি একা আর ওরা সংখ্যায় বহু জন। তবু তিনি কিছুমাত্র দমলেন না। কারণ তিনি মুক্ত বুদ্ধি ও অকুণ্ঠ বিবেক দ্বারাই ব্যাপারটা দেখছিলেন। তাই তিনি তাদের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস না করে থাকতেই পারছিলেন না। আর তাদের এই নিম্নমানের বুদ্ধির সাথে সংগতি রেখেই তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন,

'ইবরাহীম বললো, বরঞ্চ ওদের মধ্যকার সে বড়োটাই এ কান্ড ঘটিয়েছে! কাজেই ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো যদি তারা কথা বলতে পারে।'

এই বিদ্রূপাত্মক জবাবে সুস্পষ্ট কটাক্ষপাত ছিলো। কাজেই এ উক্তিটাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা উক্তিরূপে চিহ্নিত করা ও নানারকমের যুক্তি দিয়ে তার কারণ দর্শানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা এর চেয়ে অনেক সহজ। তিনি তাদেরকে যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, এই মূর্তিগুলো জানেই না ওদেরকে কে ধ্বংস করেছে, আমি না সে বড়ো মূর্তিটা, যে কিনা নড়তে চড়তেই পারে না। ওগুলো তো একেবারেই জড় পদার্থ, যার আদৌ কোনো অনুভূতি ও বোধশক্তি নেই। তোমরাও তো ওই জড় মূর্তিগুলোর মতো বোধশক্তি হারিয়ে বসেছো। ফলে ন্যায় অন্যায় অবৈধ ও বৈধের বাছ-বিচার করো না। ফলে মূর্তিগুলো আমি ধ্বংস করেছি, না এই বৃহৎ মূর্তিটা ধ্বংস করেছে তা তোমরা জানোই না।

'কাজেই ওরা যদি কথা বলতে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে ওদেরকেই জিজ্ঞেস করো।'

মনে হয়, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। পরের আয়াত থেকেই এটা মনে হয়।

'অগত্যা তারা চিন্তা-ভাবনা করে বললো, তোমরাই যুলুমবাজ।'

তাদের এই উক্তিটা ছিলো একটা শুভলক্ষণ। এ দ্বারা ধারণা হচ্ছিলো যে, তারা তাদের কার্যকলাপের ভ্রান্তি বুঝতে পারবে এবং মূর্তিপূজো যে কতো বড়ো অন্যায় ও যুলুম, তা উপলব্ধি করতে পারবে।

কিন্তু না। ওটা ছিলো এক মুহূর্তের একটা আলোর ঝলকানি। এরপরই তাদেরকে আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেললো এবং এক মুহূর্তের জাগরণের পর তাদের বিবেক আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

'অতপর তারা মাথা নুইয়ে ফেললো এবং বললো, 'হে ইবরাহীম, তুমি তো জানো যে, এসব মূর্তি কথা বলতে অক্ষম।'

সত্যিই তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিলো জাগরণ সূচক এবং দ্বিতীয়টা ছিলো সাবেক মতে প্রত্যাবর্তন সূচক। কোরআনের অপরূপ বাচনভংগী এর খুবই চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছে। প্রথমটা ছিলো মনোজগতে চিন্তাভাবনার উদ্রেককারী একটা আলোড়ন। আর দ্বিতীয়টা ছিলো মস্তিষ্কের একটা পাল্টা বিপ্লব, যা সমস্ত চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধি চর্চার পথ রুদ্ধ করে দেয়। নচেৎ তাদের এই

সর্বশেষ উক্তিটা তাদেরই বিপক্ষের যুক্তি। মূর্তিগুলো কথা বলতে না পারার চেয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্যের পক্ষে আর কী হতে পারে।

এ কারণেই অতীব সহনশীল ও বিনম্র স্বভাবের মানুষ হয়েও হযরত ইবরাহীম (আ.) এরূপ বিরক্তিসূচক ও কঠোর মন্তব্য করলেন। কেননা এখানে যে হীনতা ও গোয়ার্তুমি প্রকাশ করা হয়েছে, তা ধৈর্যশীল ব্যক্তির ধৈর্য ও সহনশীলতাকেও হার মানিয়েছে।

'ইবরাহীম বললো, তবে কি যা তোমাদের কোনোই লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। তার উপাসনা তোমরা করবেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে? তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যেগুলোর উপাসনা করছো তার প্রতি ধিক্কার। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?'

এ কথাটার ভেতর দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হীনতা ও গোয়াতুর্মির প্রতি বিরক্তি, ঘৃণা এবং বিস্ময় ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

অগ্নিকুণ্ড যখন শান্তির নিবাসে পরিণত হয়

হঠকারী স্বভাবের স্বেচ্ছাচারী একনায়ক যেমন যুক্তি প্রমাণ হাতছাড়া হয়ে গেলে দিশেহারা ও বেশামাল হয়ে পড়ে এবং তার আত্মাভিমান তাকে পাপ কাজে প্ররোচিত করে, ঠিক তেমনি তারাও আত্মাভিমানী হয়ে উঠলো। ফলে তারা আগ্রাসী ক্ষমতার দাপট দেখাতে ও নিপীড়ণমূলক কর্মকান্ড করতে উদ্যত হলো,

'তারা বললো, ওকে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাকে সাহায্য করো, যদি যথার্থই কিছু করতে চাও।'

কী বিস্ময়কর এই মোশরেকদের মাবুদ যে, তারা তাদের বান্দাদেরই সাহায্য করতে যাবে না। নিজেদের ও তাদের উপাসকদের সাহায্য করা দূরে থাক, নিজেদের সামান্যতম লাভক্ষতিও তারা করতে পারে না।

তারা আদেশ দিলো বটে, 'ওকে জ্বালিয়ে দাও।' কিন্তু অপরদিক থেকে আরেকটা আদেশ দেয়া হলো, যা অন্য সকল আদেশ ও সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। কেননা সেটাই সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে বলিষ্ঠ আদেশ যাকে অকার্যকর বা বাতিল করার ক্ষমতা কারো নেই। সেই আদেশটা হলো,

'আমি আদেশ দিলাম, হে আগুন, ইবরাহীমের প্রতি তুমি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।'

যথার্থই তা ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি শীতল ও শান্তিময় হয়ে গেলো।

কিভাবে আগুন শীতল হলো?

শুধু আগুন নিয়েইবা এ প্রশ্ন কেন? আসলে 'হয়ে যাও' এই শব্দটাই এমন যে, আল্লাহ তায়ালা এটা উচ্চারণ করা মাত্রই বিশাল বিশাল জগত সৃষ্টি হয়ে যায়।

কাজেই আমাদের এ প্রশ্ন করা চাই না যে, আগুন কেন ইবরাহীম (আ.)-কে পোড়ালো না, অথচ এটা চাক্ষুস সত্য ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, আগুন জীব দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়, বস্তুত যিনি আগুনকে পোড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন, তিনিই আগুনকে শীতল ও শান্তিময় হতে আদেশ দিয়েছেন। একই কথা, যা বলার পর কোথাও মানুষ যা দেখতে অভ্যস্ত তাই হয়, আবার কোথাও যেটা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয় সেইটে হয়।

যারা আল্লাহর কাজকে মানুষের কাজের সমতুল্য ভাবে, তারা জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো? ওটা কিভাবে সম্ভব হলো? যারা এই দুই কাজের প্রকৃতি এবং দুই কাজের উপকরণ সম্পর্কে

অবগত আছেন, তারা এ প্রশ্ন একেবারেই করেন না। তারা বৈজ্ঞানিক কিংবা অবৈজ্ঞানিক কোনো ধরনেরই কারণ দর্শান না। কারণ বিষয়টা মানবীয় মাপকাঠিতে মাপার মতো বিষয়ই নয়। এ ধরনের মোজেযাগুলোকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা না করা মৌলিকভাবে একটা ভ্রান্ত নীতি। কেননা আল্লাহর কাজকে মানবীয় মাপকাঠিতে মাপা এবং তাদের সীমিত জ্ঞান ও বিদ্যার আলোকে যাঁচাই করা অসম্ভব।

আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু এতোটুকু বিশ্বাস করা যে, ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে। কেননা সে ব্যাপারটার স্রষ্টা ওটাকে সংঘটিত করতে সক্ষম। তবে আল্লাহ তায়ালা আগুনকে কিভাবে তৈরী করলেন যে, তা ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীকে পরিণত হয়ে গেলো? তিনি কিভাবে ইবরাহীম (আ.)-কে তৈরী করেছিলেন, যে আগুন তাকে পোড়াতে পারলো না? এ প্রশ্নে কোরআন নীরব। কেননা মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা সেটা বুঝা সম্ভব নয়। অপরদিকে কোরআনের উক্তি ছাড়া আমাদের হাতে এর কোনো প্রমাণও নেই।

আগুনকে ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে ঠান্ডা করে দেয়া ও নিরাপদ করে দেয়ার ঘটনাটা ছিলো এমন একটা দৃষ্টান্ত, যার নযীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু সেসব ঘটনা এ ঘটনার মতো আলোড়ন সৃষ্টি করে না। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের ওপর অনেক সময় এমন বিপর্যয় নেমে আসে, যা সে ব্যক্তি বা দলকে একেবারেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো, কিন্তু কার্যত তা একটা ক্ষুদ্র আলোড়ন সৃষ্টি করে মাত্র। এমনকি তা সে ব্যক্তি বা দলকে ধ্বংস করার পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে আরো জীবন্ত ও উদ্দীপিত করে দিয়ে যায়। ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা হওয়া সত্তেও তা তার প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

বস্তুত 'হে আগুন ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও' কথাটা বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের জীবনে এবং আকীদা বিশ্বাস, মতবাদ ও দাওয়াতের জীবনে বারবার এসে থাকে। সে ক্ষেত্রে এ কথাটা আসলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সেই চূড়ান্ত দিক নির্দেশক বাণীরই প্রতীক হয়ে থাকে, যে বাণী অন্য সকল বাণীকে এবং সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। কেননা সে বাণীই সর্বোচ্চ। তাকে কেউ অকার্যকর বা বাতিল করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য,

'আর তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকালো, ফলে আমি তাদেরকে সর্বাধিক ব্যর্থ ও বিফল করে দিলাম।'

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম-সাময়িক সম্রাট নমরূদ উপাধিতে ভূষিত ছিলো। ছিলো ইরাকের আরামীয় জাতির রাজা। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া আযাবে সে তার দলবলসহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এই আযাবের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, যার কোনোটা সম্পর্কেই কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। কেবল এতোটুকু জেনে রাখাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে এমন বিপর্যয়ের কবলে ফেলেছিলেন, যার চেয়ে বড়ো কোনো বিপর্যয় থাকতে পারে না। সেই বিপর্যয়টা কি ধরনের ছিলো, তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি, অনির্দিষ্টভাবে রেখে দেয়া হয়েছে, এরপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর আমি তাকে ও লূতকে রক্ষা করলাম এবং সেই দেশে পাঠালাম যার ওপর আমি জগতবাসীর জন্যে কল্যাণ অবতীর্ণ করেছি।'

এটা হচ্ছে সিরিয়া। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত হিজরত করে চলে গেলেন। ওই দেশটা দীর্ঘকাল ওহী অবতরণের স্থান হিসেবে বহাল ছিলো এবং হযরত

ইবরাহীম (আ.)-এর বংশোদ্ভূত নবী ও রসূলদের আবাসভূমি ছিলো। ওখানেই পবিত্র ভূমি ও দ্বিতীয় কেবলা অবস্থিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওহী ও নবুওতের বরকত ছাড়াও জীবিকার প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতার দিক দিয়েও দেশটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রেখেছিলো।

'তাকে আমি ইসহাক ও ইয়াকুব দিয়েছিলাম.............' (আয়াত ৭২-৭৩)

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ পরিবার, জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে বিনিময়ে তার মাতৃভূমির চেয়েও কল্যাণময় দেশ দান করেন, তার পরিবারের চেয়েও উত্তম পরিবার তথা ইসহাক (আ.)-এর ন্যায় সন্তান ও ইয়াকুব (আ.)-এর ন্যায় পৌত্র দান করেন। তার বংশধর থেকে তিনি এমন এক বিশাল জাতির সৃষ্টি করেন, যা তার পূর্বতন জাতির চেয়েও উত্তম ছিলো। তার বংশে আল্লাহ তায়ালা এমন এক দল মহা মানব সৃষ্টি করেন, যারা আল্লাহর আদেশ অনুসারে মানুষকে সুপথে চালাতেন, তাদের ওপর সব রকমের সৎ কাজের নির্দেশ সম্বলিত ওহী পাঠাতেন, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে আদেশ দিতেন এবং তারা সবাই ছিলো আল্লাহর অনুগত বান্দা। এটা কতো সুন্দর বিনিময় এবং কতো সুন্দর প্রতিদান ছিলো! আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জীবনের প্রথম ভাগে নানা বিপদ আপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। ধৈর্যধারনের মাধ্যমে তিনি সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাই শেষ জীবনে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ধৈর্যের প্রতিদান হিসেবে সর্বদিক দিয়েই সুখ শান্তি দান করেন।

'আর আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাকে ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদের গ্রাম থেকে উদ্ধার করেছিলাম ....।' (আয়াত ৭৪-৭৫)

ইতিপূর্বে হযরত লূতের কাহিনী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে কেবল সে কাহিনীর প্রতি ইংগিত করেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। তিনি তার চাচা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ইরাক থেকে সিরিয়া যান। অতপর সদোম নগরীতে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে জঘন্য নোংরা কাজের প্রচলন ছিলো সেখানকার লোকেরা পুরুষে পুরুষে প্রকাশ্যে নির্দ্বিধায় ও নিসংকোচে সমকামে অভ্যস্ত ছিলো। আল্লাহ তায়ালা ওই নগরী ও তার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। 'তারা দুষ্কৃতকারী ফাসেক জাতি ছিলো।' আল্লাহ তায়ালা লূতকে ও তার পরিবারকে উদ্ধার করেন। কিন্তু তার স্ত্রীকে উদ্ধার করেননি।

'তাকে আমার রহমতের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছিলাম। সে সৎকর্মশীল ছিলো।' আল্লাহর রহমত হলো নিরাপদ আশ্রয়। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন এই আশ্রয়ে প্রবেশ করান। যে এখানে আশ্রয় পায় সে হয়ে যায় নিরাপদ।

হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ইংগিত দেয়া হয়েছে,

'নূহের কথা স্মরণ করো, যখন সে ইতিপূর্বে আহ্বান জানালো, আমি তার দোয়া গ্রহণ করলাম...........' (আয়াত ৭৬-৭৭)

এখানেও কোনো বিশদ বিবরণ নেই। শুধু তার দোয়া কবুল করা হয়েছিলো এই বিষয়টা তুলে ধরার জন্যেই এটুকু ইংগিত দেয়া হয়েছে। তিনি হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্ববর্তী। তাকেও আল্লাহ তায়ালা তার পরিবারসহ রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর ছেলেকে রক্ষা করেননি। তার জাতিকে প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সূরা হুদে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

লৌহশিল্পের জনক সুকণ্ঠি নবী হযরত দাউদ (আ.)

এরপর হযরত দাউদ ও সোলায়মানের কাহিনীর কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে, 'আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২)

কৃষি খামার সংক্রান্ত যে ঘটনায় হযরত দাউদ ও সোলায়মান বিচারক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সে সম্পর্কে এমন কিছু শ্রুতিকথা পাওয়া যায় যে,

'একদিন হঠাৎ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। তাদের একজন ছিলো একটা কৃষি খামারের মালিক। মতান্তরে সে ছিলো একটা আংগুর বাগানের মালিক। অপরজন এক পাল মেষের মালিক। খামার মালিক মেষের মালিককে দেখিয়ে বললো, এই ব্যক্তির মেষপাল রাতের বেলা আমার ক্ষেতে ঢুকেছে এবং ক্ষেতের সমস্ত ফসল খেয়ে শেষ করেছে। হযরত দাউদ ক্ষেত মালিকের পক্ষে এই মর্মে রায় দিলেন যে, সে তার নষ্ট হওয়া ফসলের বিনিময়ে অভিযুক্তের মেষগুলো নিয়ে যেতে পারে। মেষমালিক চলে যাওয়ার সময় হযরত সোলায়মানের সাথে তার দেখা হলো। সে তাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালার কথা জানালো। হযরত সোলায়মান পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি যে ফয়সালা করেছেন তা সঠিক হয়নি। তিনি বললেন, তাহলে কিভাবে ফয়সালা করলে সঠিক হবে? হযরত সোলায়মান বললেন, মেষপালকে খামার মালিকের হাতে সাময়িকভাবে দিয়ে দিন সে তা দ্বারা উপকৃত হতে থাকুক। আর খামারটা মেষ মালিকের হাতে অর্পণ করুন, সে ওটা পরিচালনা করতে থাকুক। যতোক্ষণ না তা সাবেক অবস্থায় ফিরে যায়। তারপর উভয়ে তার জিনিস সাবেক মালিককে ফিরিয়ে দেবে। খামারের মালিক খামার এবং মেষ মালিক মেষ ফেরত পাবে। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, তোমার ফয়সালাই সঠিক। অতপর সোলায়মানের রায়টাকেই কার্যকরী করলেন।

হযরত দাউদ ও সোলায়মান উভয়ের ফয়সালাই ছিলো তাদের ইজতেহাদ তথা নিজস্ব চিন্তা গবেষণার ফল। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের রায় দানের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সোলায়মানকে অধিকতর প্রজ্ঞাময় ও অধিকতর নির্ভুল রায় কী হবে তা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন।

হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রায়ে খামার মালিককে একটা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থেকেছিলেন। এতে শুধু ন্যায় বিচারের দাবীই পূর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু হযরত সোলায়মান যে রায় দিলেন, তাতে ন্যায় বিচারের সাথে সাথে গঠনমূলক ব্যবস্থাও যুক্ত ছিলো। ন্যায়বিচারকে গঠন ও উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করলেন। এটা ছিলো ইতিবাচক, গঠনমূলক ও জীবন্ত রায়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন এভাবে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দেন।

হযরত দাউদ ও সোলায়মান উভয়কেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিলো। হযরত দাউদের বিচারে কোনো ভুল ছিলো না। কিন্তু সোলায়মানের বিচার ছিলো বিশুদ্ধতর। কেননা তা এসেছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের (সুপ্ত ওহী) আকারে।

এরপর উভয়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে, প্রথমে পিতার বৈশিষ্ট্য

'আমি পাহাড়গুলোকে ও পাখিকুলকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা সবাই আল্লাহর গুণগান করতো এসব আমিই করেছিলাম। আর তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে। তাহলে তোমরা কি শোকর করবে?'

দাউদ (আ.) তার সুমধুর সূরের জন্যে খ্যাত হয়ে আছেন। তিনি মধুর সূরে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করতেন, তার চারপাশের প্রকৃতিতে তা প্রতিধ্বনি তুলতো এবং পাহাড় ও পাখিরা তার সাথে সমস্বরে মুখরিত হতো।

যখন কোনো বান্দার অন্তর আল্লাহর সাথে মিলিত হয়, তখন সে নিজেকে গোটা সৃষ্টি জগতের সাথেই যুক্ত বলে অনুভব করে। তাই গোটা সৃষ্টি জগতের হৃদয় তার সাথে সাথে স্পন্দিত হয়। বিভিন্ন জাত ও প্রকারের সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান পার্থক্য, ভেদাভেদ, প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা

থেকে দূরত্ব ও প্রভেদ সৃষ্টি হয়, তা নিমিষেই দূরীভূত হয়ে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সকল সৃষ্টি মহাবিশ্বের বিশাল প্রান্তরে একই সমতলে সমবেত হয়ে একদেহে ও এক আত্মায় পরিণত হয়ে যায়। আত্মা যখন ঐশী জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়, তখন তা নিজেকে সমগ্র সৃষ্টির সাথে একাত্ম ও সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলীন বলে অনুভব করে। তখন সে কোনো জিনিসকেই নিজের বাইরে এবং নিজেকে পারিপার্শিক কোনো জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। সমগ্র পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তার মধ্যে এবং সমগ্র পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতায় সে বিলীন হয়ে যায়।

পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে আমরা হযরত দাউদের এমন এক চিত্র কল্পনা করতে পারি, যেন তিনি সমধুর সুরে ঐশী কেতাব তেলাওয়াত করছেন, তেলাওয়াত করতে গিয়ে তিনি নিজের স্বতন্ত্র সত্ত্বাকে ভুলে বসে আছেন এবং তাঁর আত্মা সমগ্র বিশ্বের প্রাণী ও বস্তুসমূহের সাথে মিলে মিশে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সিক্ত ছায়াতলে সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। এর ফলে সমগ্র সৃষ্টিজগত তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাচ্ছে, তার সুরে মুখরিত হচ্ছে এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা, গুণগান ও প্রশংসা করছে। আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন, 'এমন কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহর প্রশংসা সহকারে মহিমা বর্ণনা করে না। তবে তোমরা তাদের মহিমা বর্ণনা বুঝতে পার না।' .... বস্তুত জড় জীবন ও উদ্ভিদ নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর যে প্রশংসা ও গুণবর্ণনা করে, তা শুধু সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারে, যে নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে না এবং মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

'দাউদের জন্যে অনুগত করে দিয়েছি পাহাড় পর্বত ও পাখিকূলকে। তারা সকলেই আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। এ সব কিছু আমিই করেছি।'

অর্থাৎ আল্লাহর শক্তির সামনে দম্ভ প্রকাশ করতে পারে কিংবা তার ইচ্ছা পূরণ করতে অস্বীকার করতে পারে এমন কোনো জিনিস কোথাও নেই,–মানুষের পরিচিত বা অপরিচিত কিছুই নয়।

'আর আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম বানানো শিখিয়েছি, যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধ–বিগ্রহ থেকে নিরাপদে রাখে। তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে?'

এ হচ্ছে পরস্পরে আবদ্ধ রিং দ্বারা তৈরী লৌহ বর্মের শিল্প। এ বর্ম ইতিপূর্বেকার ঢালাও লোহার পাত দিয়ে তৈরী লৌহ বর্মের চেয়ে সহজে ও অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য ও ঢিলা ঢালা। সম্ভবত হযরত দাউদ (আ.) সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকার আলোকে এই উন্নতমানের বর্ম তৈরী করেছিলেন। মানুষকে যুদ্ধের দৈহিক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা এই বর্ম বানানো শিখিয়ে সমগ্র মানব জাতির উপকার সাধন করেন, 'যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নিরাপদে রাখে।' এরপর উদ্বুদ্ধকরণের ভংগীতে প্রশ্ন করেন, 'তবে কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে?'

মানব সভ্যতা রকমারি আবিষ্কার উদ্ভাবনের পথে ধাবিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ও ধীরে ধীরে রাতারাতি নয়। কেননা পৃথিবীর খেলাফত তথা শাসন পরিচালনার দায়িত্বটা মানুষের জন্যেই রেখে দেয়া হয়েছে। আর এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে উপযুক্ত মেধা ও যোগ্যতাও দিয়েছেন, যাতে সে জীবনকে প্রচলিত ধারার সাথে সমন্বিত করতে প্রতিদিন কিছু না কিছু সামনে অগ্রসর হতে পারে। নতুন বিধি ব্যবস্থা অনুসারে জীবনকে সমন্বিত করা ও সাজানো মানুষের পক্ষে সহজ কাজ নয়। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে নিজের ভেতরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে ও প্রচুর পরিবর্তন আনতে হয়, আদত অভ্যাস পাল্টাতে হয় এবং দীর্ঘসময় পাড়ি দিয়ে সে উৎপাদন ও অগ্রগতির উপযোগী শান্তি, একাগ্রতা ও স্থীতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ জন্যেই প্রতিবারই সভ্যতার সমন্বয় সাধনের পর একটা স্থীতিশীলতার যুগ আসুক এটাই আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতার দাবী হয়ে থাকে, চাই সে যুগ ক্ষুদ্র হোক বা দীর্ঘ হোক।

আজকের বিশ্বে মানব জাতির স্নায়ুমন্ডলী যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত, তার প্রধান কারণ হলো ঘন ঘন সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের হিড়িক, যা মানুষের শান্তি ও স্থীতি কেড়ে নিয়েছে এবং তার জন্যে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার সুযোগ রাখেনি।

কিংবদন্তি নবী হযরত সোলায়মান (আ.)

এতো গেলো হযরত দাউদের অবস্থা। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অবস্থা এর চেয়েও উন্নত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর সোলায়মানের জন্যে অনুগত করে দিয়েছি বাতাসকে, যা তার আদেশ দ্রুতগতিতে কল্যাণময় ভূখন্ডের দিকে ধাবিত হয়। আমি সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।.....' (আয়াত ৮১-৮২)

হযরত সোলায়মানকে ঘিরে বহু কেসসা কাহিনী প্রচলিত আছে। যার অধিকাংশই ইসরাইলী বর্ণনা থেকে উৎসারিত। তবে আমরা এ সবের আলোচনায় যাবো না। আমরা শুধু কোরআনের বর্ণনার মধ্যে সীমিত থাকবো। এর বাইরে হযরত সোলায়মান সম্পর্কে প্রামাণ্য কিছুই নেই।

এখানে কোরআনের আয়াতে হযরত সোলায়মানের জন্যে প্রবল বাতাসকে অনুগত ও বশীভূত করার বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। এই বাতাস তার আদেশে 'কল্যাণময় ভূখন্ডের' দিকে ধাবিত হতো। এই 'কল্যাণময় ভূখন্ড' দ্বারা বুঝানো হয়েছে সিরিয়াকে। কেননা ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করার সময় এই শব্দ দ্বারা সিরিয়াকেই বুঝানো হয়েছিলো। এখন প্রশ্ন হলো, বাতাসকে বশীভূত করার প্রক্রিয়াটা কেমন ছিলো?

এ প্রসংগে বাতাসের ওপর দিয়ে চলাচলকারী বিছানার কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বলা হয় যে, হযরত সোলায়মান তার পাইক পেয়াদাসহ সে বিছানায় চড়ে বসে থাকতেন। অতপর অতি অল্পসময়ে সে বিছানা তাদেরকে সিরিয়ায় নিয়ে যেতো ও নিয়ে আসতো। অথচ তখন উটের পিঠে চড়ে সিরিয়া যেতে এক মাস লাগতো। এ কাহিনীর প্রমাণ হিসেবে সূরা সাবার নিম্নোক্ত আয়াতের উল্লেখ করা হয়ে থাকে,

'আর সোলায়মানের জন্যে বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যার যাওয়ার পথও এক মাসের, আসার পথও এক মাসের।'

কিন্তু কোরআন বাতাসের ওপর দিয়ে চলাচলকারী বিছানার কোনো উল্লেখ করেনি। আর এটা কোনো প্রামাণ্য হাদীসেও নেই। সুতরাং বিছানার ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই।

কাজেই বাতাসকে বশীভূত করার ব্যাখ্যা হিসেবে যে কথা সংশয়মুক্তভাবে বলা যায় তা এই যে, আল্লাহ বাতাসকে নিজ আদেশের মাধ্যমে কল্যাণময় ভূখন্ড সিরিয়ার দিকে সফরে পাঠাতেন এবং সে সফরে যাওয়া ও আসায় একমাস ব্যয় হতো। এটা কিভাবে হতো? আমি আগেই বলেছি যে, আল্লাহর শক্তি সীমাহীন। কাজেই আল্লাহর কোনো কাজ সম্পর্কে এ প্রশ্ন করার অবকাশ নেই যে, কিভাবে হলো? প্রাকৃতিক নিয়ম ও উপাদানগুলোকে সৃষ্টি করা ও আদেশ দিয়ে কাজে নিয়োজিত করা আল্লাহর সেই সীমাহীন শক্তিরই ফলশ্রুতি ও বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর এই প্রাকৃতিক নিয়ম ও উপাদানগুলোর খুব সামান্য অংশই মানুষ এ যাবত জানতে পেরেছে। মানুষের অজানা এমন বহু প্রাকৃতিক উপাদান থাকতে পারে, যা অজান্তে ও অলক্ষ্যে সক্রিয় থাকে এবং যখন আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেন কেবল তখনই তার লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। 'আমি সব কিছুই জানি।'

অর্থাৎ আমার জ্ঞান সীমাহীন, মানুষের জ্ঞানের মতো সীমাবদ্ধ নয়।

জ্বিনদেরকে হযরত সোলায়মানের বশীভূত করার ব্যাপারটাও তদ্রুপ। তারা সমুদ্রের তলদেশে ও স্থলভাগের মাটির নিম্নভাগে ডুবুরির ভূমিকা পালন করতো এবং হযরত সোলায়মানকে সমুদ্র তলদেশের ও ভূগর্ভের রত্নরাজি কুড়িয়ে এনে দিতো অথবা অন্য নানাবিধ কাজ করে দিতো। আভিধানিক অর্থে যে কোনো গোপন জিনিসই 'জ্বিন'। তবে কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, জ্বিন নামক এক ধরনের সৃষ্টিজীব রয়েছে, যারা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। তাদের মধ্য থেকেই একটা গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা ডুবুরি হিসাবে এবং অন্যান্য পর্যায়ে কাজ করার জন্যে হযরত সোলায়মানের অনুগত করে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তাদের কাজ ছেড়ে পলায়ন, অবাধ্যতা প্রদর্শন ও অরাজকতা বিস্তারের পথও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যখন যাকে বশীভূত করতে চান যেভাবে করতে চান, করতে পারেন ও করেন।

কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের এই নিরাপদ সীমার মধ্যেই আমি আমার বিচরণ সীমিত রাখতে চাই- ইহুদীদের জনশ্রুতি নির্ভর কিংবদন্তীসমূহের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিতে চাই না।

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-কে সুখ ও সমৃদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। উভয়কে দুটো নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আ.)-কে পরীক্ষা করেছিলেন বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করে। আর সোলায়মান (আ.) উৎকৃষ্ট ঘোড়া দিয়ে। সূরা 'সাদ' এ প্রসংগটা এসেছে। কাজেই যথাস্থানেই এই পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সে পরীক্ষার ফল কী হয়েছিলো সংক্ষেপে তাই তুলে ধরা হলো। ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে উদ্ধার পাওয়ার পর অঢেল সুখ ও ঐশ্বর্য লাভের পরীক্ষায় হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.) ধৈর্যধারনের মাধ্যমে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এতে তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী রূপে পরিগণিত হন।

ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে হযরত আইয়ুব (আ.)

এবার আমরা হযরত আইয়ূবের বিপদ মুসিবতের পরীক্ষার কাহিনী প্রসংগে আসছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আইয়ূব যখন তার প্রতিপালককে বললো, আমাকে কষ্টকর একটা মুসিবতে ধরেছে। তুমি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম, তার মুসিবত দূর করে দিলাম।'

হযরত আইয়ুবের পরীক্ষার কাহিনী একটা অনন্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরীক্ষার কাহিনী, কোরআনে এর বিশদ বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। এখানে হযরত আইয়ুবের দোয়া ও তা আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুল হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। কেননা এখানে যে ধারাবাহিক আলোচনা চলে আসছে তা নবীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাদের পরীক্ষায় আল্লাহর সাহায্য সংক্রান্ত। এসব পরীক্ষা কখনো স্বজাতির প্রত্যাখ্যান ও কষ্টদায়ক আচরণের আকারে হয়েছে, যেমন হযরত ইবরাহীম, লূত ও নূহের ক্ষেত্রে। কখনো হয়েছে সুখ ও প্রাচুর্যের আকারে, যেমন হযরত দাউদ ও সোলায়মানের ক্ষেত্রে। আবার কখনো হয়েছে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতির আকারে, যেমন হযরত আইয়ূবের ক্ষেত্রে।

এখানে আইয়ুব (আ.) তার দোয়ায় নিজের দুর্দশার বিবরণ শুধু এতোটুকুই দিয়েছেন যে, 'আমাকে বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত করেছে' আর আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এই বলে

যে, 'তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' তিনি মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দোয়া করেননি। কেননা তিনি ধৈর্যধারণ করতে চান। তিনি আল্লাহর কাছে কোনো অনুরোধও করেননি। কেননা তিনি সেটাকে আল্লাহর সাথে বে-য়াদবী ও অবমাননা বলে গণ্য করেন। এভাবে তিনি ধৈর্যশীল বান্দার নমুনা ও আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হন। কঠিন বিপদেও তিনি দিশেহারা হননি এবং ক্ষয়ক্ষতিতে তার মনোবল ক্ষুণ্ন হয়নি। অথচ তার এই মুসিবত ও ক্ষয়ক্ষতি এতো মারাত্মক ছিলো যে, তা সকল যুগের মানব সমাজে একটা কিংবদন্তীর রূপ ধারণ করেছে।(১)

বরং মুসবিত থেকে তাকে উদ্ধার করা হোক আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতেও তিনি সংকোচ বোধ করেন। তিনি বিষয়টা আল্লাহর বিবেচনার ওপরই ছেড়ে দেন। কেননা তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার অবস্থা আল্লাহর জানাই আছে এবং তার কোনো কিছু চাওয়ার দরকার নেই।

আর যে মুহূর্তে হযরত আইয়ূব তার প্রতিপালকের কাছে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস ও আদব সহকারে উপস্থিত হলেন, সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সাড়া দিলেন, সদয় হলেন এবং তার মুসিবতের অবসান ঘটলো।

'আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম ....।

তার দেহের কষ্ট দূর করা হলো। ফলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন, তার পরিবার সংক্রান্ত মুসিবতও দূর করা হলো। ফলে তিনি পরিবারের হারানো সদস্যদের বিনিময়ে নতুন কিছু লোক পেয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের মতোই আরো কিছু লোক তাদেরকে দিলেন। কারো কারো মতে এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তার পুত্রদেরকে যেমন ফেরত দিলেন, তেমনি তাকে আরো সমসংখ্যক পুত্র সন্তান দিলেন, অথবা তাকে পুত্র ও পৌত্র দান করলেন। 'আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ।' বস্তুত প্রত্যেক দানই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত। 'এবাদাতকারীদের জন্যে সরণীকা' কেননা তা আল্লাহর কথা, তার পরীক্ষা বা বিপদ-মুসিবতের কথা, বিপদ মুসিবতে ও বিপদ মুসিবতের পরে তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত আইয়ুব (আ.)-এর মুসিবতে সমগ্র মানব জাতির জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে, আইয়ুব (আ.) ধৈর্য ও সমগ্র মানব জাতির জন্যে আদর্শস্বরূপ। ধৈর্য, আদব ও উত্তম পরিণতির দিক দিয়ে তিনি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যে, সকলের দৃষ্টি তার দিকে উত্থিত না হয়ে পারে না।

পরীক্ষা ও মুসিবতের প্রসংগে 'এবাদাতকারীদের' শব্দটার উল্লেখ তাৎপর্যবহ 'এবাদাতকারীরা' বিপদ মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে বাধ্য এটাই এর তাৎপর্য। এবাদাত, ঈমান ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তার এ পরীক্ষা অনিবার্য। কেননা ঈমান কোনো খেলার বিষয় নয়, বরং একটা গুরুতর দায়িত্ব। ঈমান একটা আমানত, যা একমাত্র সেইসব বিশ্বস্ত লোককেই দেয়া হয়, যারা এটা সংরক্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নেয়। শুধু মুখের কথা ধর্তব্য নয়। এবাদাতকারীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে ধৈর্য অপরিহার্য।

---

(১) হযরত আইয়ূব (আ.) কে আক্রান্তকারী মুসিবত কী ছিল তা নিয়ে অনেক মতভেদ ঘটেছে এবং অনেকে অতিরিক্ত কাহিনীও ফেঁদেছে। যেমন কেউ কেউ বলেছে যে, তিনি এমন ঘৃণ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন যে লোকেরা তার কাছ থেকে দূরে সরে যেত এবং তাকে শহরের বাইরে ফেলে রেখেছিল। অথচ এই উক্তির সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। একজন রসূল এমন ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হতেই পারেন না। কোরআন থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, তিনি নিজের ও নিজের পরিবারকে নিয়ে বিরাট মুসিবত ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পরীক্ষা হিসেবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট। ইসরাইলী রেওয়াতের ওপর ভিত্তি করে খামাখা এসব গল্প কাহিনীর পেছনে পড়া উচিৎ না।—সম্পাদক

এরপর হযরত ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুলকেফল (আ.) এর বিষয়ও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ইসমাঈল, ইদ্রীস, যুলকিফল এরা সবাই ধৈর্যশীল। আমি এদের সবাইকে আমার রহমতে প্রবেশ করিয়েছি। তারা সবাই সৎকর্মশীল।'

এই নবীদেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য ধৈর্য, যা তাদের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইসমাঈলকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন আপন ছেলেকে যবাই করার নির্দেশ দিয়ে। তিনি এ পরীক্ষায় ধৈর্যের সাহায্যে উত্তীর্ণ হন এবং তার ছেলে নবী ইসমাইল (আ.)ও এই বলে আত্মসমর্পণ করেন যে,

'হে পিতা, আপনাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পারেন।'

হযরত ইদ্রীস (আ.) সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, তাঁর স্থান ও কাল অজ্ঞাত। কারো কারো মতে তিনি হচ্ছেন ওযোরিস, যাকে মিশরীয়রা তার মৃত্যুর পর পূজা করতো এবং তাকে নিয়ে বহু কিংবদন্তী রচনা করেছিলো, কেউ কেউ তাকে মানব জাতির প্রথম শিক্ষক বলে আখ্যায়িত করেছে, যিনি তাদেরকে কৃষ্টি ও শিল্পের শিক্ষা দেন। তবে এ সম্পর্কে আমরা কোনো প্রমাণ পাইনি। সুতরাং আমাদেরএতোটুকু জেনে নিতে হবে যে, তিনি এমন এক পর্যায়ের ধৈর্যশীল ছিলেন, যা আল্লাহর চিরস্থায়ী গ্রন্থে নিবন্ধিত হবার যোগ্যতা রাখে।

হযরত যুলকিফলেরও আবির্ভাবের স্থান ও কাল অজ্ঞাত। তবে খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন নবী। আবার কারো কারো মতে তিনি বনী ইসরাঈলের একজন পুণ্যবান লোক। বনী ইসরাঈলের জনৈক নবীর ইন্তেকালের সময় সমাগত হলে তিনি তাদের জন্যে এমন এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চান, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে সারা রাত জেগে নামায পড়ে, প্রতি দিন রোযা রাখে ও মানুষের বিবাদ মীমাংসা করার সময় রাগান্বিত হয় না। হযরত যুলকিফল এই তিনটি গুণের অধিকারী প্রমাণিত হন এবং এজন্যেই তাকে যুলকিফল বলে। তবে এটাও একটা প্রমাণহীন বক্তব্য। এখানে কোরআনের এ সার্টিফিকেটই যথেষ্ট যে, যুলফিকল ধৈর্যশীল ছিলেন।

'তাদের সবাইকে আমার রহমতের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছিলোাম।' প্রকৃতপক্ষে এখানে তাদের উল্লেখের এটাই প্রধান উদ্দেশ্য।

ইউনুস (আ.)—এর ঘটনা থেকে দ্বীনের দায়ীদের জন্যে শিক্ষণীয়

এরপর আসছে হযরত ইউনুসের কেসসা। তার উপাধি হচ্ছে 'যুননুন' বা মাছওয়ালা।

'মাসওয়ালার কথা স্মরণ করো, যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গেলো।' (আয়াত ৮৭)

আলোচনার ধারাবাহিকতার সাথে সমন্বয় রক্ষার জন্যে হযরত ইউনুসের কাহিনী এতো সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। সূরা সাফফাতে বিশদ বিবরণ হয়েছে। এখানে কিছুটা বিশদ বিবরণ দরকার।

হযরত ইউনুসকে 'যুননুন' বা মাসওয়ালা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কারণ তাকে মাছে গিলে খেয়েছিলো এবং পরে আবার উপরে ফেলে দিয়েছিলো। ঘটনা এই যে, তাকে এক শহরে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি সেখানে গিয়ে আল্লাহর দিকে জনগণকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা সবাই তার দাওয়াত অমান্য করলো। তিনি ভীষণ বিরক্ত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি দাওয়াতের দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেন না। ভাবলেন, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে দুনিয়াকে সংকীর্ণ করবেন না। দুনিয়া তো সুপ্রশস্ত। আরো বহু শহর ও জনপদ রয়েছে। এরা দাওয়াত অস্বীকার করলে ক্ষতি নেই। আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্য জাতির কাছে পাঠাবেন।

'সে ভাবলো আল্লাহ তার জন্যে সুযোগ সংকীর্ণ করবেন না' কথাটার অর্থ এটাই। অর্থাৎ তার দাওয়াতের জায়গার অভাব হবে না। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তিনি সমুদ্রের কিনারে চলে গেলেন। সেখানে একটা যাত্রী বোঝাই জাহাজ পেয়ে তাতে চড়ে বসলেন। জাহাজটা গভীর সমুদ্রে গেলে চালকের মনে হলো জাহাজে একজন যাত্রী অতিরিক্ত বহন করা হয়েছে। তাই সে বললো, জাহাজ থেকে কমের পক্ষে একজন যাত্রীকে সাগরে ফেলে দেয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র এভাবেই বাদবাকী যাত্রীদেরকে সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। তখন লটারি করা হলো। লটারিটা উঠলো হযরত ইউনুসের নামে। অগত্যা তাকে সাগরে ফেলে দেয়া হলো। ফেলে দেয়া মাত্রই তাকে একটা বড়ো মাছে গিলে খেয়ে ফেললো। এবার তিনি পড়লেন জীবনের কঠিনতম সংকটে। একে তো মাছের পেটের ভেতরের অন্ধকার, তদুপরি সাগরের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার এই তিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি বলে উঠলেন,

'হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি।'

আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে তার সংকট থেকে উদ্ধার করলেন। মাছটা তাকে সমুদ্রের কিনারে উগরে ফেলে দিল। এর পরের অবস্থাটা সূরা সাফফাতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমাদের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

হযরত ইউনুসের কাহিনীর যে অংশটুকু এখানে আলোচিত হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও শিক্ষাপূর্ণ।

হযরত ইউনুস (আ.) রেসালাতের দায়িত্ব পালনে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখাননি, যারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তাদের ওপর তিনি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে দাওয়াতের দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ের ওপর থেকে নামিয়ে রাখলেন, অতপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন বিরক্তিকর ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, যার তুলনায় তাকে প্রত্যাখ্যানকারীদের সৃষ্টি করা পরিস্থিতি ছিলো অনেক সহজ। তিনি যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় না চাইতেন, তার নিজের ওপর যে যুলুম করেছেন, তার দায়িত্ব ও দাওয়াতের কাজের প্রতি যে অবিচার করেছেন, তা যদি স্বীকার না করতেন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তার মুসিবত থেকে উদ্ধার করতেন না। তার বিনীত স্বীকৃতি ও দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত তাকে তার কষ্টকর ও উদ্বেগজনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে এই ময়দানের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট, বাধা বিপত্তি ও সমস্যা সংকট সহ্য করতেই হয় এবং প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা জনিত পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতেই হয়। একজন নিরেট সত্যবাদী প্রচারকের দাওয়াতকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করলে এবং তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে সেটা সহ্য করা খুবই কঠিন মনে হয়। তবে এটা রসূল সুলভ দায়িত্বেরই অংশ। যারা দাওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাদের ধৈর্যধারণ না করে উপায় থাকে না। সর্বাবস্থায় তাদের দৃঢ় থাকতে ও মনোবল অটুট রাখতে হয়, দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হলেও তা অব্যাহত রাখতে হয় ও পুনঃ পুনঃ দাওয়াত দিয়ে যেতে হয়।

মানুষের সংশোধন ও দাওয়াত গ্রহণের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ হতে নেই- চাই যতোই প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন। একশো বার দাওয়াত দিয়েও যেখানে কাজ হয় না, সেখানে একশো একবার বা এক হাজার একবার দিয়ে সুফল পাওয়া যেতে পারে এবং দাওয়াত গৃহীত হতে পারে। তাই ধৈর্যধারণ করে এবং হতাশ না হয়ে দাওয়াত অব্যাহত রাখলে একদিন শ্রোতার মনের দরজা খুলেও যেতে পারে।

দাওয়াতের পথ সহজ ও কুসুমাস্তীর্ণ নয় এবং মানুষের হৃদয়ের কাছে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়াও মোটেই সহজসাধ্য নয়। কেননা বাতিল ও বিভ্রান্তিপূর্ণ ধ্যান ধারণা, আদত অভ্যাস, ঐতিহ্য ও প্রথা মানুষের মনের ভেতর স্তূপীকৃত হয়ে দাওয়াতের প্রবেশের পথ আগলে রাখে। এইসব স্তূপ সরানো অপরিহার্য। যে কোনো পন্থায় মনকে ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা জরুরী। সব ক'টা স্পর্শকাতর কেন্দ্রকে নাড়া দেয়া এবং মন মগজের সব ক'টা গিরা খুলে দেয়া প্রয়োজন। আর এর প্রতিটা পর্যায়ে ধৈর্য সহকারে, অধ্যবসায় সহকারে ও আশাবাদী মন নিয়ে কাজ করতে হয়। এর কোনো একপর্যায়ে একটা নাড়া বা ধাক্কা দিতেই এক মুহূর্তের ভেতরেই মানুষের সমগ্র মনমগয পুরোপুরিভাবে পাল্টে যেতে পারে– যদি নাড়াটা সঠিক জায়গায় পড়ে। মানুষ হাজারবার চেষ্টা করেও যেখানে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে একটা সঠিক চেষ্টার সাফল্য দেখে তাকে অনেক সময় বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

এর সবচেয়ে সহজ উদাহরণ হলো বেতার যন্ত্র। বেতার যন্ত্রে যখন প্রেরণ কেন্দ্র অনুসন্ধান করা হয়, তখন বহুবার একই সংকেত বিন্দুর ওপর দিয়ে নির্দেশক কাঁটা নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা সত্তেও ষ্টেশন ধরা পড়ে না। অথচ এভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময় এক নাড়াতেই ষ্টেশন ধরা পড়ে। আর তখন সঠিক তরংগের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং প্রচারিত প্রোগ্রাম শোনা যায়।(১)

মানুষের মন অনেকটা বেতার যন্ত্রের মতোই। দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত লোকদের উচিত অনবরত নির্দেশক কাঁটা ঘোরাতে থাকা, যাতে শ্রোতার মনের নাগাল পাওয়া যায়। হাজার বার নাড়া দেয়ার পর ব্যর্থ হলেও তার পরে হঠাৎ একবারেই ষ্টেশন ধরা সম্ভব হতে পারে।

মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করছে না এই ওজুহাত দেখিয়ে রেগে গিয়ে দাওয়াত ছেড়ে দেয়া ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সংশ্রব বর্জন করে দূরে সরে যাওয়া খুবই সহজ ও আরামদায়ক কাজ। এতে কিছুক্ষণ পর ক্রোধ প্রশমিত হবে এবং উত্তপ্ত স্নায়ুগুলো ঠান্ডা হবে। কিন্তু দাওয়াতের কী হবে? বিরোধী প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ায় ফায়দাটা কী হবে?

মনে রাখতে হবে দাওয়াতের কাজটা চালু থাকাই আসল ও জরুরী বিষয়, দাওয়াত দাতার ভালো লাগা-মন্দ লাগা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। তার বিরক্ত লাগে লাগুক, রাগ হয় হোক। রাগকে হযম করে ফেলতে হবে এবং সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ধৈর্য ধারণই তার জন্যে কল্যাণকর। ধৈর্যধারনের অভ্যাস করলে যে যাই বলুক, তাতে বিরক্তি লাগবে না।

দাওয়াতদানকারী আল্লাহর হাতিয়ার। আল্লাহ তায়ালা তার দাওয়াতের শ্রেষ্ঠ তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক। দাওয়াতদানকারীর কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় ও সকল পরিবেশে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া। বাকী যেটুকু, তা আল্লাহর হাতে সমর্পিত। হেদায়াতের দায়িত্ব আল্লাহর।

হযরত ইউনুসের ঘটনায় দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, তা বিবেচনা করা দরকার। তার আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন ও ভুল স্বীকার করায়ও শিক্ষা রয়েছে, সেটাও অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, মহাসংকটে নিপতিত হযরত ইউনুসের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়া ও তার সকাতর দোয়া কবুল হওয়ার ভেতরেও মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

'এভাবে আমি মোমেনদেরকে রক্ষা করে থাকি।'

---

(১) স্মরণ রাখা দরকার যে, এই তাফসীর আজ থেকে প্রায় ৪০ বসর আগের লেখা, তখন বেতার যন্ত্রই ছিলো বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার।–সম্পাদক

ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)—এর সংক্ষিপ্ত জন্ম বৃত্তান্ত

এরপর রয়েছে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহিয়া (আ.)-এর ঘটনার প্রতি ইংগিত এবং যাকারিয়ার দোয়া আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার উল্লেখ। (আয়াত ৮৯-৯০)

হযরত ইয়াহিয়ার জন্মের ঘটনা বিশদভাবে সূরা মারিয়ামে ও সূরা আল ইমরানে বর্ণিত হয়েছে। আর এখানে এসেছে পূর্বাপর বক্তব্যের সাথে সংগতি রেখে। প্রথমে হযরত যাকারিয়ার দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, 'হে প্রভু, আমাকে নিঃসন্তান রেখে দিয়ো না।' অর্থাৎ আমার পরে 'হাইকেলের' তত্ত্বাবধানকারী কেউ থাকবে না এমন অবস্থার সৃষ্টি করো না। উল্লেখ্য যে, হযরত যাকারিয়া হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের আগে বনী ইসরাঈলের এবাদাতের স্থান হাইকেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। হযরত যাকারিয়া এ কথা ভুলে যাননি যে, আল্লাহ তায়ালাই ইসলামের উত্তরাধিকারী ও ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাই তিনি বলেছেন, তুমি তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। আসলে তিনি শুধু চাইছিলেন তার মৃত্যুর পর তার বংশধরের মধ্যে এমন কেউ জন্ম নিক, যে তার পরিবার পরিজন ইসলাম ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির সর্বোত্তম রক্ষক হবে। কেননা আল্লাহর বান্দারাই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে রক্ষক ও শাসকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

হযরত যাকারিয়ার দোয়া আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ কবুল করলেন।

'আমি তার দোয়া কবুল করলাম, তাকে ইয়াহিয়া নামক পুত্র দান করলাম এবং তার স্ত্রীকে যোগ্যতা দান করলাম।'

উল্লেখ্য যে, তার স্ত্রী বন্ধ্যা ও সন্তান ধারণের অযোগ্য ছিলো। এ আয়াতে এসব বিষয় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক দোয়া কবুল করার বিষয়টা ত্বরিত এগিয়ে আনা হয়েছে।

'তারা সৎ কাজে ত্বরিত এগিয়ে যেতো।'

তাই আল্লাহ তায়ালা ত্বরিত দোয়া কবুল করলেন 'এবং আমাকে ভীতি ও আশা সহকারে ডাকতো।' অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টির আশা ও ক্রোধের ভীতি সহকারে। কেননা আল্লাহর সাথে তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক ছিলো মযবুত এবং তাদের অন্তর ছিলো সর্বক্ষণ সচেতন। 'আর তারা ছিলো আমার স্মরণে বিনয়াবনত।' অহংকারীও নয়, দাম্ভিকও নয়।

যাকারিয়া, তার স্ত্রী ও তাদের পুত্র ইয়াহিয়ার এই গুণাবলীর কারণেই এই পিতামাতা একজন সৎ পুত্র লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাই এ পরিবারটা ছিলো কল্যাণময় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের উপযুক্ত পরিবার।

সর্বশেষে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রসংগক্রমে তাঁর মা হযরত মারিয়াম সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'আর যে নারী নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করেছিলো তার অভ্যন্তরে আমি আমার পক্ষ থেকে একটা প্রাণ ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্যে নিদর্শন বানালাম।'

এখানে মারইয়ামের নামোল্লেখ করা হচ্ছে না। কেননা নবীদের সংক্রান্ত ধারাবাহিক আলোচনায় তাঁর পুত্র ঈসাই এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। মারইয়ামের উল্লেখ শুধু আনুষংগিকভাবে হয়েছে। এখানে তার পুত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট তার গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে,

'যে নারী নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করেছিলো।' অর্থাৎ সে নিজেকে সর্বপ্রকারের যৌন মিলন থেকে সযত্নে রক্ষা করেছিলো। 'ইহসান' শব্দটা দ্বারা সাধারণত বিয়ে (এবং মুহসানা দ্বারা বিবাহিতা নারী) বুঝানো হয়ে থাকে আনুসংগিকভাবে। কেননা বিয়ে মানুষকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। তবে এখানে 'ইহসান' শব্দটা তার আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সব ধরনের বৈধ বা অবৈধ যৌন মিলন থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলো। মারিয়ামের সাথে ইউসুফ নাজ্জার নামক

যে লোকটি হাইকেলের সেবায় নিয়োজিত ছিলো, তার সাথে মারইয়ামকে জড়িত করে ইহুদীরা অপবাদ দিয়েছিলো। সেই অপবাদ থেকে মারিয়ামের পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্যেই একথা বলা হয়েছে। প্রচলিত বাইবেল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ নাজ্জারের সাথে তার বিয়ে হয়েছিলো, কিন্তু সে কখনো তার কাছে যায়নি। আলোচ্য আয়াতে বাইবেলের সে উক্তিও খন্ডন করা হয়েছে।

মারইয়াম নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করেছিলো। 'তাই আমি তার ভেতরে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম।' প্রাণ ফুঁকে দেয়ার ব্যাপারটা এখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, কোথায় ফুঁকে দেয়া হয়েছে, তা বলা হয়নি। এ বিষয়ে সূরা মারইয়ামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আর কোনো বিশদ আলোচনা করছি না।

'আর আমি তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্যে একটা দৃষ্টান্ত বানিয়েছি।'

এটা এমন এক দৃষ্টান্ত, যার কোনো নযীর অতীতেও ছিলো না, ভবিষ্যতেও হবে না। সমগ্র মানবেতিহাসে এটাই একমাত্র নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত। কারণ এ ধরনের একটা দৃষ্টান্তই সকল যুগের ও সকল প্রজন্মের মানুষকে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট সাব্যস্ত হয় এবং একথা উপলব্ধি করতে সুবিধে হয় যে, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতির নিয়মের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বটে, তবে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনও নন এর আওতায় তার হাত পা বাঁধাও নয়।

কতিপয় নবী ও রসূল, তাদের পরীক্ষা ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের নমুনা সম্বলিত পর্যালোচনার পর এই পর্যালোচনার সার্বিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এর উপসংহার টানা হয়েছে এভাবে,

'এরা সবাই তোমাদেরই উম্মাত, যা একটি মাত্র উম্মাত। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই তোমরা আমারই এবাদাত করো।'

অর্থাৎ সকল নবীর উম্মাতরা আসলে তোমাদেরই উম্মাত এবং একই উম্মাত। সকলের একই ধর্ম, একই আকীদা বিশ্বাস, একই জীবন ব্যবস্থা এবং তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা অন্য কারো নয়।

পৃথিবীতে একটি মাত্র উম্মাত, আর মহাবিশ্বে একই মাত্র প্রভু প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ ও মাবুদ নেই।

একটি মাত্র জীবন পদ্ধতির অনুসারী একটি উম্মাত, যা আকাশ ও পৃথিবীতে একই সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এই পর্যন্ত এসে এই পর্যালোচনা গোটা সূরার মূল বক্তব্যের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেছে এবং তাওহীদী আকীদা বিশ্বাসের প্রতি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের সাথে একাত্ম হয়ে সমস্বরে তার অনুকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ
اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ
مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ اَنْتُمْ لَهَا
وٰرِدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۖ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ
فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

৯৩. (কিন্তু পরবর্তী সময়ে) তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করে নিজেদের (দ্বীনের) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে ফেললো (অথচ) সর্বশেষে এদের সবাইকে (এক হয়ে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

রুকু ৭

৯৪. কোনো ব্যক্তি যদি মোমেন অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে তাহলে তার (সৎপথে চলার এ) প্রচেষ্টাকে কিছুতেই অস্বীকার করা হয় না, অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজকে) লিখে রাখি। ৯৫. এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে জাতিকে আমি একবার ধ্বংস করে দিয়েছি তারা আবার (তাদের ধ্বংস পূর্ব অবস্থায়) ফিরে আসবে– ৯৬. এমনকি যখন (কেয়ামতের নির্দশন হিসেবে) ইয়াজুজ ও মা'জুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং ওরা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে (পতংগের মতো) নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকবে। ৯৭. এবং (কেয়ামতের ব্যাপারে আমার) অমোঘ প্রতিশ্রুতি আসন্ন হয়ে আসবে, (তখন) তা আসতে দেখে যারা (এতোদিন) একে অস্বীকার করেছিলো তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; (তারা বলবে) হায়, কতোই না দুর্ভোগ আমাদের, আমরা এ (দিনটি) সম্পর্কেই উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা সত্যিই ছিলাম (বড়ো) যালেম! ৯৮. (তখন তাদের বলা হবে,) তোমরা এবং তোমাদের সে সব কিছু, যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে মাবুদ বানাতে, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে; (আজ) তোমাদের সবাইকেই সেখানে পৌছুতে হবে। ৯৯. তারা যদি সত্যিই মাবুদ হতো যাদের তোমরা গোলামী করতে, তাহলে আজ তারা কিছুতেই (জাহান্নামে) প্রবেশ করতো না; (উপাস্য উপাসক) সবাই তাতে চিরকাল ধরে অবস্থান করবে। ১০০. এদের জন্যে সেখানে শুধু শাস্তির ভয়াবহ চীৎকারই (শুধু অবশিষ্ট) থাকবে, (এ চীৎকার ছাড়া) তারা সেখানে (অন্য) কিছুই শুনতে পাবে না।

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا
يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ
خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ
مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا
لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ

১০১. (অপরদিকে) যাদের জন্যে আমার কাছ থেকে (অনন্ত) কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে আছে, অবশ্যই তাদের (জাহান্নাম ও) তার (আযাব) থেকে (অনেক) দূরে রাখা হবে, ১০২. তারা (তাদের সুখের ঘরে বসে ভয়াবহ চীৎকারের) ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না, তাদের জন্যে তো (বরং সেখানে) তাদের মন যা চায় তাই (হাযির) থাকবে, (তাও থাকবে আবার) চিরকাল ধরে, ১০৩. (জাহান্নামের) বড়ো ভীতি তাদের (সেদিন মনে) কোনো রকম দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারবে না, (সেদিন) ফেরেশতারা তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলবে; তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিলো, এ হচ্ছে তোমাদের সে (ওয়াদা পূরণের) দিন। ১০৪. (এটা এমন একদিন) যেদিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেবো, ঠিক যেভাবে কেতাবসমূহ গুটিয়ে ফেলা হয়; যেভাবে আমি একদিন এ সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো, এটা (এমন এক) ওয়াদা, (যা) পালন করা আমার ওপর জরুরী; আর এ কাজ তো আমি করবোই। ১০৫. আমি যবুর কেতাবেও এ উপদেশ উল্লেখের পর (দুনিয়ার কর্তৃত্বের ব্যাপারে পরিষ্কার করে আমার) এ কথা লিখে দিয়েছি, (একমাত্র) আমার যোগ্য বান্দারাই (এ) যমীনের (নেতৃত্ব করার) অধিকারী হবে। ১০৬. এ (কথার) মধ্যে (আমার) এবাদাতগোযার বান্দাদের জন্যে সত্যিই এক (মহা) পয়গাম (নিহিত) আছে; ১০৭. (হে নবী,) আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্যে রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি। ১০৮. তুমি (এদের) বলো, আমার ওপর এই মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদ একজনই, তোমরা কি (তাঁর) অনুগত বান্দা হবে না? ১০৯. (হ্যাঁ,) তারা যদি তোমার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো, আমি তোমাদের (জান্নাতের সুখবর দেয়ার পাশাপাশি আযাবের ব্যাপারেও) একই পরিমাণ সতর্ক

عَلٰى سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ

الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾ وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ

وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١١﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ

عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

করছি, আমি (নিজেও) একথা জানি না, যে (আযাবের) ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে তা (আসলেই) কি খুব কাছে, নাকি তা (অনেক) দূরে? ১১০. একমাত্র তিনিই জানেন যা কিছু উচ্চ স্বরে বলা হয় এবং তিনিই জানেন যা কিছু তোমরা (অন্তরে) গোপন করো। ১১১. আমি জানি না, (অবকাশের) এ (সময়টুকু) হতে পারে তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা (মাত্র, কিংবা হতে পারে) সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্যে (তোমাদের) কিছু মাল সম্পদ (দান করা)। ১১২. (সর্বশেষে) সে বললো, হে আমার মালিক, তুমি (এদের ব্যাপারটা) ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও; (হে মানুষ,) তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে) যা কিছু কথা বানাচ্ছো, সেসব (কিছুর অনিষ্টের) ব্যাপারে একমাত্র আমাদের মালিক দয়াময় আল্লাহ তায়ালার কাছেই আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে।

তাফসীর

আয়াত ৯৩-১১২

ইতিপূর্বে সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত আল্লাহর বিধান ও নিয়ম-নীতি আলাচিত হয়েছে যা একক স্রষ্টার পরিচয় বহন করে। আরো আলোচিত হয়েছে দাওয়াত ও রেসালাত সংক্রান্ত বিধান যা অভিন্ন জাতি সত্ত্বা ও অভিন্ন আদর্শের পরিচয় বহন করে। এখন আলোচনার শেষ পর্বে কেয়ামতের বর্ণনা আসছে। কেয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন ও আলামতের বর্ণনা আসছে। সাথে সাথে মোশরেক ও তাদের কল্পিত দেব-দেবীর পরিণতি এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর সর্বময় ও নিরংকুশ ক্ষমতার বর্ণনাও আসছে।

এরপর পৃথিবীর বুকে ক্ষমতার পালা বদলে আল্লাহর নিয়ম-নীতি কি– সে ব্যাপারে বক্তব্য আসছে এবং হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওত যে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমতস্বরূপ সে কথাও ব্যক্ত করা হচ্ছে।

সব শেষে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন কাফের মোশরেকদের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেন, ওদের অনিবার্য পরিণতি ওদেরকে বরণ করতে দেন, ওদের শেরকী, কুফরী ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মুখে যেন আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। কেয়ামতের ময়দানেই ওদের বিচার হবে। আর এই কেয়ামত হচ্ছে অতি নিকবর্তী। *(আয়াত ৯৩-৯৪)*

তাওহীদই হলো যাবতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি

সকল নবী রসূলদের উম্মত এক ও অভিন্ন। এই উম্মত এক ও অভিন্ন। এই উম্মতের বোধ ও বিশ্বাস এবং আদর্শ ও মূল্যবোধও অভিন্ন, যার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা একত্ববাদ। প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী রসূলরা প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই তাওহীদের দিকেই মানুষকে

আহ্বান করেছেন। এতে কখনও ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং কোনো পরিবর্তনও ঘটেনি। সকলের দাওয়াতী কার্যক্রম এই মূল ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছে।

তাওহীদভিত্তিক জীবন বিধানের খুঁটি নাটি কিছু বিষয়ে পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এটা মূলত প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের ধারণ ক্ষমতা, প্রতিটি প্রজন্মের উন্নতি ও অগ্রগতি, মানব সমাজের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা বিভিন্ন প্রকারের আইন কানুন ও বিধি বিধান পালনের যোগ্যতা, নতুন নতুন চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা এবং জীবনমান বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে হয়েছে।

সকল নবী রসূলদের উম্মত অভিন্ন এবং তাদের রেসালাতের বুনিয়াদ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনুসারীরা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে বিভেদ জন্ম নিয়েছে, বিবাদ বিসংবাদ জন্ম নিয়েছে। তাদের মাঝে শত্রুতা জন্ম নিয়েছে, হিংসা বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে, এমনকি এই বিভেদ একই রসূলের অনুসারীদের মাঝেও সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তারা আদর্শের নামে, আকীদা-বিশ্বাসের নামে পরস্পর মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এদের আদর্শও অভিন্ন এবং আকীদা বিশ্বাসও অভিন্ন। কারণ, তারা একই নবীর উম্মত এবং একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার বুকে তারা বিভেদ সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন পথের পথিক হলেও পরকালে কিন্তু তারা সকলেই সে একই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। সেদিক থেকে বিচার করলে তাদের শেষ ঠিকানাও অভিন্ন। সেই ঠিকানা হচ্ছে মহান আল্লাহর দরবার যেখানে প্রত্যেকর হিসাব নিকাশ নেয়া হবে। তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে সৎ পথের পথিক ছিলো, না অসৎ পথের পথিক। (আয়াত ৯৪)

এটাই হচ্ছে কর্ম ও কর্মফলের সঠিক বিধান। অর্থাৎ ঈমানের সাথে যদি কেউ সৎ কাজ করে তাহলে এই সৎ কাজের বিনিময় ও প্রতিদান তাকে অবশ্যই প্রদান করা হবে। তার সাথে কোনো রকম বে-ইনসাফী করা হবে না, কোনো যুলুম করা হবে না। কারণ, এই সৎ কাজের পূর্ণ বিবরণ আল্লাহর দফতরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি এটাকে হারাবেন না এবং ভুলেও যাবেন না।

সৎ কাজের মূল্যায়নের জন্যে ঈমান হচ্ছে মাপকাঠি। ঠিক তেমনিভাবে ঈমানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে আমল হচ্ছে মাপকাঠি। কাজেই ঈমান ব্যতীত আমলের মূল্য নেই এবং আমল ব্যতীত ঈমানেরও সার্থকতা নেই।

ঈমান হচ্ছে জীবনের মূল ভিত্তি। একে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈমান হচ্ছে এমন একটি যোগসূত্র যা গোটা সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টিকর্তার সাথে জুড়ে দেয় এবং একক ও অভিন্ন সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা জানি, কোনো কাঠামোই ভিত্তি ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। সৎকাজ হচ্ছে একটি ইমারত বা কাঠামোস্বরূপ। কাজেই সেটা যদি তার মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে তা ধ্বসে যেতে বাধ্য।

সৎ কাজ হচ্ছে ঈমানেরই ফল। এরই মাধ্যমে ঈমানের অস্তিত্ব ও এর কার্যকারিতা হৃদয়ে অনুভূত হয়। ইসলাম হচ্ছে একটি গতিশীল আদর্শের নাম। হৃদয়ের গভীরে এই আদর্শের অস্তিত্ব বিরাজ করলে তার বহিপ্রকাশ সৎ কাজের মাধ্যমে ঘটবেই। ঈমানের মূল যতো বেশী গভীরে প্রোথিত থাকবে, এর ফলও ততো বেশী পরিপক্কতা অর্জন করবে।

এ কারণেই পবিত্র কোরআনে যেখানেই কর্ম ও কর্মফলের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই ঈমান ও আমলের প্রসংগও উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কর্মবিহীন ও ফলবিহীন ঈমানের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান নেই। তেমনিভাবে ঈমানবিহীন আমলেরও কোনো প্রতিদান নেই।

আসলে ঈমানবিহীন সৎকাজ হচ্ছে দৈব ঘটনার মতো যা সচরাচর ঘটে না। ঘটলেও হঠাৎ করেই ঘটে থাকে। কারণ, ঈমানবিহীন আমল কোনো নির্ধারিত আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। এমনকি কোনো বলিষ্ঠ নিয়ম নীতির ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এ জাতীয় আমলকে নিতান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভিরুচিই বলা যেতে পারে, যার পেছনে সেই প্রকৃত প্রেরণা নেই যা ঈমান থেকে উৎসারিত এবং সৎকাজের প্রধান চালিকা শক্তি। মোমেন বান্দা সৎ কাজের প্রেরণা পায় তার ঈমান থেকে। কারণ, এই ঈমান এমন এক মহান সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত যিনি সৎ কাজ পছন্দ করেন। এই সৎকাজ হচ্ছে জগত সংসারে গড়ার উপায়, জীবনের উৎকর্ষের উপায়! এই সৎ কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যপূর্ণ আচরণ, জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতির সাথে সম্পর্কযুক্ত আচরণ। এটা চকিত ঘটে যাওয়া কোনো বিষয় নয়। সাময়িক কোনো আচরণ নয়। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কর্মকান্ড নয়। এমনকি জগত ও জগতের শাশ্বত নিয়ম নীতির বিপরীতমুখী কোনো পদক্ষেপও নয়।

কাজের চূড়ান্ত বিনিময় প্রদান করা হবে কেয়ামতের দিন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনেই অনেক সময় এই বিনিময়ের কিছু অংশ প্রদান করে থাকেন। কাজেই যে সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে কোনো গজবের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরকালীন শাস্তি ভোগ করার জন্যে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে এবং এটা অবধারিত ও চূড়ান্ত। এতে কোনো হেরফের করা হবে না।

যে সকল জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা ফিরে আসবে না– এটা অসম্ভব। (আয়াত ৯৫)

পূর্বে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেককেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।' এখন বলা হচ্ছে যে, ধ্বংস প্রাপ্ত জনপদের বাসিন্দাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে। পৃথকভাবে এদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। আর সেটা হলো, অনেকে মনে করতে পারে, দুনিয়ার বুকে যে সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের হিসাব কেতাব বুঝি এখানেই শেষ। তাই, আলোচ্য আয়াতে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ওদেরকেও আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। বরং ফিরে না যাওয়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করার জন্যে 'হারাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বর্ণনা ভংগি কিছুটা অভিনব ও অপরিচিত। যার ফলে বিভিন্ন মোফাসসের এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আয়াতে বর্ণিত 'লা' অব্যয়টিকে অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন এবং অর্থ করেছেন যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যাবে না। অথবা কেয়ামত পর্যন্ত এসব জাতি তাদের ভ্রান্ত নীতি ও পথ পরিহার করবে না। আমাদের মতে এ দুটো ব্যাখ্যার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আয়াতের বাহ্যিক ও মূল বক্তব্য থেকে যা বুঝা যায় সে অর্থই গ্রহণযোগ্য। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সাথে এই অর্থের মিল রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ফিরে না যাওয়াটা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত 'লা' অব্যয়টির অর্থ যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কেয়ামতের আলামত ও ময়দানের খন্ডচিত্র

এরপর কেয়ামতের দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে। প্রথমেই আসছে কেয়ামতের বিভিন্ন আলামত বা চিহ্ন। এসব চিহ্ন দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, কেয়ামতের আগমন খুবই কাছে। এই চিহ্নগুলোর অন্যতম একটি চিহ্ন হচ্ছে 'ইয়াজুজ ও মাজুজ' এর আবির্ভাব। এই প্রসংগে বলতে গিয়ে আয়াতে বলা হচ্ছে,

'যে পর্যন্ত না ইয়াজুয ও মাজুযের বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে। (আয়াত ৯৬-১০৪)

সূরা 'কাহফে' বর্ণিত যুলকারনাইনের ঘটনা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে, 'ইয়াজুজ ও মাজুজ' এর বন্ধন মুক্ত হওয়ার দ্বারা খুব সম্ভবত তাতার সম্প্রদায়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই দুর্ধর্ষ জাতি দাবানলেয় ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বহু অঞ্চল ও দেশকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলেছিলো। আর এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুগে এবং বলা হয়েছে যে, 'কেয়ামতের আগমন নিকটবর্তী'। কিন্তু কতোটুকু নিকটবর্তী এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, সময়ের হিসাব নিকাশ আল্লাহর কাছে এক রকম, আর মানুষের কাছে আর এক রকম। মানুষের হিসাব অনুযায়ী যা এক হাজার বছর বলে গণ্য, আল্লাহর হিসাব অনুযায়ী তা হচ্ছে মাত্র এক দিনের সমান। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমার পালনকর্তার কাছে এক দিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।'

এখানে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং সে দিনটির আগমন কিভাবে ঘটবে, তার বর্ণনা দেয়াই উদ্দেশ্য। সে জন্যে পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এ চিত্রটি হচ্ছে 'ইয়াজুজ ও মাজুজ' এর বন্ধন মুক্ত হওয়ার চিত্র। বন্ধন মুক্ত হয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে ধেয়ে আসার চিত্র। এটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের নিজস্ব পদ্ধতি। এর মাধ্যমে পার্থিব জগতের ঘটনাবলীর সাহায্যে পরকালীন জগতের ঘটনাবলীর কিছুটা ধারণা মানুষের সামনে পেশ করা হয়।

কেয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহদ্রোহী লোকদের কি অবস্থা দাঁড়াবে তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, 'কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে' অর্থাৎ বিস্ময়ে ও আতংকে তারা বিস্ফোরিত ও অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকবে। এর পর তারা হঠাৎ করেই বলে উঠবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম, বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম' যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং আচমকা কোনো বিভীষিকাময় ঘটনা ঘটে যায় তখন মানুষের অবস্থা এরূপই দাঁড়ায়। এ রূপ অবস্থায় মানুষ আতংকে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে, তাদের দৃষ্টি বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে, অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে, হায়-হুতাশ করতে থাকে, বিলাপ করতে থাকে। অপরাধ স্বীকার করে অনুতাপ করতে থাকে। কিন্তু তখন এগুলো কোনোই কাজে আসে না।

আতংকে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যখন মানুষ এই বিলাপ ও অনুতাপ করতে থাকবে, তখন আল্লাহর অমোঘ ও চূড়ান্ত ফয়সালা এই ভাষায় পেশ করা হবে, 'তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করো, সেগুলো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা তাতে প্রবেশ করবেই।' (আয়াত ৯৮)

দৃশ্যটি এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে যেন সে কাফেরের দল বিচারের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার শেষে তাদেরকে এবং তাদের দেব-দেবীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে তাদেরকে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ভাবে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ঠিক যেমনটিভাবে ফল খেয়ে ফলের দানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। আর ঠিক এই মুহূর্তে তাদের দেব-দেবীদের উপাস্য হওয়ার মিথ্যা দাবীর অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হবে,

'এগুলো যদি উপাস্যই হতো, তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না।' (আয়াত ৯৯)

এই কাফেররা যখন পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে তখন তাদের সামনে এই বক্তব্য একটা আত্মিক প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে যেন সেটা এই মুহূর্তেই পরকালে ঘটে চলছে। এরপর বর্ণনাভংগির মাধ্যমে ভাবটা এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সে

কাফের গোষ্ঠী সত্যি সত্যিই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। ফলে সেখানে তাদের অবস্থানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, তাদের পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এই বর্ণনার তাদের করুণ অবস্থার কথা জানা যাচ্ছে, ভয়ে ও আতংকে তাদের চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে,

'প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। তারা সেখানে শুধু শাস্তির চিৎকারই শুনতে পাবে এবং কিছুই শুনতে পারবে না।' (আয়াত নং ৯৯ ও ১০০)

অপরদিকে মোমেনরা এসব থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ, তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর রহমত ও ফযলে সঠিক কাজ করেছে। ফলে তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে কামিয়াবী ও নাজাত। এ প্রসংগে বলা হচ্ছে,

'যাদের জন্যে প্রথম থেকেই................।' (আয়াত ১০১-১০২)

আগুন জ্বলে ওঠার পর তার লেলিহান শিখা যখন সব কিছুকে গ্রাস করে নেয় এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে তখন এক প্রকার অনুচ্চ শব্দের সৃষ্টি হয়। এই শব্দ ভীতিকর যা শুনে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়, হৃদয়ে কম্পন ধরে যায়। তাই জান্নাতীদেরকে এই ভীতিকর শব্দের আতঙ্ক থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। জাহান্নামের লেলিহান শিখার ছোবল থেকে তো তারা মুক্ত থাকবেই। এমনকি মোশরেকেরা যে মহা আতঙ্কে পতিত হবে, তা থেকেও এ সকল মোমেন বান্দা নিরাপদ থাকবে। তাছাড়া সদা সুখ, শান্তি ও আরামে তারা বসবাস করবে। বিভিন্ন নেয়ামত ভোগ করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে, তাদেরকে সংগদান করবে, যেন তাদের মন-মস্তিষ্ক সব ধরনের ভয় ভীতি ও আতংক থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এ প্রসংগে বলা হচ্ছে

'মহা ত্রাস তাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না..............' (আয়াত ১০৩)

সেই মহা দুর্যোগের দিনটিতে গোটা জগত কি রূপ ধারণ করবে এবং এর পরিণতি কি দাঁড়াবে, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে,

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজ পত্র।' (আয়াত ১০৪)

বিচারকের রায় ঘোষণার পর মুহুরী যেমন কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে নেয় এভাবেই মানুষের চির পরিচিত এই বিশ্বকেও গুটিয়ে নেয়া হবে। এরপর আসবে এক নতুন বিশ্ব, এক নতুন জগত। এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি যেভাবে হয়েছিলো, ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করা হবে কেয়ামত পরবর্তী নতুন জগতও। এটা আল্লাহর ওয়াদা আর ওই ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা পূরণ করবেনই।

'আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।' (আয়াত ১০৪)

বিশ্বনেতৃত্বের পালাবদলে আল্লাহর শাশ্বত নীতি

জীবন ও জগতের পরিসমাপ্তি ও পরকালীন জীবনের খন্ড চিত্র তুলে ধরার পর এখন ভিন্ন একটি প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আর সেটা হলো, পৃথিবীর বুকে ক্ষমতার পালা বদলে আল্লাহর বিধানের দাবী কি? এই দাবী অনুযায়ী ইহকালীন জীবনে আল্লাহর সৎ বান্দাদের অবস্থান কোথায়? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম পরায়ন বান্দারা অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।' (আয়াত ১০৫)

এখানে যবুর বলতে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি প্রেরিত আসমানী কেতাবকে বুঝানো হয়েছে যা তাওরাতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত 'যেকর' শব্দ দ্বারা তৌরাতই বুঝতে হবে। অথবা যবুর বলতে যে কোনো আসমানী কেতাবকে বুঝানো হয়েছে। যার সম্পর্ক

লৌহে মাহফুয এর সাথে। আর এই লৌহে মাহফুজই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বিধান, সকল ঐশী বাণীর পূর্ণাংগ আধার ও উৎস।

যা হোক এখানে আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালাই বিধান অনুযায়ী পৃথিবীর মালিকানা ও কর্তৃত্ব অবশেষে আল্লাহর সৎ ও আদর্শবান বান্দাদের হাতেই ফিরে আসে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মালিকানা বলতে কি বুঝায় এবং সৎ বান্দা বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীকে আবাদ করার জন্যে, সংস্কার করার জন্যে, এর উন্নতি সাধন করার জন্যে, এর মাঝে লুকায়িত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে এবং এর প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের সম্পদকে ব্যবহার করে একে উন্নতির সেই চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে– যা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এই পৃথিবীর বুকে মানুষ কি ভাবে জীবন যাপন করবে এবং কিভাবে লেন-দেন করবে সে সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত নিয়ম নীতি ও আইন কানুন তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই নিয়ম নীতি ও আইন কানুনের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎ কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ সর্বশেষ আসমানী কেতাবে এসেছে। এই যে বিধান– এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করে এবং তাকে সাবধানী হতে অনুপ্রাণিত করে। শুধু তাই নয়, বরং তার চলাফেরা ও আচার আচরণের মাঝে একটা সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের নিশ্চয়তাও বিধান করে।

আল্লাহর এই বিধান অনুযায়ী কেবল পৃথিবীর উন্নতিই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এই উদ্দেশ্য সাধন করার সাথে সাথে তাকে আরো একটি মহান উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে, আর তা হলো, তার আত্মার উন্নতি এবং পার্থিব জগতে তার মানবীয় গুণাবলীর চরম বিকাশ। এর ফলে সে এই বস্তুতান্ত্রিক রংগীন সভ্যতার মাঝে বিলীন হয়ে গিয়ে মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাবে না এবং পৃথিবীর তাবৎ প্রাকৃতিক ও গোপন সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরও মানবীয় গুণাবলীর উচ্চ শিখর থেকে তার পতন ঘটবে না।

এই ভারসাম্য ও সংগতি রক্ষা করতে গিয়ে কখনও পাল্লা হাল্‌কা হবে, আবার কখনও ভারী হবে। কখনও এই পৃথিবীর ওপর আধিপত্য ঘটবে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও যুলুমবাযদের, কখনও আধিপত্য ঘটবে বর্বর, হিংস্র ও আগ্রাসনবাদীদের, আবার কখনও ঘটবে আল্লাহদ্রোহী ও ভোগবাদী লোকদের যারা পৃথিবীর সম্পদ ও শক্তির কেবল বস্তুতান্ত্রিক ব্যবহারেই পারদর্শী। তবে এসব ঘটবে ও ঘটতে থাকবে চলার পথের নিছক বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা হিসেবে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর সৎ বান্দাদের হাতেই ন্যস্ত হবে। কারণ, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা ঈমান ও সৎ কাজকে অভিন্ন রূপে দেখে থাকে। তাদের জীবনের কোনো পর্যায়েই এ দুটো জিনিসের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি হয় না।

যে জাতির মাঝে ঈমানের গভীরতা ও কর্মের স্পৃহার গুণ দুটোর সমাহার যতো বেশী ঘটবে ততোই সে জাতি পৃথিবীর উত্তরাধিকার মালিকানা লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে এর অসংখ্য নমুনা রয়েছে। কিন্তু যখনই এই গুণ দুটোর অভাব দেখা দেবে, তখনই অপর পক্ষের পাল্লা ভারী হবে। কখনও বস্তুগত উপায় উপকরণ গ্রহণকারীদের পাল্লা ভারী হয় বিশেষ করে যখন ঈমানের দাবীদাররা এসব উপায় উপকরণ গ্রহণে উদাসীন হয়ে পড়ে, তাদের হৃদয় সঠিক ঈমান থেকে শূন্য হয়ে পড়ে সৎ কর্মের প্রেরণাদানকারী ঈমান থেকে শূন্য হয়ে পড়ে, পৃথিবীকে আবাদ করার মতো উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত খেলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে।

ঈমানের দাবী পূরণ করাই হচ্ছে মোমেনদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এই ঈমানের দাবী হচ্ছে, সৎ কাজ করা এবং খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। আর এমন সময় এলেই আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। তখন বিধান অনুসারে সৎ বান্দারাই পৃথিবীর মালিকানা লাভ করতে সক্ষম হবে। কারণ, সৎ বান্দারা কেবল ঈমানেরই অধিকারী নয়, তারা কর্মস্পৃহারও অধিকারীও।

সভ্যতা ও মানবতার বিকাশে মোহাম্মদ (স.)—এর আদর্শ

সূরার সূচনায় যে ধরনের সূর ধ্বনিত হয়েছে, সে একই ধরনের সূর শেষের দিকেও ধ্বনিত হচ্ছে। যেমন,

'এতে এবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে ....' (আয়াত ১০৬-১১২)

জীবন ও জগত সম্পর্কে, দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে এবং কর্ম ও তার বিনিময়ের বিধান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যা কিছু পেশ করা হয়েছে, তা আল্লাহভক্ত লোকদের জন্যে বার্তা স্বরূপ। এদেরকে 'আবেদ' বা এবাদাতগোযার বলা হয়েছে। কারণ, যারা আল্লাহভক্ত বা এবাদাতগোযার বান্দা, তারা এমন হৃদয়ের অধিকারী, যার মাঝে থাকে আল্লাহর ভয় ও আনুগত্য গ্রহণের যোগ্যতা, চিন্তার যোগ্যতা এবং কল্যাণমুখী ব্যবহারের যোগ্যতা।

পৃথিবীতে নবী রসূলদের আগমন ঘটেছে মূলত মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমতস্বরূপ। তারা মানুষকে হাত ধরে সৎ ও সত্যের পথে পরিচালিত করেন। আর যাদের মাঝে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে এবং আগ্রহ আছে কেবল তারাই নবী রসূলদের প্রদর্শিত পথের পথিক হতে পারে। আল্লাহর করুণা ও দয়ার পাত্র মোমেন ও কাফের সকলেই। কিন্তু হেদায়াতের ভাগী কেবল তারাই হবে যাদের মাঝে হেদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা থাকবে।

শেষ নবী মোহাম্মদ (স.) যে আদর্শ ও জীবন বিধান নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন তা গোটা মানব জাতির জন্যেই উপযুক্ত। এর মাধ্যমে মানব জাতি এই জাগতিক জীবনে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতি সাধন করতে পারবে।

মানবতা যখন চিন্তা চেতনায় পরিপক্কতা লাভ করে তখনই এই আদর্শ নিয়ে শেষ নবীর আগমন ঘটে। একটা খোলা চিঠির ন্যায় মানুষের সামনে এই আদর্শকে তুলে ধরা হয়। এই আদর্শ সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ। এই আদর্শ পূর্ণাংগ। জীবনের সকল দিক নির্দেশনাই এতে রয়েছে। এই আদর্শ অপরিবর্তনীয়। কিন্তু যুগের চাহিদা মেটানোর জন্যে তা যথাযথ যোগ্যতা ও ক্ষমতাসম্পন্ন। কেননা অনাগত যুগ চাহিদার কথা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই ভালভাবে জানেন। কারণ, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞানী। সকল সৃষ্টি জগতই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন।

এই মহান গ্রন্থে চির পরিবর্তনশীল মানব জীবনের জন্যে কিছু স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে খুঁটি নাটি বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। যুগ চাহিদা ও জীবন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সে নতুন নতুন আইন, নীতি ও পন্থা উদ্ভাবন করতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেন কোনো ভাবেই সে স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতির সাথে সংঘর্ষপূর্ণ না হয়।

মানুষের বিবেক বুদ্ধিকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করারও সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই মুক্ত চিন্তার পথ সুগম করার জন্যে অনুকূল সমাজ ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে মানুষের এই মুক্ত চিন্তার একটা সীমারেখা থাকতে হবে। সে অবশ্যই স্বাধীনভাবে এবং অবাধে তার চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগবে, তবে তা অবশ্যই মানুষের কল্যাণের জন্যে হতে হবে, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের জন্যে হতে হবে এবং সর্বোপরি মানব জীবনের জন্যে নির্ধারিত আল্লাহর বিধান ও মৌলনীতির আওতাধীন হতে হবে।

অতীত থেকে নিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব অভিজ্ঞতা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, সে জীবন বিধান ও মৌলনীতি সব সময়ই মানব অগ্রগতির পুরোধা হিসেবে কাজ করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পর্যায়ে সার্বিক উন্নতি একমাত্র এই জীবন বিধানের ছায়াতলেই সম্ভব– এটাও প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, এই জীবন বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটা মানব জীবনকে সব সময়ই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনকে গতিহীন ও স্থবির করে তোলে না। জীবনকে পশ্চাদমুখী করে তোলে না। বরং জীবনের অগ্রগতির পথে সদা অগ্রগামী থাকে এবং জীবনের প্রতিটি চলার পথকে প্রশস্ত করে থাকে।

উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের মানবীয় আকাংখা চরিতার্থ করতে গিয়ে এই জীবন বিধান কখনোই এবং কোনোভাবেই মানুষের শক্তি ও সামর্থকে দাবিয়ে রাখে না, ব্যক্তি পর্যায়েও রাখে না এবং সামাজিক পর্যায়েও রাখে না। ঠিক তেমনিভাবে এই জীবন বিধান মানুষকে তার শ্রমের ফল ভোগ করতে বারন করে না এবং বৈধ পন্থায় জীবনকে ভোগ করতেও নিষেধ করে না।

এই জীবন বিধান একটা ভারসাম্যপূর্ণ বিধান, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান। এই জীবন বিধানে আত্মার উন্নতির জন্যে দেহকে শাস্তি দেয়ার নিয়ম নেই। তেমনিভাবে দৈহিক আরাম আয়েশের জন্যে আত্মাকে অবহেলা করার নিয়মও নেই। এই জীবন বিধান দেশ ও সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির শক্তি সামর্থের ব্যবহারকে নিষেধ করে না, ব্যক্তির স্বভাবজাত ও সুস্থ আশা আকাংখার বাস্তবায়নের পথে কোনো বাঁধার সৃষ্টি করে না। তেমনিভাবে এই জীবন বিধান ব্যক্তির অদম্য ও অসৎ কামনা-বাসনাকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়ে সমষ্টিগত জীবনকে কলুষিত করার সুযোগ দেয় না, ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ দেয় না। এই জীবন বিধানে ব্যক্তির ভোগ বিলাস ও লোভ লালসার খাতিরে সমাজকে পদানত করার কোনো অবকাশ নেই।

এই জীবন বিধানের আওতায় মানুষের ওপর যখন কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপ করা হয় তখন তার শক্তিসামর্থ্য ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। সাথে সাথে ব্যক্তির মাঝে এমন আগ্রহ ও স্পৃহাও সৃষ্টি করা হয় যার ফলে সে দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পালন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এমনকি এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সে কখনও কোনো কষ্টের শিকার হলেও বিচলিত হয় না, ধৈর্যহারা হয় না।

মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাত তাঁর জাতি এবং তাঁর পরবর্তী যুগের সকল মানব গোষ্ঠীর জন্যেও রহমত স্বরূপ ছিলো এবং আছে। তিনি যে আদর্শ প্রতিহত করেছেন তা প্রাথমিকভাবে মানুষের কাছে এক অজানা অপরিচিত আদর্শ হিসেবে মনে হতো। কারণ তাদের আদর্শের সাথে এই নবতর আদর্শের কোনো মিল ছিলো না। কিন্তু, তা সত্তেও মানুষ ধীরে ধীরে যতোই এই আদর্শের কাছে আসতে থাকলো, তখনই তাদের বিস্ময়ভাব কাটতে লাগলো এবং তারা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন পরিচয়ে হলেও সেই আদর্শকে গ্রহণ করতে এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে শুরু করলো।

জাতিগত, বর্ণগত ও অঞ্চলগত সকল প্রকার ভেদাভেদ মিটিয়ে দিয়ে সকল মানব গোষ্ঠীকে একটিমাত্র আদর্শ ও সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে একীভূত করার উদ্দেশ্যে ইসলামের আগমন ঘটেছে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ, চিন্তাধারা ও বাস্তবতার জন্যে এটা ছিলো এক অদ্ভূত বিষয়। সমাজপতিরা তখন নিজেদেরকে ক্রীতদাসদের তুলনায় ভিন্ন মানব প্রজাতি মনে করতো। কিন্তু এই চৌদ্দশত বছরের ব্যবধানে মানব জাতি ইসলামেরই নির্ধারিত পথে ধাবিত হতে চেষ্টা করেছে। তবে ইসলামের পূর্ণাংগ আদর্শের আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মানবতা তার চলার পথে বার বার হোচট খাচ্ছে, তা সত্তেও অন্তত দাবী ও কথায় হলেও সে এই আদর্শের কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। অথচ যে ঘৃণ্য বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম সেই চৌদ্দশত বছর আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, তা এখনও ইউরোপ ও আমেরিকার কোনো কোনো রাষ্ট্রে টিকে আছে।

আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান এ কথা ঘোষণা করেছে ইসলাম। যে মুহূর্তে মানুষে মানুষে স্বীকৃত ছিলো, শ্রেণী বৈষম্য প্রচলিত নিয়মে পর্যবশিত হয়েছিলো, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথক আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো, দাস ও সামন্ত প্রথার যুগে যখন ব্যক্তির ইচ্ছাই আইন বলে গন্য হতো সেই মুহূর্তে আইনের চোখে সকলে সমান– ইসলামের এই ঘোষণা মানুষের কাছে বড়োই বে-মানান লেগেছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারাই ধীরে ধীরে ইসলামের এই সার্বজনীন নীতিকে অন্তত তাত্ত্বিক রূপে হলেও উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাচ্ছে। অথচ এই সার্বজনীন নীতির বাস্তবায়ন সেই চৌদ্দশত বছর আগেই ইসলাম করে দেখিয়েছে।

এ ছাড়াও হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওতে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী প্রায় সকলেই তাঁর আগমনকে গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত ও আশির্বাদ হিসেবে গণ্য করে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মানব জাতি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, সজ্ঞানে হোক অথবা অজান্তে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মহান আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। এখনও তার এই আদর্শ আল্লাহর রহমতের ছায়াস্বরূপ পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে, যে কেউ ইচ্ছা করলে এই ছায়ার নিচে আশ্রয় নিয়ে এই হাংগামাপূর্ণ ও উত্তপ্ত পৃথিবীর বুকে বাস করেও স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে পারে।

বর্তমান অস্থিতিশীল পৃথিবীতে মানুষ দিকশূন্য হয়ে পড়েছে, দিশাহারা হয়ে পড়েছে। আজ মানুষ বস্তুতান্ত্রিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হৃদয়হীনতার শিকার হয়ে দিক-বেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে মানব জাতির জন্যে ইসলামের সুশীতল ছায়ার সত্যিই বড়ো প্রয়োজন।

মানুষের প্রকৃতি ও একজন দায়ীর কর্তব্য

রহমত ও দয়ার তাৎপর্য বর্ণনার পর এখন রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন কাফের মোশরেকদের সামনে তাঁর রেসালাতের মূল বক্তব্য তুলে ধরে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?'

অর্থাৎ নিরংকুশ একত্ববাদ বা তাওহীদই হচ্ছে এই রেসালাতের মূল্য বক্তব্য। আর এটাই হচ্ছে খোদায়ী রহমতের মূল উপাদান। কারণ, এই একত্ববাদ বা তাওহীদের বিশ্বাসই মানুষকে জাহেলী ধ্যান-ধারণা থেকে রক্ষা করে, পৌত্তলিকতার শৃংখল থেকে মুক্ত করে এবং কুসংস্কার ও অলীক বিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে। এই বিশ্বাস মানব জীবনকে তার মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়, গোটা সৃষ্টি জগতের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করে এবং তাকে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ নিয়ম নীতির মাধ্যমে পরিচালিত করে। এতে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী, ধ্যান-ধারণা ও কামনা বাসনার কোনো দখল নেই। এই বিশ্বাস মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়, একমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে শেখায়, অন্য কারো সামনে নয়। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর রহমত লাভের একমাত্র পন্থা। কাজেই প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?' এই প্রশ্নই কাফের মোশরেকদেরকে করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে তাঁকে আরো বলা হচ্ছে,

'অতপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,তবে বলে দিন আমি তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে সতর্ক করেছি।' (আয়াত ১০৯)

অর্থাৎ আমার যা বলার ছিলো, তা তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। তোমাদেরকে আমার আর বলার কিছুই নেই। এখন তোমাদের পথ তোমরাই বেছে নেবে। তোমাদের পরিণতি তোমরাই ভোগ করবে। আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এরপর তোমাদের আর কোনো ওযর-আপত্তিই কাজে আসবে না। জেনে শুনেই তোমরা তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে।

তবে কি নাগাদ তোমাদেরকে এই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে তা অবশ্য আমার জানা নেই। কারণ, এটা অদৃশ্যের ব্যাপার। তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানবেন। তোমাদের শাস্তি কি এই দুনিয়াতেই হবে, না আখেরাতে হবে-তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়। তিনিই তোমাদের জানা ও অজানা, গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ই খবর রাখেন। তাঁর কাছে তোমাদের কোনো বিষয়ই গোপন নেই।

'তিনি জানেন, যে কথা সশব্দে বলো এবং যে কথা তোমরা গোপন করো।' (আয়াত ১১০)

অর্থাৎ তোমাদের সব কিছুই তাঁর সামনে উন্মুক্ত। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু জেনে-শুনেই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কখনও তিনি বিশেষ কারণে এই শাস্তি মুলতবীও করতে পারেন। এই মুলতবীর পেছনে সে বিশেষ কারণটা কি তা আমার জানার কথা নয়। হয়তো: তোমাদের পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা কিছুদিনের জন্যে তোমাদের শাস্তি মুলতবী করবেন। এর ফলে তোমরা আরো কিছুদিনের জন্যে পার্থিব সুখ শান্তি ও আরাম আয়েশ ভোগ করার সুযোগ পাবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেকে পুনরায় কঠোর হস্তে পাকড়াও করবেন এবং তোমাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন।

কাফের মোশরেকদের চূড়ান্ত পরিণতি ও শাস্তির নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.)-এর পক্ষ থেকে অজ্ঞতা প্রকাশের ফলে ওদের হৃদয়ে কঠিন আঁচড় কেটে যায়। এখন ওরা নানা ধরনের সংশয় সন্দেহের মাঝে পড়ে থাকবে। অজানা ভয় ও আতংক ওদেরকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াবে। অতর্কিতভাবে তাদের ওপর আল্লাহর গযব চেপে বসে কিনা সে চিন্তা তাদেরকে সারাক্ষণ পীড়া দিতে থাকে। এর ফলে তাদের মন মস্তিস্ক সদা সজাগ থাকে। ভোগ বিলাসিতার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে পাছে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে কিনা এই ভয়ে। অতর্কিত হঠাৎ কোনো আযাব পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সারাক্ষণ মনের মাঝে এক প্রকার দুশ্চিন্তা দানা বেঁধে উঠে। এই দুশ্চিন্তার ফলে মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। সারাক্ষণ আশংকায় ভোগে, না জানি কখন এই অনিশ্চয়তার পর্দা ভেদ করে গায়েবী আযাব সমূর্তিতে আবির্ভূত হয়।

মানুষের স্বভাব হলো, সে অদৃশ্যের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তার ভাগ্যে আল্লাহ কি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে ব্যাপারে সে গাফেল থাকে। এই গাফলতির কারণ হচ্ছে পার্থিব আরাম আয়েশ। ফলে সে ভুলে যায় যে, পর্দার আড়ালে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে। যা অপেক্ষা করছে তার সঠিক জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনিই জানেন এ অদৃশ্য ও লুকায়িত পরিণতি সঠিক সময় ও মুহূর্ত।

তাই বলা যায় যে, রসূলের পক্ষ থেকে এই অজ্ঞতা প্রকাশ এক ধরনের সাবধানবাণী। এর মাধ্যমে তিনি গাফেল ও উদাসীন লোকদেরকে সজাগ করছেন এবং সুযোগ হারানোর আগেই তাঁদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করছেন।

এখন রসূলুল্লাহ (স.) নিজের প্রভু ও মালিকের প্রতি মনোনিবেশ করছেন। কারণ, তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। লোকদেরকে সতর্ক করেছেন। তাদেরকে অশুভ পরিণতির ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। কাজেই এখন তিনি দয়াময় আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করছেন। ঠাট্টা ও বিদ্রূপকারী গাফেল লোকদের ব্যাপারে তাঁর সঠিক ফয়সালা কামনা করছেন। তাদের ষড়যন্ত্র, কূটচাল ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মোকাবেলায় তাঁর সাহায্য কামনা করছেন। কারণ তিনিই তো একমাত্র সাহায্যকারী। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে,

'তিনি বললেন, হে আমার প্রভূ ....। (আয়াত ১১২)

রহমত ও দয়া একটা বড়ো গুণ। আয়াতে শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ তায়ালা গোটা জগতের জন্যে দয়া ও রহমত স্বরূপ রসূলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অথচ কাফের মোশরেকরা তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে, তাকে অস্বীকার করেছে। কাজেই ওদের এই মোকাবেলায় আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাঁর রসূলের প্রতি দয়া করবেন, রহমত করবেন এবং ওদের বিরুদ্ধে রসূলকে সাহায্য করবেন, সমর্থন করবেন।

আর এই বলিষ্ঠ বক্তব্যের মধ্য দিয়েই সূরাটির সমাপ্তি ঘটে। শুরুতেও বলিষ্ঠ বক্তব্য ছিলো এবং শেষেও বলিষ্ঠ বক্তব্য এসেছে। ফলে উভয় প্রান্তেই এক ও অভিন্ন সূর ধ্বনিত হয়েছে যার আবেদন অত্যন্ত বলিষ্ঠ, প্রখর, হৃদয়গ্রাহী ও গভীর।

সূরা আল হজ্জ

আয়াত ৭৮ রুকু ১০

মদীনা অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝١ يَوْمَ

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٢

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝٣

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٤

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, অবশ্যই কেয়ামতের কম্পন হবে একটি ভয়ংকর ঘটনা। ২. সেদিন তোমরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতংকে) তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বোঝা ফেলে দেবে, মানুষকে যখন তুমি দেখবে তখন (তোমার) মনে হবে তারা বুঝি কিছু নেশাগ্রস্ত মাতাল, কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা হচ্ছে এক ধরনের আযাব,) আল্লাহ তায়ালার আযাব কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ। ৩. মানুষের মধ্যে কিছু (মূর্খ) লোক আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালার (শক্তি ক্ষমতা) সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে, ৪. অথচ তার ওপর (আল্লাহ তায়ালার এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে যে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে (নির্ঘাত) গোমরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গোমরাহীই) তাকে (জাহান্নামের) প্রজ্বলিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে। ৫. হে মানুষ, পুনরুত্থান্ (দিবস) সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে (তোমরা আমার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভেবে দেখো—) আমি তোমাদের (প্রথমত) মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, অতপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর মাংসপিন্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতি বিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত হয়েছে) কিংবা আকৃতি বিশিষ্ট না হয়ে নষ্ট হয়ে

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ
السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝٧ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝٨
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٩ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ

গেছে– যেন আমি তোমাদের কাছে (আমার সৃষ্টি কৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি; (অতপর আরো লক্ষ্য করো,) আমি (শুক্রবিন্দুসমূহের মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতপর আমি তোমাদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো, তোমাদের মধ্যে কেউ (বয়োপ্রাপ্তির আগেই) মরে যায়, আবার তোমাদের অকর্মণ্য (বৃদ্ধ) বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়,) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক ভূমি, অতপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করে। ৬. এগুলো এ জন্যেই (ঘটে), আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমোঘ সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সব কিছুর ওপর তিনিই একক ক্ষমতাবান, ৭. অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুনরুত্থিত করবেন। ৮. (তারপরও) মানুষদের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনো রকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কেতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতন্ডা শুরু করে, ৯. যাতে মানুষদের সে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান, (শুধু তাই নয়,) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহান্নামের) আগুনের কঠিন শাস্তিও আস্বাদন করাবো। ১০. (আমি তাকে

بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ
خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ
مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ
كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

বলবো,) এ হচ্ছে তোমার সেই কর্মফল যা তোমার হাত দুটো (আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কখনো (এতো) বড়ো যালেম নন।

রুকু ২

১১. মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ঈমানের (একান্ত) প্রান্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে, যদি (এতে) তার কোনো (পার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে (ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দুঃখ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, (এভাবে) সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১২. এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা আল্লাহর বদলে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোনো অপকারও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না; এটা হচ্ছে (এক) চরমতম গোমরাহী, ১৩. ওরা এমন কিছুকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশী নিকটতর; কতো নিকৃষ্ট (এদের) অভিভাবক, কতো নিকৃষ্ট (সে অভিভাবকের) সহচর! ১৪. (পক্ষান্তরে) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে (সুপেয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই করেন। ১৫. যদি কেউ মনে করে, আল্লাহ তায়ালা (যাকে নবুওত দিয়েছেন) তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো সাহায্যই করবেন না, তাহলে (নিজের পরিতৃপ্তির জন্যে) সে যেন আসমান পর্যন্ত একটি রশি ঝুলিয়ে নেয়, অতপর (আসমানে গিয়ে) যেন (ওহী আগমনের ধারা) কেটে দিয়ে আসে, তারপর নিজেই যেন দেখে নেয়, যে জিনিসের প্রতি তার এতো আক্রোশ, (তার) এ কৌশল তা দূর করতে পারে কিনা!

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ (১৬) إِنَّ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ

أَشْرَكُوْا ۖ ق إِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيْدٌ (১৭) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ

مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ (সাজদা) (১৮) هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۗ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (১৯)

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ (২০) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ (২১)

১৬. এভাবেই সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে আমি এ (কোরআন)–টি নাযিল করেছি, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সঠিক পথের হেদায়াত দান করেন। ১৭. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যারা ছিলো 'সাবেয়ী', (যারা) খৃস্টান ও অগ্নিপূজক, (সর্বোপরি) যারা আল্লাহর সাথে শেরেক করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এদের সবার (জান্নাত ও দোযখের) ফয়সালা করে দেবেন; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর ওপর একক পর্যবেক্ষক। ১৮. তুমি কি এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করোনি, যতো (সৃষ্টি) আসমানসমূহে আছে, যতো আছে যমীনে– সবকিছুই আল্লাহ তায়ালাকে সাজদা করছে, সাজদা করছে সূর্য চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষলতা, যমীনের ওপর বিচরণশীল সব জীবজন্তু, (সর্বোপরি) মানুষের মধ্যেও অনেকে; এ মানুষদের অনেকের ওপর (না-ফরমানীর কারণে) আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে আছে; আসলে আল্লাহ তায়ালা যাকে অপমানিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউই নেই, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাই করেন যা তিনি এরাদা করেন। ১৯. এ হচ্ছে (বিপরীতমুখী) দুটো দল, যারা নিজেদের মালিকের ব্যাপারে (একে অন্যের সাথে) বিতর্ক করলো, অতপর এদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে তাদের (পরিধান করানোর) জন্যে আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে; শুধু তাই নয়, তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ২০. তার ফলে যা কিছু তাদের পেটের ভেতর আছে তা সব এবং চামড়াগুলো গলে যাবে; ২১. তাদের (শাস্তির) জন্যে সেখানে আরো থাকবে (বড়ো বড়ো) লোহার গদা।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾

২২. যখনই তারা (দোযখের) তীব্র যন্ত্রণায় (অস্থির হয়ে) তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদের পুনরায় (ধাক্কা দিয়ে) তাতে ঠেলে দেয়া হবে (বলা হবে), জ্বলনের প্রচন্ড যন্ত্রণা আজ তোমরা আস্বাদন করো (এরা ছিলো বিতর্কের প্রথম দল, যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে)।

রুকু ৩

২৩. (বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে (অমীয়) ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে, সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা (দিয়ে বানানো মালা) দ্বারা অলংকৃত করা হবে; উপরন্তু সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ২৪. (এসব পুরস্কার তাদের এ কারণেই দেয়া হবে যে, দুনিয়ায়) তাদের ভালো কথার দিকে হেদায়াত করা হয়েছিলো এবং মহাপ্রশংসিত আল্লাহ তায়ালার পথ তাদের দেখানো হয়েছিলো (এবং তারা যথাযথ তা মেনেও নিয়েছিলো)।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরার আয়াতগুলোর বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটা মক্কী ও মাদানী মিশ্রিত। বিশেষত যুদ্ধের অনুমতি দান সম্বলিত আয়াতগুলো অর্থাৎ ৩৮-৪১ নং আয়াত এবং সমান প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত অর্থাৎ ৬০ নং আয়াত সুনিশ্চিতভাবে মাদানী। কেননা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ও খুনের বদলায় খুনের অনুমতি হিজরতের পরে ছাড়া দেয়া হয়নি। হিজরতের পরে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই এই অনুমতি দেয়া হয়। হিজরতের আগে যখন একদল মদীনাবাসী মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তারা রসূল (স.)-এর কাছে মিনার অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করা ও তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চাইলো। রসূল (স.) বললেন, 'আমাকে এর আদেশ দেয়া হয়নি।' পরে যখন মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর থেকে মোশরেকদের অত্যাচার ও নির্যাতন প্রতিহত করা, ঈমানের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও মুসলমানদের এবাদাত করার অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করার বিধান জারী করলেন।

মক্কী সূরাগুলোর ন্যায় আল্লাহর একত্ব, কেয়ামতের ভয় জন্মানো, পরকালের সত্যতা প্রতিষ্ঠা, শেরক খন্ডন, কেয়ামতের দৃশ্যাবলী এবং প্রকৃতির রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলী ইত্যাদি এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এর পাশাপাশি যুদ্ধের অনুমতি দান, ইসলামী এবাদাত ও পবিত্র স্থানগুলো সংরক্ষণ, আগ্রাসন প্রতিরোধকারীর জন্যে আল্লাহর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর পথে জেহাদের আদেশের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

সূরার সার্বিক প্রেক্ষাপটে যে ভাবধারাটা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান, সেটা হচ্ছে শক্তি, তেজোদ্দীপ্ততা, দুর্ধর্ষতা, আতংক, সংঘাত, সতর্কীকরণ, ভীতি প্রদর্শন, আল্লাহভীতির প্রেরণা সৃষ্টি ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধকরণের ভাবধারা।

এই ভাবধারা বিভিন্ন দৃশ্য ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তন্মধ্যে কেয়ামতের দৃশ্যটা এক ভয়াবহ, লোমহর্ষক ও সংঘাতময় দৃশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের কম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক দুধমাতা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে.......... ।' (আয়াত ১-২)

অনুরূপ আযাবের দৃশ্যের মধ্য দিয়েও এ ভাবধারা ফুটে উঠেছে। যেমন, 'যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে, তাদের মাথার ওপর দিয়ে এমন গরম পানি ঢালা হবে, যার দরুন তাদের পেটের নাড়িভুড়ি ও শরীরের চামড়া গলে যাবে। (আয়াত ১৯-২২)

আল্লাহর সাথে যারা শরীক করে তাদের উদাহরণের মধ্য দিয়েও এ ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। যথা,

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিকে পড়লো। তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো............. ।' (আয়াত ৩১)

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হয়, তার আচরণের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এভাবে,

'যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূলকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে কখনো সাহায্য করবেন না, সে যেন আকাশ পর্যন্ত একটা রশি টানিয়ে নেয়, তারপর তা কেটে দেয়। অতপর সে যেন ভেবে দেখে তার এ কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।' (আয়াত ১৫)

আর যেসব নগরবাসীকে তাদের অত্যাচার অনাচারের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে ৪৫ নং আয়াতে।

এসব ভীতিপ্রদ দৃশ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন আদেশ ও বিধি নিষেধ, শক্তি দ্বারা প্রতিরোধের যৌক্তিকতা, সাহায্য ও বিজয়ের আশ্বাস এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও তথাকথিত শরীকদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে সূরার বিভিন্ন জায়গায়। প্রথমে আদেশ ও বিধি নিষেধ জারী করা হয়েছে এভাবে,

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে– যাদের ওপর আক্রমণ করা হয়। (আয়াত ৩৯-৪১)

দ্বিতীয় পর্যায়ে তথাকথিত শরীকদের অক্ষমতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'হে মানব জাতি, একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে শোনো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করো, তারা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না............... । (আয়াত ৭৩, ৭৪)

আর এই দুই বিষয়ের মাঝখানে রয়েছে তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশাবলী, যেমন

'হে মানব সকল, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মর্যাদা দান করে, তার সে কাজ অন্তরের আল্লাহভীতির অন্তর্ভুক্ত।'.............. 'অতএব তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করো। সুসংবাদ দাও সেই অনুগতদেরকে, যাদের সামনে আল্লাহর প্রসংগ আলোচিত হলে তাদের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে .... (কোরবানীর জন্তুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, আল্লাহর কাছে পৌছে শুধু তোমাদের ভয়।'

এছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবালীর পর্যালোচনা, কেয়ামতের বিভিন্ন দৃশ্য, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের বৃত্তান্ত, আরো রয়েছে বিভিন্ন উদাহরণ, শিক্ষামূলক, বর্ণনামূলক ও মননশীল পর্যালোচনা। এ সবের উদ্দেশ্য হলো পাঠক শ্রোতার মনমগযে ঈমান, আল্লাহভীতি, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের প্রেরণা সৃষ্টি করা। এই হলো সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র সূরাটাকে মোটামুটিভাবে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম অধ্যায়টা শুরু হয়েছে আল্লাহকে ও কেয়ামতের ভয়াবহ ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলীকে ভয় করার জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে সর্বাত্মক আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। তারপর এই ভীতির পটভূমিতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে না জেনে শুনে তর্ক করার সমালোচনা করা হয়েছে। নিন্দা করা হয়েছে সেই অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণের যার অনুসরণে বিপথগামিতা অনিবার্য।

তারপর মাতৃগর্ভে মানব ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর ও বিবর্তন এবং উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে তা দ্বারা আখেরাতের প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করা হয়েছে। আর আবহমান কাল ব্যাপী বিরাজিত এই পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের সাথে আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা, তাঁর অসীম ক্ষমতা, কেয়ামতের অনিবার্যতা, কবর থেকে মানুষের জীবিত হয়ে পুনরুত্থানের মাঝে গভীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এ সবই চিরন্তন রীতি, শাশ্বত সত্য এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অতপর বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের এতো প্রমাণ থাকা সত্তেও কোনো যুক্তি-প্রমাণ ও জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে পার্থিব লাভ ক্ষতির নিরীখে আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের। বিপদ মুসিবতে পড়লেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনা করার এবং আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হওয়ার। এই অধ্যায়টার সমাপ্তি টানা হয়েছে ও সমালোচনা করা হয়েছে। এই বলে যে, বিপথগামিতা ও সুপথগামিতা আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ এবং বিবিধ রকমের আকীদা বিশ্বাস অবলম্বনকারীদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই কেয়ামতের দিন নিষ্পত্তি করে দেবেন। এই পর্যায়ে কাফেরদের কঠিন শাস্তি ও মোমেনদের বিপুল নিয়ামতের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তির সাথে সাথে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করা হচ্ছে। যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মাসজিদুল হারাম থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের সম্পর্কেই আলোচনা এসেছে এ অধ্যায়ের শুরুতে। এই মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জন্যে তৈরী করেছেন, চাই এর স্থায়ী অধিবাসী হোক বা অস্থায়ী অধিবাসী হোক। এই প্রসংগে তিনি কাবাঘর নির্মাণ, কাবাঘরকে তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ও শেরকের নোংরামি থেকে পবিত্র করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। হজ্জের কিছু বিধি আলোচনা করার পর অন্তরে আল্লাহভীতি জাগিয়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য আর এই অধ্যায়টার উপসংহার টানা হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে হুকুমদাতা প্রভু

মেনে নেয়ার 'অপরাধে' মোমেনদের ওপর আগ্রাসন চালানো হলে তা প্রতিহত করার জন্যে লড়াই করার অনুমতি দানের মাধ্যমে।

তৃতীয় অধ্যায়টার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের কাফেরদের পক্ষ থেকে নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের কিছু নমুনা ও তাদের ধ্বংসের কাহিনী। এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহর চিরাচরিত নীতি বর্ণনা করা, ক্রমগত বিরোধিতা ও উপেক্ষায় বিব্রত রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান ও চূড়ান্ত বিজয়ের আশ্বাস দান। অনুরূপভাবে দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে নবী ও রসূলের বিরুদ্ধে শয়তানের নানা ধরনের কুটিল ষড়যন্ত্র, তাদেরকে দাওয়াতের পথে টিকে থাকার জন্যে আল্লাহর সাহায্য। তাঁর আয়াতগুলোকে অবিকৃতভাবে বহাল রাখার পদক্ষেপও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যাতে মোমেনদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা ও অহংকারীরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

সর্বশেষ অধ্যায়টাতে আলোচিত হয়েছে আগ্রাসন ও অত্যাচারের শিকার সংগ্রামরত মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতির উল্লেখের অব্যবহিত পরই প্রকৃতির জগতে মহান আল্লাহর অসীম শক্তির যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এরই পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে মোশরেকদের উপাসিত দেব-দেবীর অক্ষমতার কথা। অতপর এক আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জেহাদ করা। একমাত্র আল্লাহকেই সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে যে আকীদা ও আদর্শের প্রতি তারা অনুগত রয়েছে তার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে তৎপর হওয়ার জোরদার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এই অধ্যায় ও সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি

এভাবে সূরার আলোচিত বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বিত ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত হয়েছে। এবার প্রথম অধ্যায়টার তাফসীরে মনোনিবেশ করছি,

'হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, নিশ্চয়ই কেয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। .... আয়াত ১-২)

এক নিদারুণ ভীতিপ্রদ দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়ে শুরু হয়েছে এই মন কাঁপানো দৃশ্যের বর্ণনা।

প্রথম আয়াতে 'হে মানব জাতি' বলে সম্বোধন করে আল্লাহকে ভয় করতে ও কেয়ামতের বিপর্যয়কর দিন সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এভাবে প্রথমে সংক্ষেপে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ওই ভাষায় প্রকাশ করা দুসাধ্য এমন এক ভীতিপ্রদ অজানা ঘটনার আভাষ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ওটা একটা ভূকম্পন এবং সেই ভূমিকম্প একটা ভয়ংকর ব্যাপার।' এর কোনো সুনির্দিষ্ট স্বরূপ বা সংজ্ঞা দেয়া হয়নি।

এরপর একে একে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে। এ বিবরণে দেখা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনার চেয়েও তা ভয়াবহ। এ যেন এমন একটা ঘটনা, যা একজন মাকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলিয়ে দেয়, সে চোখ মেলে তাকায়, কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না, সে কর্মতৎপর, কিন্তু হতবুদ্ধি ও দিশেহারা। এ যেন এমন এক দৃশ্য, যেখানে গর্ভবতীদের ভয়ের আতিশয্যে গর্ভপাত ঘটে যায়, যেখানে মানুষকে মাতাল বলে মনে হয় অথচ আসলে তারা মাতাল নয়। তাদের হতভম্বসুলভ দৃষ্টিতে এবং দিশেহারার মতো চলাফেরায় মাতলামির আলামত ফুটে ওঠে। এসব বিচিত্র দৃশ্যে পরিপূর্ণ ঘটনা যেন তেলাওয়াতের মুহূর্তে চোখে দেখা যায়, কল্পনায়

ভাসে, আবার আতংকে তা মন থেকে অপসৃত হয়ে যায়। ফলে দৃশ্যটা পূর্ণতা লাভ করে না। কেয়ামতের এ আতংকময় দৃশ্যকে তার আকৃতি ও আয়তন দিয়ে মাপা যায় না, তবে মানব মনের ওপর তার যে প্রভাব পড়ে, তা দিয়ে পরিমাপ করা যায়। যেমন মা কর্তৃক স্বীয় দুগ্ধ পানরত শিশুকে ভুলে যাওয়া একমাত্র এমন আতংকের কারণেই সম্ভব, যা তার হুশ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়। আনুরূপভাবে গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটা এবং প্রকৃতস্থ মানুষেরও মাতালের মতো হয়ে যাওয়াও কেবল আতংকের তীব্রতার দরুণই সম্ভবপর হয়ে থাকে। 'কিন্তু আল্লাহর আযাব বড়োই সাংঘাতিক।' বস্তুত এ এক লোমহর্ষক ও হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য।

এহেন ভয়ংকর ও আতংকজনক দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে যে, এসব সত্তেও এমন বহু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হবার স্পর্ধা দেখায় এবং আল্লাহকে ভয় করার কোনো তাগিদ অনুভব করে না। (আয়াত ৩-৪)

আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা, সর্বাত্মক জ্ঞান বা তাঁর অন্য যে কোনো গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিতর্ক করা বুঝায়। যে ভয়াবহ দিন মানব জাতির জন্যে অপেক্ষা করছে এবং যে দিনের বিচার ফয়সালা ও আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া একমাত্র আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির ওপরই নির্ভরশীল, সেই দিনের কোনো ভয়ভীতির তোয়াক্কা না করে এইসব জিনিসের যে কোনো একটা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কোনো বিবেকবান ও সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে বড়োই বিস্ময়কর।

এই বিতর্ক কোনো জ্ঞান বুদ্ধির ভিত্তিতে করা হলেও একটা কথা ছিলো। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মুর্খতা প্রসূত বিতর্ক। এ বিতর্কের পেছনে রয়েছে যুক্তি ও জ্ঞানের পরিবর্তে নিছক ধৃষ্টতা ও শয়তানের অনুসরণজনিত বিভ্রান্তি। এ ধরনের লোকেরা নিছক ঝোঁকের বশে ও ঔদ্ধত্যের বশে আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে।

'আর বিভ্রান্ত শয়তানের অনুসরণ করে।' অর্থাৎ সত্যদ্রোহী, একগুঁয়ে, হঠকারী শয়তানের অনুসরণ করে। 'তার ভাগ্যে এটাই বরাদ্দ হয়ে আছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে তাকে বিপথগামীই করবে এবং জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে যাবে।'

অর্থাৎ শয়তানের পক্ষে এটাই অবধারিত যে, সে তার অনুসারীকে সত্য ও ন্যায়ের বিপরীত পথে চালাবে ও জাহান্নামের আযাবের শিকার বানাবে। এখানে শয়তান কর্তৃক জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে বুঝাতে 'হেদায়াত' শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে কটাক্ষপূর্ণ পরিহাসচ্ছলে। ভেবে দেখুন, শয়তান কেমন সর্বনাশা হেদায়াত করে থাকে!

তারপরও কি মানুষ আখেরাত সম্পর্কে সংশয়াপন্ন ও সন্দিহান? আখেরাতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হলে তাদের ভেবে দেখা উচিত কিভাবে জীবনের সৃষ্টি হয়, কিভাবে তাদের জন্ম ও বিকাশ ঘটলো, তাদের চারপাশের জগতে কিসের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে তো এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, আখেরাতের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটা একেবারেই সহজ ও স্বাভাবিক। অথচ তারা নিজেদের ভেতরে ও চারপাশের জগতে বিদ্যমান এসব সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পর্কে উদাসীন।

বুদ্ধিভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরুত্থানের দর্শন

'হে মানব জাতি, তোমরা যদি পরকাল সম্পর্কে সন্দেহে থেকে থাকো.........।' (আয়াত ৫)

বস্তুত আখেরাত হচ্ছে মানুষের সাবেক পার্থিব জীবনেরই পুনরাবৃত্তি। মানবীয় বিচারবিবেচনায় ও জীবনের প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা পরবর্তী সৃষ্টি সহজতর। আল্লাহর অসীম শক্তির কাছে তো কোনো জিনিস অপেক্ষাকৃত কঠিন বা সহজ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর কাছে প্রথম

সৃষ্টি বা পুনসৃষ্টি উভয়ের জন্যেই একটা 'হও' শব্দ উচ্চারণই যথেষ্ট। 'তিনি যখন কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটানোর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে শুধু 'হও' বলেন, অমনি তা হয়ে যায়।' (সূরা ইয়াসীন)

কিন্তু কোরআন মানুষকে তাদের নিজস্ব মাপকাঠি, যুক্তি ও উপলব্ধি অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করে। তাই সে তার চোখে দেখা প্রতিটি জিনিসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলে। মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি স্থানে যা কিছুই দেখতে পায়, তা যদি সে খোলা মন, মুক্ত বিবেক ও সক্রিয় উপলব্ধি নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে প্রতিটা জিনিসকেই তার কাছে অলৌকিক মনে হবে। কিন্তু মানুষ তেমন গভীর চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে কোনো জিনিস দেখে না। তার দৃষ্টি নিতান্ত দায়সারা ও ভাসাভাসাভাবে সব কিছুর ওপর দিয়ে চলে যায়। ফলে কোথাও লক্ষণীয় কিছু তার চোখে পড়ে না।

প্রশ্ন এই যে, মানুষ কে? সে কোথা থেকে এসেছে? কিভাবে জন্ম নিয়েছে সে এবং তাকে কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করে এপর্যন্ত আসতে হয়েছে?

'আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।'

মানুষ এই পৃথিবীরই সন্তান। এর মাটি থেকেই সে জন্মেছে এবং জীবন ধারণ করেছে। তার দেহে এমন কোনো উপাদান নেই, যা এই ভূখন্ডের দেহে নেই। কেবল একটা উপাদান এর ব্যতিক্রম। তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সেই সুক্ষ্ম ও রহস্যময় বস্তু অর্থাৎ আল্লাহর ফুঁকে দেয়া আত্মা বা প্রাণ। এ জিনিসটার কল্যাণেই সে মাটির উপাদান থেকে পৃথক হয়েছে। অন্যথায় মূলত সে উপাদানগত, কাঠামোগত ও খাদ্যগত দিক থেকে মাটি থেকেই তৈরী। তার সবকটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান মাটি থেকেই সৃষ্ট।

কিন্তু কোথায় সেই মাটি আর কোথায় এই মানুষ? সেই যে সুঠাম, কর্মক্ষম ও কর্মতৎপর, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত ও প্রভাব বিস্তারকারী সৃষ্টি মানুষের পা থাকে ভূ-পৃষ্ঠে, কিন্তু মন থাকে আকাশচুম্বী এবং নিজের চিন্তা ও মননশক্তি দ্বারা বস্তুজগতের বাইরের, এমনকি যে মাটি থেকে সে সৃজিত, সেই মাটিরও বাইরের বহু জিনিস সৃষ্টি করে, সেই মানুষ অতি নগণ্য মাটি থেকে সৃজিত। অথচ সেই মাটির সাথে তার কী বিরাট প্রভেদ! যিনি এই সৃষ্টিকে সর্বপ্রথম মাটি দিয়ে গড়েছেন, তার পক্ষে তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কিছুতেই অসম্ভব হতে পারে না।

'অতপর বীর্য থেকে, অতপর জমাট রক্ত থেকে, অতপর মাংসপিন্ড থেকে, যা পূর্ণাকৃতির অথবা অপূর্ণাকৃতির হয়ে থাকে– তোমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যা ইচ্ছা করি গর্ভে স্থিত রাখি। অতপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে মাতৃগর্ভ থেকে বের করি।'

সাধারণ মাটির প্রাথমিক উপাদানের মাঝে এবং জীবন্ত শুক্রকীটগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বীর্যের মাঝে বিরাট ব্যবধান। এর ভেতরে লুকিয়ে আছে জীবনের গভীরতম রহস্য। এই রহস্য সম্পর্কে মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরেও উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য জানতে পারেনি। আর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তে সাধারণ উপাদানগুলো যে অসংখ্য জীবন্ত কোষে পরিণত হয়েছে, তাও মানুষ জানতে পারেনি। এগুলোর জন্ম ও সৃষ্টির নিগুঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও তার সাধ্যের বাইরে তা সে যতোই আকাংখা করুক না কেন। সে বড়জোর এর জন্মের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও নিবন্ধীকরণই করতে পারে।

এরপর অবশিষ্ট থাকে আর একটা রহস্য। সেটা হলো, ওই বীর্য কিভাবে জমাট রক্তে, জমাট রক্ত কিভাবে গোশতের টুকরোয় এবং গোশতের টুকরো কিভাবে মানুষে পরিণত হয়, সেই রহস্য।

বীর্য জিনিসটা কী? ওটা তো পুরুষের তরল বীজ। এই তরল বীজের একটা ফোঁটায় হাজার হাজার শুক্রকীট থাকে। এর মধ্য থেকে কোনো একটামাত্র কীটের সাথে নারীর জরায়ুতে অবস্থানরত ডিম্বানুর মিলন ঘটে এবং এই সংযুক্ত উপাদান বা বীজটা জরায়ুর প্রাচীরের সাথে যুক্ত হয়।

জরায়ুর প্রাচীরের সাথে যুক্ত এই অতি ক্ষুদ্র সংযুক্ত বীজটাই মহান আল্লাহর অসীম শক্তি বলে ভবিষ্যতের মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, চাই সেটা দৈহিক বৈশিষ্ট্য হোক-যথা লম্বা বা বেঁটে হওয়া, চিকন বা মোটা হওয়া, সুদর্শন বা ভাবাবেগজনিত বৈশিষ্ট্য হোক যেমন আকর্ষণ ও প্রবণতা, স্বভাব ও দৃষ্টিভংগি, যোগ্যতা ও বিপথগামিতা ইত্যাদি।

কে ভাবতে পারে বা বিশ্বাস করতে পারে যে,এতোসব গুণবৈশিষ্ট্য সে ক্ষুদ্র বিন্দুটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে? কে কল্পনা করতে পারে যে, সে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিন্দুটাই আজকের এই বহুমুখী বৈশিষ্ট্যধারী মানুষ, যার প্রতিজন অপরজন থেকে ভিন্ন? পৃথিবীতে কোনো দু'জন মানুষও কি কোনো কালেও হুবহু একই রকম হয়েছে?

তারপর জমাট রক্তের মাংস পিন্ডে রূপান্তর লক্ষ্য করুন। প্রথমে জমাট রক্তের এই টুকরোর কোনো রূপও থাকে না, আকৃতিও থাকে না। এরপর এর ভেতরে চলতে থাকে সৃজন প্রক্রিয়া। একপর্যায়ে তা একটা মাংস পরিবেষ্টিত হাড্ডিতে রূপান্তরিত হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। আর যদি তার পূর্ণাংগ মানবাকৃতি লাভ আল্লাহর ইচ্ছা না হয়ে থাকে, তাহলে এই সুনির্দিষ্ট রূপ বা আকৃতি লাভের আগেই জরায়ু তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'তোমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্যে'............

অর্থাৎ আমার ক্ষমতার প্রমাণ প্রকাশ করার জন্যে। কেননা একটা মাংস পিন্ডে ভবিষ্যত মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে মাংস পিন্ড ও মানব শিশুর মাঝে একটা বিরতি রয়েছে বুঝানোর জন্যেই, 'তোমাদের কাছে আমার ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যে' এই মধ্যবর্তী কথাটা জুড়ে দেয়া হয়েছে। এরপর পুনরায় দ্রুণের বিবর্তন ধারা বর্ণনা করা হয়েছে,

'আর আমি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে যা ইচ্ছা করি স্থিত রাখি।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে মানব শিশুকে পূর্ণ পরিণত করতে ইচ্ছা করেন, তাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় না আসা পর্যন্ত জরায়ুতেই রাখেন। 'অতপর তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করি।' প্রথম স্তর ও এই শেষ স্তরের মাঝে কী বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করুন।

সময়ের দিক দিয়ে এই ব্যবধান সাধারণত নয় মাস ব্যাপী হয়ে থাকে। কিন্তু শুক্রকীটের প্রকৃতি ও শিশুর প্রকৃতির পার্থক্যের দিক দিয়ে এই ব্যবধান অনেক বেশী। শুক্রকীটকে তো খালি চোখে দেখাই যায় না। অথচ সেটাই একটা বহুমুখী দোষগুণ বিশিষ্ট, নানা অংগ প্রত্যংগ সমন্বিত, বিচিত্র লক্ষণ ও আলামতের ধারক। বিবিধ যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী এবং বিভিন্ন স্বভাব ও মনোভাব সম্বলিত জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ ধারণ করে।

এই দুই অবস্থার মাঝে যে ব্যবধান, তা পাড়ি দিতে গিয়ে যে কোনো বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষকে অসীম শক্তিশালী স্রষ্টার ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর সামনে বারবার থমকে দাঁড়াতে হয়।

এই শিশু যখন চোখের আড়ালের সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে এতোসব বড়ো বড়ো অলৌকিক স্তর অতিক্রম করে বের হয়ে আসে ও পৃথিবীর আলো দেখে, তারপর শিশু ক্রমান্বয়ে যেসব স্তর পার হতে থাকে, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে।

'অতপর যেন তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো।'...............

অর্থাৎ তোমরা দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি অর্জন করো। লক্ষণীয় বিষয়, একটা সদ্যপ্রসূত শিশু ও একজন পরিণত বয়সের মানুষের মাঝে সময় বা বয়সের ব্যবধান যতোটা, তার চেয়ে ঢের বেশী থাকে গুণগত ব্যবধান। অথচ অসীম শক্তিশালী স্রষ্টার যে সুদক্ষ উদ্ভাবনী হাত সদ্যজাত শিশুর মধ্যে পরিণত মানুষের যাবতীয় গুণবৈশিষ্ট্য এবং যাবতীয় সম্ভাবনাময় যোগ্যতা ও প্রতিভার সমাবেশ ঘটায়, সেই উদ্ভাবনী হাতই সে ব্যবধান অনায়াসে অতিক্রম করে। কেননা এই কুশলী হাতই ইতিপূর্বে জরায়ুর প্রাচীরে সংরক্ষিত তুচ্ছ পানির বিন্দুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন মানব শিশুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য।

'আর তোমাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা মারা যায়, আর তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, ফলে জানা কথাও সে মনে রাখতে পারে না।'

যে ব্যক্তি মারা যায়, সেতো প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্যে নির্ধারিত পরিণত স্তরে পৌঁছে যায়। আর যাকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, সে সকলের চিন্তা-গবেষণার খোরাক যোগাতে থাকে। জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করার পরও সে আবেগ ও ঝোঁকের দিক দিয়ে, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়ে এবং দক্ষতা ও কুশলতার দিক দিয়ে পুনরায় একটা শিশুর রূপ ধারণ করে। সে সামান্যতম বস্তুতেই খুশীতে গদগদ হয়ে যায়, আবার সামান্য কারণেই হাউমাউ করে কাঁদে। স্মরণ শক্তির ক্ষেত্রেও শিশু হয়ে যায়। ফলে কিছুই মনে রাখতে পারে না। সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলোকে সে পরস্পরের সাথে যুক্ত করতে পারে না, ফলে সব কিছু তার কাছে বিচ্ছিন্ন থেকে যায় এবং তার অনুভূতি ও উপলব্ধি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। সে তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতাকে ভুলে যায়। 'ফলে জানা কথাও সে মনে রাখতে পারে না।' তার মগয থেকে ও স্মৃতি ভান্ডার থেকে সেই জ্ঞানও হারিয়ে যায় যাকে সম্বল করে কখনো কখনো সে ঔদ্ধত্য ও দম্ভ দেখিয়েছে এবং আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী নিয়ে অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে সৃষ্টির বিভিন্ন দৃশ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের সত্ত্বার অভ্যন্তরে বিরাজমান বিভিন্ন অংশের দৃশ্য,

'আর তুমি পৃথিবীকে দেখতে পাও শুকনো, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ, শিহরিত ও উর্বর হয় এবং নানা রকমের মনোহর উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।'

'হানেদাতান' শব্দটার মূল ধাতু হচ্ছে 'হুমুদ'। এর আভিধানিক অর্থ শুকনো অবস্থা, আর মূলত এ দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী অবস্থাকে বুঝায়। বৃষ্টির আগে মাটির অবস্থা, এ রকমই হয়ে থাকে। পানিই হলো জীবন ও প্রাণীর মৌল উপাদান। মাটির ওপর যখনই বৃষ্টি নামে, অমনি তা 'শিহরিত ও উর্বর' হয়। এ এক অপূর্ব তৎপরতা, কোরআনে যার উল্লেখ করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ারও বহু শতাব্দী আগে। শুকনো মাটির ওপর পানি পড়লেই তা একই সাথে শিহরিত ও স্পন্দিত হয়। পানি পান করে তা কিঞ্চিত স্ফীত হয় ও সতেজ হয়।

'অতপর সেই মাটি সজীব হয়ে নানারকমের মনোহর উদ্ভিদ জন্মায়।'

শুকনো নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর মাটির সজীব, সতেজ ও শস্য শ্যামল হওয়ার চেয়ে মনোহর আর কী হতে পারে।

কোরআনে এভাবেই সকল প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বর্ণনা দেয় এবং তাদের সকলকে আল্লাহর একটা নিদর্শনের আওতায় একত্রিত করে। এটা এই অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি এক বিস্ময়কর সংকেত এবং জীবনের উপাদান ও তার পেছনে সক্রিয় স্রষ্টার ইচ্ছার একত্বের অকাট্য প্রমাণ, যা মাটি, মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য।

'এ সবের কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালাই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দেন। (আয়াত ৬)

অর্থাৎ মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি, ভ্রুণের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন, মানব শিশুর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ বৃদ্ধি এবং শুকনো নির্জীব হয়ে যাওয়া মাটি থেকে জীবনের উন্মেষ ও উদগমন এই সত্যের সাথে সম্পৃক্ত যে, আল্লাহ তায়ালাই সত্য। তিনি সত্য বলেই তার সৃষ্টির নিয়মনীতিও চির সত্য ও অপরিবর্তনীয় এবং এই বিবর্তন ও বিকাশ প্রক্রিয়া তাঁর এই চিরন্তন সৃষ্টির নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। জীবনের বিকাশ বৃদ্ধি ও বিবর্তনের এই পর্যায়ক্রমিক ধারা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এর পেছনে মহান স্রষ্টার সেই অমোঘ ইচ্ছাই সক্রিয় রয়েছে, যা এই প্রক্রিয়াকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিচ্ছে, এর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করছে এবং স্তরগুলো চিহ্নিত করছে। বস্তুত আল্লাহর সত্য হওয়া ও এই নিরবিচ্ছিন্ন সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, গভীর ও জোরদার।

'এবং তিনিই মৃতদেরকে জীবন দেন।' .... মৃতকে জীবন দান পুনরুজ্জীবনেরই সমার্থক। যিনি প্রথমবার জীবন দান করেন তিনিই পরবর্তীবার আখেরাতে পুনরুজ্জীবিত করেন।

'এবং আল্লাহ তায়ালাই কবরে শায়িতদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।'

যাতে তারা তাদের সমুচিত কর্মফল লাভ করে। বস্তুত এই পুনরুজ্জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরই অনিবার্য দাবী।

ভ্রুণ যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করে এবং পৃথিবীতে আসার পর শিশু যে সমস্ত স্তর পার হয়, সেগুলো থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, যে মহান স্রষ্টার ইচ্ছা এই স্তরগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে, তিনি মানুষকে এমন এক জায়গায় পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর, যেখানে গিয়ে মানুষ তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। পার্থিব জীবনে সে এই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কেননা এখানে সে কিছুটা অগ্রগতি লাভ করে থেমে যায় এবং আবার পূর্বের স্তরে ফিরে যায়, যেখানে সে জানা জিনিসও মনে রাখতে পারে না এবং শিশুর মতো হয়ে যায়। সুতরাং এমন একটা জগত অপরিহার্য, যেখানে মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

সুতরাং পার্থিব জীবনের ক্রমবিকাশের এই স্তরগুলো আখেরাতের দুটো প্রমাণ বহন করে। প্রথমত, যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সক্ষম, তিনি পুনসৃষ্টিতেও সমর্থ। দ্বিতীয়ত, মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাটাই এমন যে, তার সর্বশেষ পূর্ণতার স্তর ইহকালে নয় বরং পরকালে অবস্থিত।

এভাবে সৃষ্টি ও পুনসৃষ্টির নিয়ম, ইহকাল ও পরকালের নিয়ম এবং হিসাব ও কর্মফলের নিয়ম একই সূত্রে গ্রোথিত। এসবই অসীম ক্ষমতাধর, মহাকুশলী স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁর অস্তিত্ব অবিসংবাদিত।

দলীলবিহীন তর্ক ও স্বার্থবাদীতা ঈমানের পরিপন্থি

এতো সব অকাট্য প্রমাণাদি থাকা সত্তেও কেউ কেউ আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে। (আয়াত ৮, ৯ ও ১০)

এসব অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও আল্লাহকে নিয়ে বিতর্ক তোলা এমনিতেই একটা বিস্ময়কর ও অবাঞ্ছিত ব্যাপার। উপরন্তু তা অজ্ঞতাপ্রসূত, প্রমাণবিহীন এবং কোনো প্রামাণ্য পুস্তকের সাক্ষ্যবিহীন এক উদ্ভট ও ভিত্তিহীন বিতর্ক।

যে ধরনের মানুষ এই অন্যায় বিতর্ক তোলে, তার ধরণটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই বলে যে, সে অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে, যেহেতু তার কাছে কোনো সংগত যুক্তি নেই, তাই সেই শূন্যতা পূরণ করতে গিয়ে সে এইসব দম্ভ ও আস্ফালনের আশ্রয় নেয়।

'যাতে সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করতে পারে।'

অর্থাৎ সে নিজে বিপথগামী হয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং অন্যদেরকেও বিপথগামী করে।

এ ধরনের দম্ভ, আস্ফালন, যা নিজেকে ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করে, তা প্রতিহত ও চূর্ণ করা অপরিহার্য 'তাঁর জন্যে পৃথিবীতে অপমান রয়েছে।' বস্তুত অপমান হলো অহংকারের বিপরীত। আজ হোক বা কাল হোক, আল্লাহ তায়ালা সেই অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ না করে ছাড়েন না, যারা নিজেরাও বিপথগামী অন্যদেরকেও বিপথগামী করে। কখনো কখনো তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দেন, যাতে অপমান আরো ভয়ংকর হয়। আর পরকালে তাদের জন্যে যে আযাব রয়েছে, সেটা তো আরো কঠিন ও আরো যন্ত্রণাদায়ক।

'আর তাকে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে দহনের শাস্তি দেবো।'

পরক্ষণেই এই হুমকি যেন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। আয়াতের ভাষায় সামান্য পরিবর্তন করেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

'এ সব তোমারই কর্মফল। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর অত্যাচারী নন।'

যেন দহনের আযাবের সাথে সাথে ধমক দিয়েও শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

পরবর্তী আয়াতে আর এক ধরনের মানুষের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। এই নমুনাটা যদিও তৎকালে আরবে দেখা যেতো। কিন্তু এটা সকল যুগেই দেখা যায়। এই শ্রেণীটা ঈমানকে লাভ ও ক্ষতির মাপকাঠিতে পরিমাপ করে এবং একে বাজারের ব্যবসার মতো মনে করে।

কিছু লোক এমনও আছে যারা দ্বিধা-দ্বন্দের সাথে আল্লাহর এবাদাত করে। যদি তার কোনো পার্থিব স্বার্থ লাভ হয় তাহলে সে প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি তার ওপর কোনো বিপদ আসে, তবে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। (আয়াত ১২, ১২ ও ১৩)

আসলে মোমেনের জীবনে ঈমানই হচ্ছে স্থির ও অবিচল মানদন্ড– পার্থিব লাভ ক্ষতি নয়। তার চারপাশের গোটা দুনিয়া হাজারো ডিগবাজি খাক, সে এই মানদন্ডের ওপর অবিচল ও অনড় থাকবে। যতো বিপর্যয় আসুক, যতো দুর্যোগ এসে তার চারপাশের সহায়-সম্পদকে তছনছ করে দিক, সে অটল থাকবেই।

মোমেনের জীবনে ঈমান, আকীদা ও আদর্শের মূল্য এ রকমই। তাই তার ওপর মোমেনকে অটল অনড় হয়ে থাকতে হবে। তার কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার অবকাশ নেই এবং কোনো পুরস্কারের অপেক্ষায় থাকার সুযোগ নেই। কেননা ঈমান নিজেই নিজের পুরস্কার। এটা মোমেনের সহায় ও আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তায়ালা তার হেদায়াত লাভের জন্যে ও প্রশান্তি লাভের জন্যে ঈমানকে একটা মস্ত আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিয়েছেন। তাই মোমেন উপলব্ধি করে ঈমানের প্রকৃত মূল্য কী ঈমান তার পুরস্কার কতো বড়ো যখন সে তার চারপাশের অন্য সবাইকে দেখতে পায় বাতাসের টানে, স্বার্থের টানে ও অস্থিরতার চাপে তাদের নীতি ও অবস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। অথচ সে নিজের আদর্শ ও ঈমানের ওপর স্থির ও অবিচল, প্রশান্তি ও পরিতৃপ্ত এবং আল্লাহর প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত ও একাত্ম।

পক্ষান্তরে যে শ্রেণীটার কথা এখানে বলা হয়েছে, তারা ঈমানকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে, যদি তার কোনো পার্থিব স্বার্থ লাভ ঘটে, তাহলে সে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। আর বলে, ঈমান

বড়ো ভালো জিনিস। এ দ্বারা ফায়দা পাওয়া যায়, ক্ষতি দূর করা যায়, ব্যবসায়ে লাভবান হওয়া যায়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপর্যয় আসে, তাহলে সে পেছনে ফিরে যায়, তার দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুনিয়ার ক্ষতি হয় এ জন্যে যে, যে দুনিয়াবী মুসিবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তাতে সে সবর করেনি এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও সে সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করেনি। আর আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ জন্যে যে, সে তার ঈমান থেকে ফিরে গেছে এবং বিপথগামী হয়েছে।

কোরআনের বর্ণনাভংগিতে তার এবাদাতকালীন অবস্থাকে 'দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে' বলে চিত্রিত করেছে। অর্থাৎ তার ঈমান টলটলায়মান ও অস্থির। যেন প্রথম ধাক্কাতেই সে ঈমানের অবস্থান থেকে সরে পড়বে। এজন্যে বিপদের আক্রমণের সাথে সাথেই সে পিছিয়ে যায়।

বৈষয়িক লাভ ক্ষতির হিসেব কেবল ব্যবসায় বাণিজ্যেই করতে হয়। ঈমান ও আদর্শের ক্ষেত্রে এ হিসেব করা চলে না। আকীদা, বিশ্বাস ও আদর্শকে শর্তহীন ও পার্থিব স্বার্থমুক্ত হয়ে গ্রহণ করা উচিত। আদর্শকে গ্রহণ করতে হয় খোদ আদর্শের সৌন্দর্যের কারণেই এবং হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যেই। ঈমান ও আকীদা নিজেই তার পুরস্কার। এর বাইরে তার আর কোনো পুরস্কার কামনা করা উচিত নয়। কেননা এতে যে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, তা অন্য কিছুতেই পাওয়া যায় না।

মোমেন আল্লাহর এবাদাত করে নিছক তিনি তাকে হেদায়াত করেছেন এ কারণে কৃতজ্ঞতার বশে। এর জন্যে যদি সে আলাদা কোনো পুরস্কার পায়, তবে সেটা নিছক আল্লাহর মেহেরবানী। ঈমান ও এবাদাতের কারণে তাকে এর যোগ্য গন্য করা হয়।

মোমেন তার আল্লাহকে পরীক্ষা করে না। তিনি তার ভাগ্যে যা কিছুই বরদ্দ করেন, সে হাসি মুখে তা মেনে নেয়। সুখ দুঃখ যাই হোক তার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। কেননা সেটা তার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষা। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এটা কোনো ব্যবসা নয়। এটা হচ্ছে স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির আত্মসমর্পণ। আদেশদাতার কাছে অনুগত গোলামের আত্মসমর্পণ।

বিপদ এলেই যে ব্যক্তি ঈমান থেকে ফিরে যায়, সে নিসন্দেহে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়। 'ওটা হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি।' অর্থাৎ সে পরীক্ষার দরুন সহায় সম্পদ, স্বাস্থ্য বা সন্তানের যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা ছাড়াও শান্তি, তৃপ্তি ও সন্তোষেরও ক্ষতি ভোগ করে। ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা না থাকার কারণে এবং তার ফয়সালা মেনে না নেয়ার কারণে সে পরকালের সুখ, আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি আর কিছু হতে পারে না।

যে ব্যক্তি এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আল্লাহর এবাদাত করে, সে আল্লাহকে ছেড়ে কোথায় যাবে?

'সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যাদেরকে ডাকে তারা তার লাভও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।'

জাহেলী নিয়মে কোনো দেবতা বা মূর্তির কাছে সাহায্য চায়। সর্বকালের জাহেলী পদ্ধতিতে সে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্যের জন্যে হাত পাতে। মানুষ যখনই এক আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পথ পরিহার করে এবং আল্লাহর দেখানো পথে চলতে অস্বীকার করে, তখনই সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কাছে হাত পাতে, এ সবই গোমরাহী এবং নিস্ফল পন্থা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ সাহায্য দিতে পারে না।

'এ হচ্ছে অনেক দূরের গোমরাহী।' ....

অর্থাৎ সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে।

'সে এমন সত্ত্বাকে ডাকে যার উপকারের চেয়ে ক্ষতিই নিকটতর।'

'অর্থাৎ কোনো দেবতা, শয়তান অথবা মানুষের কাছে সাহায্য চায়। অথচ এদের কেউ ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না। বরং এদের দ্বারা ক্ষতির কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষতি দুই ধরনের, মানসিক ক্ষতি ও বাস্তব ক্ষতি। মানসিক ক্ষতি হলো যে, তা মনকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। মনের একাংশকে ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণায় ও অপরাংশকে হীনমন্যতায় ভারাক্রান্ত করে ফেলে। আর বাস্তব ক্ষতি হলো যে, কার্যত সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছুই অর্জন করে না। আর সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হলো, আখেরাতের ক্ষতি ও গোমরাহী। 'কত নিকৃষ্ট বন্ধু!' অর্থাৎ সেই ক্ষমতাহীন বন্ধু, যার কোনো ক্ষতি বা উপকার সাধনের শক্তি নেই। 'আর কত নিকৃষ্ট সাথী!' অর্থাৎ যার কারণে মানুষকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেসব মূর্তি ও দেব-দেবী বা নেতৃস্থানীয়দেরকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করে তারা সমভাবে মানুষের ক্ষতি ও অনিষ্টকারী। অবশ্য যারা বিভিন্ন মানুষকে খোদা বা খোদার ন্যায় মান্য গন্য বলে গ্রহণ করে, তারাও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সকল যুগে ও সকল স্থানে এ ধরনের মানুষের সাক্ষাত পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর এবাদাত করে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ তিনি তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে পার্থিব জীবনের যাবতীয় সহায়-সম্পদের চেয়ে উত্তম, মূল্যবান ও উপকারী সম্পদ সংরক্ষণ করেন। ঈমান আনার কারণে বিপদ-মুসিবতে পড়ে কেউ যদি পার্থিব সহায় সম্পদ হারিয়েও ফেলে, তথাপি আখেরাতে সে তার চেয়ে বহু মূল্যবান জান্নাতের অধিকারী হবে।

'নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান ....।' (আয়াত ১৪)

দুনিয়াতে কেউ যদি কোনো বিপদ মুসিবতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার অস্থির না হয়ে ধৈর্যধারণ করা উচিত, আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের আশায় থাকা উচিত, তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে, ক্ষতি পূরণ করে দিতে এবং তার বিকল্প ও প্রতিদান দিতে সক্ষম এই ভরসা রাখা উচিত।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর সাহায্য লাভ সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং হতাশ হয়ে যায়, তার যা ইচ্ছে তাই করুক। তাতে তার কোনো লাভ হবে না এবং তার সংকট মোচন হবে না।

১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন এভাবে-

'যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে কখনো সাহায্য করবেন না, সে যেন আকাশ পর্যন্ত একটা রশি টানিয়ে নেয়, তারপর তা কেটে দেয়। অতপর সে ভেবে দেখুক, তার এ কৌশল তার ক্রোধভাজন জিনিসটাকে দূর করে কিনা।'

এটা হচ্ছে মনের আক্রোশ ও তার আনুষংগিক আচরণগুলোর একটা সক্রিয় দৃশ্য। এ দৃশ্যটা মনের সর্বোচ্চ বিরক্তির অবস্থাকে প্রতিফলিত করছে। কারো ওপর যখন বিপদ-মুসিবত আসে এবং সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে না, তখনই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতিতে আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে যায়, তার সংকট মোচনের সকল সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় এবং তার বিপদ-মুসিবত ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কখনো দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো সাহায্য করবেন না, সে আকাশের সাথে একটা রশি টানিয়ে তাতে ঝুলতে থাকুক অথবা গলায় ফাঁস লাগাক। অতপর রশিটা কেটে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাক কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে ফাঁস লাগাক। তারপর দেখুক, তার এ কৌশল তার কষ্ট দূর করে কিনা।

মনে রাখতে হবে, বিপদ মুসিবতে আল্লাহর সাহায্যের আশা করা ছাড়া ধৈর্যধারণের আর কোনো উপায় থাকে না, আল্লাহর দিকে মন রুজু করা ছাড়া সংকট মোচন সম্ভব হয় না এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এ সময়ে যে কোনো হতাশা ব্যাঞ্জক তৎপরতা বিপদকে আরো তীব্র ও অসহনীয় করে তোলে। সুতরাং বিপন্ন ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হলো আল্লাহর রহমতের আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করা এবং যে সব কাজে আল্লাহর রহমত আশা করা যায় তা বেশী পরিমাণে করতে থাকা।

মোমেন ও কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনকে এ ধরনের হেদায়াত ও গোমরাহীর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর নমুনা তুলে ধরার জন্যে নাযিল করেছেন, যাতে আল্লাহ তায়ালা যাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তারা সঠিক পথের সন্ধান পায় ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন।

এ আয়াতের বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি হেদায়াত তথা সৎ পথে চলার ইচ্ছা করে, তাকে সৎ পথের সন্ধান দেয়া ও সৎ পথে চলার শক্তি যোগানোর পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছা সক্রিয় হয়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি গোমরাহী চায় তথা অসৎ পথে চলতে ইচ্ছা করে, আল্লাহর ইচ্ছা তারও সহযোগী ও সহায়ক হয়ে যায়। এখানে শুধু হেদায়াতের উল্লেখ করার কারণ হলো, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সাথে হেদায়াতকামী সুস্থ মনেরই সাযুজ্য বেশী।

তবে বিভিন্ন রকমের আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী দল ও শ্রেণীর ফায়সালা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা করবেন। কারা সঠিক বা বাতিল আকীদার অধিকারী, কারা সুপথগামী বা বিপথগামী, সেটা তিনিই ভালো জানেন। (আয়াত ১৭)

'যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী, যারা সাবী, যারা খৃষ্টান, যারা অগ্নি উপাসক ও যারা পৌত্তলিক, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন। তিনিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।'

এসব দল-উপদলের পরিচিতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকেই হেদায়াত করেন, যে হেদায়াত চায়, তাই সেই প্রসংগেই এই দলগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিই ভালো জানেন, কে সুপথগামী ও কে বিপথগামী। সকলের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তায় এবং তিনিই সব কিছুর চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন। তিনিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।

যেখানে মানুষ মাত্রেই নিজ নিজ চিন্তাধারা, ধারণা বিশ্বাস ও মনোভংগির অনুগামী, সেখানে মানুষ ছাড়া বাদ বাকী গোটা সৃষ্টি জগত নিজ জন্মগত ও স্বভাবগত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে স্বীয় স্রষ্টা মহান আল্লাহর মহা জাগতিক, প্রাকৃতিক নিয়মবিধির অনুগত এবং আল্লাহর সামনে সেজদারত। ১৮ নং আয়াতের বক্তব্য এটাই।

যে কোনো চিন্তাশীল মন এ আয়াত নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করে পারে না। এ আয়াতে মানুষের জানা অজানা বহু সৃষ্টি, মহাশূন্যের বহু জ্যোতিষ্ক, বহু পাহাড় পর্বত, বৃক্ষ লতা ও পশু

পাখীকে মানব জাতি অধ্যুষিত পৃথিবীতে সমবেত ও একমাত্র আল্লাহর সামনে ঐক্যবদ্ধভাবে সেজদারত দেখানো হয়েছে, আর এরই পাশাপাশি একমাত্র মানুষকেই উপস্থাপন করা হয়েছে তার ব্যতিক্রম হিসাবে, এই সমগ্র সৃষ্টি জগতের কাতারে একমাত্র বিবদমান সৃষ্টি হিসাবে– যার কেউ সেজদা করে, কেউ করে না। তাই এই মানুষ এ মহাবিশ্বে এক আজব ও অদ্ভুত সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এখানে এ কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, যে আযাবের কবলে পড়বে, সে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হবে। যাকে আল্লাহ তায়ালা অপমানিত করেন, তাকে সম্মান করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানিত না হলে আর কোথা থেকেও সম্মান জোটে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো অনুগত হয়, সে চরম অধপতিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে।

কাফেরদের মর্মান্তিক শাস্তির কিছু দৃশ্য

এরপর তুলে ধরা হচ্ছে কেয়ামতের একটা দৃশ্যকে একটা বাস্তব ও চাক্ষুস দৃশ্য হিসেবে। এতে সম্মান ও অবমাননার চিত্র ফুটে উঠেছে,

‘এই হচ্ছে দুই বিবদমান দল........। (আয়াত ১৯-২৩)

এ আয়াতগুলোতে একটা মর্মান্তিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে। যা তৎপরতায়ও পরিপূর্ণ এবং প্রেরণাময় কল্পনাও তাকে দীর্ঘায়িত করেছে! একদিকে আগুনের তৈরী পোশাক কেটে প্রস্তুত করা হয়েছে। অপরদিকে মাথায় ঢালার জন্যে গরম পানি প্রস্তুত, যা মাথায় ঢালা মাত্রই চামড়া ও নাড়িভুড়ি গলে যায়। এর পাশাপাশি রয়েছে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত লোহার লাঠি। আযাব ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে, অসহনীয় হয়ে উঠছে। ফলে কষ্টের দরুণ এক একবার জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু আবার তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং ধমক দিয়ে বলা হয়, ‘দগ্ধীভূত হওয়ার আযাব ভুগতে থাকো।’

কল্পনায় এই দৃশ্যকে যেন বারবার দেখানো হয়, ফলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও ফেরত পাঠানোর ভয়াবহ অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে যায় যাতে পুনরায় দৃশ্যটা দেখানো যায়।

কল্পনায় এই ভয়াবহ ক্রমবর্ধমান আযাবের দৃশ্য দেখাতে গিয়ে অপরদিকটা দেখানো বাদ রাখা হয়নি। কেননা আসল বিষয়টাই এই যে, আল্লাহর সামনে দুটো বিবদমান দল দাঁড়িয়ে যাবে। একটা হলো কাফেরদের দল, যাদের মর্মান্তিক পরিণতির দৃশ্য আমরা এই মাত্র দেখলাম। অপর দলটা মোমেনদের। তারা সেখানে জান্নাতে থাকবে। সেই জান্নাতের নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদের পোশাক আগুনের নয় রেশমের। তদুপরি তারা আরো বহু নয়নাভিরাম মনিমুক্তা ও স্বর্ণের অলংকারে সজ্জিত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রশংসনীয় কাজ ও উত্তম কথা বলার পথে চালিত করেছিলেন। তাই তাদের সৎ কথা ও সৎ কাজে কোনো কষ্ট হয়নি। ভালো কথা ও ভালো কাজ করার পথের সন্ধান পাওয়া একটা উল্লেখযোগ্য নেয়ামত, যা সুখ শান্তির উপকরণগুলোর অন্যতম।

আল্লাহকে নিয়ে দ্বন্দ্বের এ হচ্ছে শেষ পরিণতি। দুই দলের দুই ধরনের পরিণতি। কাজেই সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী যার জন্যে যথেষ্ট হয় না, তার এই পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। যারা কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়া আল্লাহকে নিয়ে বাদানুবাদ করে, এ পরিণতি থেকে তাদের জন্যে যথেষ্ট শিক্ষণীয় রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ
بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

২৫. অবশ্যই যারা (নিজেরা) কুফরী করে এবং (অন্যদেরও) আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, (বাধা দেয়) মানুষদের মাসজিদুল হারাম (-এর তাওয়াফ ও যেয়ারত) থেকে- যাকে আমি স্থানীয় অস্থানীয় নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একই রকম (মর্যাদার স্থান) বানিয়েছি (এমন লোকদের মনে রাখতে হবে); যারা তাতে (হারাম শরীফে) ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহবিরোধী কাজ করবে, আমি তাদের (সবাইকে) কঠিন আযাব আস্বাদন করাবো।

রুকু ৪

২৬. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন আমি ইববরাহীমকে এ (কাবা) ঘর নির্মাণের জন্যে স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম (তখন তাকে আদেশ দিয়েছিলাম), আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার (এ) ঘর তাদের জন্যে পবিত্র রেখো যারা (এর) তাওয়াফ করবে, যারা (এখানে নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে, রুকু করবে, সাজদা করবে। ২৭. (তাকে আরো আদেশ দিয়েছিলাম,) তুমি মানুষদের মাঝে হজ্জের ঘোষণা (প্রচার করে) দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্বপ্রকার দুর্বল উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে, (ছুটে আসে) দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে, ২৮. যাতে করে তারা তাদের নিজেদেরই ফায়দার জন্যে (সময়মতো) এখানে এসে হাযির হয় এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে (কোরবানী করার) সময় তার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন, অতপর (কোরবানীর) এ গোশত থেকে (কিছু) তোমরা (নিজেরা) খাবে, দুস্থ এবং অভাবগ্রস্তদেরও তার কিছু অংশ দিয়ে আহার করাবে, ২৯. অতপর তারা যেন এখানে এসে তাদের (যাবতীয়) ময়লা কালিমা দূর করে, নিজেদের মানতসমূহ পুরা করে, (বিশেষ করে) এ প্রাচীন ঘরটির যেন তারা তাওয়াফ করে।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ
الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ
بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩০. এ হচ্ছে (কাবা ঘর বানানোর) উদ্দেশ্য, যে কেউই আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) পবিত্র অনুষ্ঠানমালার সম্মান করে, এটা তার জন্যে তার মালিকের কাছে (একটি) উত্তম কাজ (বলে বিবেচিত হবে, একথাও মনে রেখো), সেসব জন্তু ছাড়া- সেগুলোর কথা তোমাদের ওপর (কোরআনে) পাঠ করা হয়েছে, অন্য সব চতুষ্পদ জন্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, অতএব তোমরা (এখন) মূর্তি (পূজা)-র অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থেকো এবং বেঁচে থেকো (সব ধরনের) মিথ্যা কথা থেকে, ৩১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিষ্ঠাবান হও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করে, তার অবস্থা হচ্ছে, সে যেন আসমান থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর (মাঝপথেই) কোনো পাখী যেন তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা (আসমান থেকে যমীনে পড়ার আগেই) বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরের কোনো (অজ্ঞাতনামা) স্থানে ফেলে দিলে। ৩২. এ হলো (মোশরেকদের পরিণাম, অপর দিকে) কেউ আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তার অন্তরের পরহেযগারীর মধ্যেই (শামিল) হবে। ৩৩. (হে মানুষ,) এসব (পশু) থেকে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নানাবিধ উপকার (গ্রহণ করার ব্যবস্থা) রয়েছে, অতপর (মনে রেখো,) তাদের (কোরবানীর) স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির সন্নিকটে!

রুকু ৫

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যে আমি (পশু) কোরবানীর এ নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে করে (সেই জাতির) লোকেরা সেসব পশুর ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে পারে, যা তিনি তাদের দান করেছেন; সুতরাং তোমাদের মাবুদ তো হচ্ছেন একজন, অতএব তোমরা তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো; (হে নবী,) তুমি (আমার) বিনীত বান্দাদের (সাফল্যের) সুসংবাদ দাও,

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ

وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ لا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ

شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق صلے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَاِذَا

وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ

سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا

هَدٰىكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ

لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ

৩৫. (এ বিনীত বান্দা হচ্ছে তারা,) যাদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করা হলে (ভয়ে) তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, যতো বিপদ (মসিবত তাদের ওপর) আসুক না কেন যারা তার ওপর ধৈর্য ধারণ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, (সর্বোপরি) আমি তাদের যে রেযেক দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) ব্যয় করে। ৩৬. আমি তোমাদের জন্যে (কোরবানীর) উটগুলোকে আল্লাহ তায়ালার (নির্ধারিত) নিদর্শনসমূহের মধ্যে (শামিল) করেছি, এতেই তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রয়েছে, অতএব (কোরবানী করার সময়) তাদের (সারিবদ্ধভাবে) দাঁড় করিয়ে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নাও, অতপর (যবাই শেষে) তা যখন একদিকে পড়ে যায় তখন তোমরা তার (গোশত) থেকে নিজেরা খাও, যারা এমনিই (আল্লাহর রেযেকে) সন্তুষ্ট আছে তাদের এবং যারা (তোমার কাছে) সাহায্যপ্রার্থী হয়, এদের সবাইকে খাওয়াও; এভাবেই আমি এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা (এ জন্যে) আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করতে পারো। ৩৭. আল্লাহ তায়ালার কাছে কখনো (কোরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না। বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াটুকুই পৌঁছায়; এভাবে আল্লাহ তায়ালা এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে যে (দ্বীনের) পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন তার (সে উপকারের) জন্যে তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারো; (হে নবী,) নিষ্ঠার সাথে যারা নেক কাজ করে তুমি তাদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও। ৩৮. যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের (যালেমদের থেকে) রক্ষা করেন; এতে সন্দেহ নেই, আল্লাহ তায়ালা কখনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শোকর বান্দাকে ভালোবাসেন না। ৩৯. যাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের পক্ষ থেকে) যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া গেলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই

اللّٰهَ عَلٰى نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيۡرُ ﴿٣٩﴾ الَّذِيۡنَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ بِغَيۡرِ حَقٍّ اِلَّاۤ

اَنۡ يَّقُوۡلُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوۡلَا دَفۡعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعۡضَهُمۡ بِبَعۡضٍ لَّهُدِّمَتۡ

صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيۡهَا اسۡمُ اللّٰهِ كَثِيۡرًا ؕ وَلَيَنۡصُرَنَّ

اللّٰهُ مَنۡ يَّنۡصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيۡزٌ ﴿٤٠﴾ اَلَّذِيۡنَ اِنۡ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَنَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الۡاُمُوۡرِ ﴿٤١﴾

যুলুম করা হচ্ছিলো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মাযলুম)-দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, ৪০. (এরা হচ্ছে কতিপয় মাযলুম মানুষ,) যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে– শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে শায়েস্তা না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খৃস্টান সন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদীদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদসমূহও, যেখানে বেশী বেশী পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ তায়ালার (দ্বীনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। ৪১. আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা (প্রথমে) নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, তবে সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালারই এখতিয়ারভুক্ত।

তাফসীর

আয়াত ২৫-৪১

আল্লাহ তায়ালা সংক্রান্ত বিতর্কের পরিণতি, কাফেরদের জাহান্নামের শাস্তি ভোগের দৃশ্য এবং মোমেনদের জান্নাতের নেয়ামত ভোগের দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়টার সমাপ্তি ঘটেছে।

এরপরই শুরু হয়েছে নতুন একটা অধ্যায়। এতে সেসব কাফের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা কুফরীর পাশাপাশি আল্লাহর পথে ও মাসজিদুল হারামে যেতে মানুষকে বাধা দেয়। এ ধরনের লোকেরাই মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের মোকাবেলা করতো। তারা সাধারণ মানুষকে সে আন্দোলনে যোগদান করতে বাধা দিয়েছে। তাছাড়া তারা রসূল (স.) ও মোমেনদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দিতো না।

এই প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে মাসজিদুল হারাম যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে সম্পর্কেও। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেদিন মাসজিদুল হারামের নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো সেই দিন সে ভিত্তি চিহ্নিত করা হয়েছিলো, অপরদিকে মানুষকে হজ্জ করার নির্দেশও দেয়া হয়েছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছিলো আল্লাহর ঘরকে তাওহীদের ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতে ও সেখান থেকে শেরক নিশ্চিহ্ন করতে। তাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যেন তিনি কা'বা শরীফকে সকল মুসলমানের জন্যে নির্মাণ করেন, যেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের সমান অধিকার থাকবে। কেউ কাউকে বাধাও দেবে না এবং কেউ তার মালিকও হবে না। অতপর হজ্জের কিছু বিধি, হৃদয়ে আল্লাহভীতি, আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির আদেশও এসেছে। সবার শেষে মাসজিদুল হারামকে সেই সব লোকদের আগ্রাসন থেকে, রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যারা সেখানে মানুষকে প্রবেশ করতে বাধা দিতো, কা'বার ভিত্তি তাওহীদকে পরিবর্তন করতে চায় এবং ইসলামকে রক্ষার জন্যে যারা জেহাদ করবে তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

মাসজিদে হারামে অবাধ যাতায়াত ও সেখানে অবস্থান

'যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও সেই মাসজিদুল হারাম থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে যাকে আমি সকল মানুষের জন্যে তৈরী করেছি এবং যার ভেতরে স্থানীয় ও প্রবাসী সমান যারা সেখানে .... তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ ভোগ করাবো।' (আয়াত ২৫)

এটা ছিলো কোরায়শ বংশীয় পৌত্তলিকদের কাজ যে, মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফেরাতো। অথচ এটাই আল্লাহকে পাওয়ার এক মাত্র পথ এবং মানব জাতির জন্যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র বিধান। তারা মুসলমানদেরকে হজ্জ ও ওমরা করতে মাসজিদুল হারামে যেতে দিতো না, যেমন হোদায়বিয়ার বছর দেয়নি। অথচ এই মাসজিদুল হারামকে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মক্কার স্থানীয় অধিবাসী ও বিদেশী মুসলমানদের অধিকার সমান। সুতরাং কা'বা শরীফ হচ্ছে আল্লাহর সেই ঘর, যেখানে আল্লাহর বান্দারা সবাই সমান। কেউ তার মালিক হবে না, কেউ কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না।

মানব জাতি নিরাপত্তার নির্দিষ্ট এলাকা গড়ার যতো চেষ্টা চালিয়েছে, তন্মধ্যে কা'বা শরীফকে সকলের নিরাপত্তার এলাকা রূপে নির্দিষ্ট করার ঘোষণা ছিলো সর্ব প্রথম ও সবার আগের পদক্ষেপ। এখানে অস্ত্র ফেলে দেয়া হয়, বিবদমান লোকেরা নিরাপদে পাশাপাশি অবস্থান করে। এখানে রক্তপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকলের জন্যে এটা আশ্রয় স্থল। এটা কারো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নয়, বরং সমানাধিকারের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত।

মক্কার যে সব বাড়ী ঘরে মক্কার লোক বাস করে না, সেগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। অনুরূপভাবে যারা এগুলোর মালিকানা বৈধ মনে করেন, এ সব ঘর ভাড়া দেয়ার ব্যাপারেও তাদের মতান্তর রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, এসব ঘরের ব্যক্তিগত মালিকানা বৈধ। ভাড়া দেয়া বৈধ এবং উত্তরাধির সূত্রে হস্তান্তরও বৈধ। তার দলীল হলো, হযরত ওমর (রা.) হযরত সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে চার হাজার দিরহাম দিয়ে মক্কার একটা বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাকে কারাগারে রূপান্তরিত করেন। ইসহাক বিন রহিওয়ের মতে ভাড়া দেয়া ও উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তর জায়েয নয়। তিনি বলেন, রসূল (স.) আবু বকর ওমর (রা.) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন মক্কার ভূমি ও গৃহগুলো উন্মুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হতো। যার প্রয়োজন হতো, এগুলোতে বাস করতো। 'আর যার প্রয়োজন হতো না সে অন্যকে থাকতে

দিতো। আব্দুর রাযযাক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কার বাড়ী ঘর কেনা-বেচা ও ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম শরীফে কোনো ভাড়া দেয়া নেয়া চলে না। ওমর ইবনে খাত্তার (রা.) মক্কার ঘরগুলোতে দরজা বানাতে নিষেধ করতেন, যাতে হাজীরা তার ভেতরে হজ্জের সময় বসবাস করতে পারে। সর্ব প্রথম সোহায়েল বিন আমর দরজা বানালে হযরত ওমর আপত্তি জানান। সোহায়েল বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমাকে অনুমতি দিন। আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি চাই, আমার ঘোড়াগুলো যেন ভেতরে থাকতে পারে। তখন হযরত ওমর (রা.) অনুমতি দিলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, হে মক্কাবাসী, তোমরা তোমাদের বাড়ীতে দরজা বানিও না যাতে বহিরাগতরা যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মালিকানা ও উত্তরাধিকার বৈধ, কিন্তু ভাড়া দেয়া বৈধ নয়।

মোটকথা, একটা শান্তি ও নিরাপত্তার উন্মুক্ত ও সুরক্ষিত স্থান সৃষ্টিতে ইসলাম সবাইকে হার মানিয়েছে এবং তা বহু আগেই দেয়া হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কোনো বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করে, কোরআন তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছে।

'যে ব্যক্তি এতে কোনো যুলুম করতে ইচ্ছা করবে, তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ ভোগ করাবো।'

শুধু অন্যায়ের ইচ্ছা করলেই যেখানে এই হুমকি, সেখানে কেউ যদি অন্যায় করেই বসে, তবে তার কী পরিণাম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কেবল ইচ্ছাতেই হুমকি দান এমন এক সূক্ষ্ম বাচন ভংগী যে, এ দ্বারা অধিকতর সতর্কীকরণ করা হয়েছে ও শান্তি ভংগের চেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্রতর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

আরো একটা সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যময় বাচনভংগি এ আয়াতে লক্ষণীয়। সেটা এই যে, এতে উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিধেয় উহ্য রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও সেই মাসজিদুল হারাম থেকে মানুষকে নিবৃত করে, যাকে আমি সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে তৈরী করেছি, যেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত সবাই সমান............'

যারা এই অপকর্ম করে তাদের কী পরিণাম হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। যেন তাদের এই অপকর্মের বিবরণ দেয়াই যথেষ্ট। এরপর তাদের সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। এই অপকর্মই যেন তাদের পরিণাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

হজ্জের তাৎপর্য ও কাবা নির্মাণের ইতিহাস

অতপর মাসজিদুল হারামের নির্মাণের ইতিহাস পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ আজ এই মাসজিদুল হারামে বসেই মোশরেকরা চরম স্বৈরাচারী আচরণ করে চলেছে। যারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ও পৌত্তলিকতার নোংরামি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাদেরকে সেখানে যেতে দিচ্ছে না। বলা হচ্ছে যে, এই পবিত্র কাবাগৃহ আল্লাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে নির্মিত হয়েছিলো এবং একে শেরক ও পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছিলো। একে তাওহীদের ভিত্তির ওপরই এক আল্লাহর এবাদাতের উদ্দেশ্যেই এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এর তওয়াফকারীদের জন্যেই নির্মাণ করা হয়েছিলো,

'স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহীম (আ.)-কে এই গৃহের স্থান নির্ধারণ করে বলেছিলাম যে, ...(আয়াত ২৬-২৯)

এখানে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, নির্মাণের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এ পবিত্র গৃহ শুধু তাওহীদের উদ্দেশ্যেই তৈরী হয়েছে। ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা এর স্থান দেখিয়ে দিয়ে তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যেন তিনি এই ভিত্তির ওপর তা নির্মাণ করেন। তাকে বলেছেন যে,

'আমার সাথে আর কাউকে শরীক করো না।'

কেননা এটা একমাত্র আল্লাহর ঘর, আর কারো নয়। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে,

'একে হাজী ও নামাযীদের জন্যে, রুকু ও সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র করো।'

কেননা এ ঘর তাদের জন্যেই নির্মিত পৌত্তলিকদের জন্যে নয়।

অতপর কা'বা গৃহের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক উল্লেখিত ভিত্তির ওপর তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে আদেশ দিলেন যেন তিনি মানুষকে আল্লাহর সম্মানিত ঘরে হজ্জ করার জন্যে আহ্বান করেন। তিনি তাকে প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দেবে, তারা তার কাছে পায়ে হেঁটেও আসবে, ক্ষুধায় ও দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে যাওয়া উঠের পিঠে সওয়ার হয়েও আসবে।

ইবরাহীম (আ.)-এর সময় থেকেই আজ পর্যন্ত আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে আসছে। বহু লোকের হৃদয় আল্লাহর ঘরের প্রতি উৎসুক, তার তাওয়াফ ও দর্শনের জন্যে উদগ্রীব। সমর্থ ও সচ্ছল লোকেরা বিভিন্ন পশুর পিঠে ও বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে আসে। আর যে দরিদ্র ব্যক্তির পা ছাড়া আর কোনো বাহন নেই সে পায়ে হেঁটেই আসে। হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ হযরত ইবরাহীমের কণ্ঠে উচ্চারিত আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে।

এ আয়াত ক'টিতে হজ্জের কিছু কিছু উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

'যাতে তারা বহুবিধ কল্যাণ লাভ করে, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সেইসব চতুস্পদ জন্তু যবেহ করার সময়, যা তাদেরকে তিনি রেযেক হিসেবে দান করেছেন। অতপর তোমরা নিজেরাও খাও, বিপন্ন ও অভাবীকেও খাওয়াও।'

তারপর তারা যেন দূর করে ফেলে নিজেদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা এবং নিজেদের মান্নত পূর্ণ করে ও প্রাচীন কা'বা গৃহের তওয়াফ করে।'

হাজীরা বহুবিধ কল্যাণ লাভ করে থাকে। হজ্জ একটা মৌসুমও, সম্মেলনও। হজ্জ একদিকে যেমন বাণিজ্যের মৌসুম, অপরদিকে তেমনি এবাদাতেরও মৌসুম। হজ্জ মুসলমানদের আন্তর্জাতিক মহামিলনের ক্ষেত্র ও পারস্পরিক পরিচয় আদান প্রদান ক্ষেত্র, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সম্মেলন। এটা এমন একটা ফরয এবাদাত, যার ভেতরে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গার স্বার্থের সমাবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনি সমাবেশ ঘটেছে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী আকীদা বিশ্বাসের স্মৃতিচারণের। ব্যবসায়ীরা হজ্জের মৌসুমে একটা চালু বাজার পেয়ে যান। সকল ধরনের ফলমূল পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে এ খানে আসে। হাজীরা প্রত্যেক দেশ থেকে আগমন করেন, আর তাদের সাথে এই সম্মানিত দেশে একই মৌসুমে বিপুল অর্থের সমাগম ঘটে, যা বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে। এক কথায় বলা যায়, এটা একটা পবিত্র এবাদাতের মৌসুম হওয়া সত্তেও পাশাপাশি একটা আন্তর্জাতিক বাৎসরিক বাণিজ্যিক মেলাও, যেখানে সব ধরনের উৎপাদিত পণ্যের সমাবেশ ঘটে থাকে।

এটা এমন একটা এবাদাতের মৌসুম, যখন মানুষের অন্তরাত্মা সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা লাভ করে, আল্লাহর মহা সম্মানিত ঘরে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অবস্থানের সুখ ও তৃপ্তি উপভোগ করে। এই ঘরের চারপাশে অবস্থানের সময়কালে মানবাত্মা এই ঘরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নিকট ও দুর অতীতের সকল পবিত্র স্মৃতি রোমন্থন করে।

রোমন্থন করে আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই সময়কার স্মৃতি, যখন তিনি এই ঘরের কাছে তার স্ত্রী পুত্রকে রেখে যান এবং আল্লাহর প্রতি নিজের মনের সকল আবেগকে উজাড় করে দিয়ে এই বলে আকুতি জানান যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক আমি তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে একটা চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকায় আমার বংশধরের একাংশকে আবাসিত করে রেখে এসেছি। হে আমার প্রতিপালক! আমার উদ্দেশ্য এই যে, ওরা নামায কায়েম করুক। সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলমূল দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করুন যাতে তারা শোকর আদায় করে।'

কল্পনায় ভেসে ওঠে হযরত হাজেরার ছবি, যখন তিনি পবিত্র কা'বা ঘরের পার্শ্ববর্তী সেই রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে হন্ত-দন্ত হয়ে নিজের জন্যে ও নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে পানি খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। পিপাসায় কাতর শিশু পুত্রের স্নেহের ডোরে আবদ্ধ, জননী হাজেরা সাফা ও মারওয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে একনাগাড়ে ছয়বার ছুটাছুটি করে শ্রান্ত ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে যখন সপ্তম বারে সন্তানের কাছে ফিরে আসেন, তখন সহসাই দেখতে পান শিশু পুত্রের কাছেই যমযমের ঝর্ণা ফুটে বেরিয়েছে। দেখতে পান হতাশায় আচ্ছন্ন সেই অনুর্বর মরুপ্রান্তরে আত্মপ্রকাশ করছে আল্লাহর রহমতের প্রস্রবণ।

মনে পড়ে যায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সেই স্বপ্নের স্মৃতিবিজড়িত কাহিনী, যা দেখার পর তিনি নিজের কলিজার টুকরোকে নির্দ্বিধায় কোরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যান। আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে ছেলেকে খোলাখুলি বলে দেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন তোমাকে যবাই করছি। এখন ভেবে দেখো, তোমার মতামত কী।' একই রকম নিবেদিত প্রাণ ছেলে পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে বলেন, 'হে পিতা! যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করে ফেলুন। আল্লাহ তায়ালা চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' এরপর সহসাই আল্লাহর রহমত নাযিল হয়ে যায় বিকল্প কোরবানীর পশুর আকারে, 'আমি তাকে ডেকে বললাম, ওহে ইবরাহীম, তুমি আমার স্বপ্নকে স্বার্থক করেছো। এরূপ সৎ কর্মশীলদেরকে আমি এভাবে পুরস্কৃত করি। এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে একটা মহান বিকল্প কোরবানীর জন্তু দিলাম।'

মনে পড়ে যায় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর কা'বা ঘর নির্মাণের সাথে সাথে তাদের বিনীত দোয়া– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার অনুগত বানাও, আর আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে একটা অনুগত জাতি সৃষ্টি করো। আমাদের এবাদাতের পন্থা শিখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

এসব স্মৃতির পাশাপাশি মনে পড়ে যায় আব্দুল মোত্তালেবের স্মৃতিও। তিনি মান্নত করলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে দশটা ছেলে দিলে দশম ছেলেকে কোরবানী করবেন। মোহাম্মদ (স.)-এর পিতা আব্দুল্লাহ সেই দশম ছেলে হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেন। আব্দুল মোতালেব নিজের অংগীকার পুরণে উদগ্রীব হয়ে উঠলে তার গোত্রের লোকেরা তাকে বিকল্প কোরবানীর প্রস্তাব দেয়। তিনি কা'বা গৃহের পাশে লটারির ব্যবস্থা করলেন। প্রতিবার আব্দুল্লাহর নামে লটারী বের হয়। দশম বারের পর আব্দুল্লাহর পরিবর্তে কোরবানীর পরিমাণ দাঁড়ায় একশো উট। অতপর বিকল্প কোরবানী গৃহীত হয় এবং আব্দুল্লাহর প্রাণ রক্ষা পায়। তাও রক্ষা পায় শুধু এজন্যে যে, আমেনার গর্ভে যেন সৃষ্টির সেরা মোহাম্মদ (স.)-এর সেই কোরায়শ শুক্র বিন্দুটি রক্ষিত হয়। এর পর পরই আব্দুল্লাহর মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ কিনা, আল্লাহ তায়ালা তাকে একমাত্র এই মহান ইচ্ছা পূরণের জন্যেই যবাই হওয়া থেকে অব্যাহতি দেন।

এরপর আরো কত স্মৃতি চিত্ত পটে একে একে ভাসতে থাকে। এই পবিত্র ভূমিতেই মোহাম্মদ (স.) তার শৈশব ও কৈশোর কাটান এই ঘরেরই চারপাশে। তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন করে কোরায়শ গোত্রগুলোকে এক অনিবার্য সংঘাতের কবল থেকে রক্ষা করেন। এখানেই তিনি নামায পড়তেন, তওয়াফ করতেন, ভাষণ দিতেন, এতেকাফ করতেন, তার সেই সব স্মৃতি জ্বলজ্যান্ত হয়ে মানসপটে ভেসে ওঠে। প্রত্যেক হাজী এসব দৃশ্যকে যেন সেখানে চাক্ষুস দেখতে পায়।

হজ্জ সারাবিশ্বের মুসলমানদের সমবেত হওয়ার মহা মিলন ক্ষেত্রে ও মহা সম্মেলন। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে শুরু করে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত তাদের মূল জাতিসত্ত্বা এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই প্রফিলিত। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত জাতিসত্ত্বা। তিনি তোমাদেরকে মুসলিম নাম রেখেছেন..........., (সূরা হজ্জ) এর মাধ্যমেই সারা দুনিয়ার মুসলমানরা খুঁজে পায় তাদের ঐক্যের অটুট বন্ধন সৃষ্টিকারী সেই কেবলা, যার অভিমুখে দুনিয়ার সকল মুসলমান আপন আপন মনকে নিবিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে। এটা হচ্ছে তাদের সেই সম্মিলিত আকীদা বিশ্বাসের পতাকা, যার নিচে দেশ, বর্ণ, বংশ ও জাতীয়তার যাবতীয় ভেদাভেদ মুছে একাকার হয়ে যায়, এই পাতাকার নিচে সমবেত হয়েই তারা তাদের ভুলে যাওয়া সেই দুর্জয় শক্তি ফিরে পায়, কোটি কোটি মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে। একক আকীদা বিশ্বাসের প্রতীক এই পতাকার নিচে সমবেত হলে তারা এমন অজেয় জাতিতে পরিণত হয়, যার সামনে কোনো বৈরী শক্তি টিকে থাকতে পারে না।

হজ্জের মহা সম্মেলন বিশ্ব মুসলিমকে সুযোগ এনে দেয়, বছরে একবার আল্লাহর ঘরের কাছে একত্রিত হয়ে পরস্পরে পরিচিত হওয়ার, পরামর্শ করার, পরিকল্পনা করার, শক্তি সঞ্চয়ের, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের, পণ্যদ্রব্য ও কল্যাণ বিনিময়ের এবং মুসলিম বিশ্বকে পুনরেকত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার। এ কাজের জন্যে এর চেয়ে মহৎ স্থান, উপযোগী সময় ও সুন্দর পরিবেশ আর কিছু হতে পারে না। এ কথাটাই আল্লাহ এভাবে বলেছেন,

'যাতে তারা কল্যাণ লাভ করতে পারে।'

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজন্ম নিজ নিজ যুগের চাহিদা, প্রয়োজন, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা অনুসারে যা কিছু কল্যাণকর, তা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর হজ্জ ফরয করার সময়েই মানব জাতির এই সুদূর প্রসারী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। আর এই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি হযরত ইবরাহীমকে বিশ্বময় হজ্জের আহ্বান প্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন।

হজ্জের কিছু বিধিবিধান ও তার তাৎপর্য

এখানে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে হজ্জের কিছু কিছু নিয়ম-বিধি ও তার উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে,

'তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু পশু কোরবানী করবে।' .... এটা কোরবানীর ঈদের দিনে ও তার পরবর্তী তাশরীকের তিন দিনের পশু কোরবানীর দিকে ইংগিত। কোরআন পশু কোরবানীর সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণের বিষয়টা প্রথমে উল্লেখ করেছে। কারণ পরিবেশ ও পটভূমিটা হচ্ছে এবাদাতের এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভ। তাই কোরবানীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ, যেন এটাই কোরবানীর আসল উদ্দেশ্য, শুধু যবাই করা ও গোশত খাওয়া নয়।

কোরবানী যদিও একটা গুরুত্বপূর্ণ সদকা এবং ফকীর মেসকীনকে খাওয়ানোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। তথাপি এটা হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে পশু কোরবানীর স্মৃতি, আল্লাহর একটা নিদর্শনের স্মৃতি এবং আল্লাহর দুই বান্দা হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈলের আনুগত্যের স্মৃতিও বটে।

আয়াতে যে 'বাহীমাতুল আনয়াম' অর্থাৎ চতুস্পদ জন্তুর উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বুঝানো হয়েছে।

'অতপর, তোমরা তা থেকে নিজেরাও খাও এবং বিপন্ন অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও।'

'কোরবানীর গোশত নিজেরাও খাও' এই নির্দেশ দানের অর্থ হলো, কোরবানী দাতার পক্ষে সে গোশত খাওয়া হালাল, বৈধ ও উত্তম। এ আদেশের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, দরিদ্র মেসকীনরা যেন মনে করে, সে গোশত ভালো। আর দরিদ্রদেরকে খাওয়ানের নির্দেশের অর্থ হলো, তাদেরকে খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্য ও ওয়াজেব।

হজ্জের সময় কোরবানীর মাধ্যমে এহরামের সমাপ্তি ঘটে। এরপর হাজীরা চুল কামাতে বা ছাঁটতে পারেন, বোগলের পশম কামাতে পারেন, নখ কাটতে পারেন ও গোসল করতে পারেন, যা এহরামের সময় তার জন্যে হারাম ছিলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তারপর তারা যেন দূর করে ফেলে নিজেদের শরীরের অপরিচ্ছন্নতা এবং নিজেদের মান্নত যেন পূর্ণ করে।'

অর্থাৎ হজ্জের অপরিহার্য অংগ যে কোরবানী, তার অতিরিক্ত কোনো মান্নত যদি করে থাকে, তা যেন পূর্ণ করে

'এবং তারা সুরক্ষিত ঘরটির তওয়াফ করে।'

এটাকে 'তওয়াফে এফাযা' বলা হয়, যা আরাফার ময়দানে অবস্থানের পরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর দ্বারাই হজ্জের এবাদাতটি সমাপ্ত হয়। 'তওয়াফে এফাযা' 'তওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী তওয়াফ থেকে ভিন্ন।

'আল বাইতুল আতীক' বা সুরক্ষিত গৃহ বলতে মাসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘরকে আল্লাহ তায়ালা যে কোনো আগ্রাসী শক্তির দখল থেকে চিরদিন মুক্ত রেখেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা এ ঘরকে ধ্বংস হওয়া থেকেও রক্ষা করেছেন। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময় থেকেই মাঝে মাঝে এ ঘরের সংস্কার হয়ে এসেছে।

এতো গেলো আল্লাহর ঘরের নির্মাণের কাহিনী ও তার ভিত্তি বিষয়ক বক্তব্য, আল্লাহ তায়ালা তার বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন এ ঘরকে তাওহীদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে শেরক থেকে পবিত্র করতে, এই ঘরে হজ্জ করার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানাতে, এখানে হজ্জের সময় আল্লাহর নামে পশু কোরবানী করতে– তথাকথিত দেব-দেবীর নামে নয় এবং সেই পশুর গোশত খেতে ও খাওয়াতে। এই সম্মানিত ও পবিত্র গৃহে আল্লাহর যাবতীয় পবিত্র বিধি-বিধান সুরক্ষিত– তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিধানটা হলো তাওহীদ এবং এর দরজা একমাত্র ইসলামী পন্থায় তওয়াফকারী ও নামায আদায়কারীদের জন্যে উন্মুক্ত। এ ছাড়া এ ঘরের চতুর্সীমায় রক্তের পবিত্রতা, ওয়াদা ও অংগীকারের অলংঘনীয়তা এবং শান্তি ও সন্ধির অলংঘনীয়তা সুরক্ষিত। (আয়াত ৩০-৩১)

বস্তুত আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর সম্মান করার অর্থ এই যে, তার নিষিদ্ধতা লংঘন করা যাবে না। এটা আল্লাহর কাছে উত্তম কাজ। এটা সাধারণ বিবেক ও অনুভূতির কাছে এবং

বাস্তবতার দৃষ্টিতেও উত্তম। যে মানুষের বিবেকনিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে এড়িয়ে চলে, সে পবিত্রতাকামী বিবেকবান মানুষ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকে মেনে চলে তাকেই মানব সমাজ নিরাপদ, ঝুঁকিহীন, ও অনাগ্রাসী ব্যক্তি মনে করে। এ ধরনের লোকেরা যেখানে কর্তৃত্ব চালায় সেটা হয়ে থাকে শান্তি, নিরাপত্তাপূর্ণ স্থান।

আরবের মোশরেকরা নিজেদের মনগড়া কিছু জিনিসকে নিষিদ্ধ ও পবিত্র ঘোষণা করেছিলো। অথচ সেগুলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিলো না। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোকে তারা অকাতরে লংঘন করতো। কোরআন আল্লাহর নিষিদ্ধ করা প্রাণী ছাড়া অন্যসব পশুকে হালাল ঘোষণা করেছে– যেমন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং হালাল করা হয়েছে কেবল যেগুলোর কথা তোমাদেরকে জানানো হয় তা ছাড়া।' এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ করা জিনিস ছাড়া অন্য কিছু যেন নিষিদ্ধ না থাকে, কেউ যেন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো আইন রচনা না করতে পারে এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন না চালাতে পারে।

চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়ার প্রসংগে পৌত্তলিকতা পরিহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোশরেকরা বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে পশু যবাই করতো। অথচ এসব দেব-দেবী হচ্ছে 'রিজ্স' বা অপবিত্রতা। এখানে 'অপবিত্রতা' দ্বারা মনের অপবিত্রতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর সাথে শেরক করা এমন এক অপবিত্রতা ও নোংরামি, যা বিবেক ও মনকে নোংরা ও কলুষিত করে, যেমন কোনো নাপাক জিনিস শরীর ও পোশাককে অপবিত্র করে।

আর যেহেতু শেরক আল্লাহর প্রতি এক ধরনের অপবাদ আরোপ ও মিথ্যাচারের নামান্তর, তাই আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের মিথ্যাচার পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

'অতএব তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা পরিহার করো এবং মিথ্যাচার পরিহার করো।'

কোরআন ও হাদীসে মিথ্যাচারকে পৌত্তলিকতার পর্যায়ভুক্ত করে এর জঘন্যতাকে পরিস্ফূট করা হয়েছে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) একবার ফজরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দান আল্লাহর সাথে শরীক করার সমপর্যায়ের অপরাধ।' অতপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।

আসলে আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ সব ধরনের শেরক এবং সব ধরনের মিথ্যাচারকে পরিহার করুক এবং পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক। 'যারা আল্লাহর প্রতি একাগ্র চিত্ত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না।' (আয়াত ৩১)

৩১ নং আয়াতের পরবর্তী অংশে সেই ব্যক্তির ভয়াবহ পরিণতির চিত্র অংকন করা হয়েছে যে তাওহীদের শীর্ষস্থান থেকে পা পিছলে শেরকের গভীর খাদে পতিত হয়েছে। ফলে সে এমনভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে যেন ধরাপৃষ্ঠে তার অস্তিত্ব কখনো ছিলো না।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো, অতপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে ফেলে দিলো।'

এখানে উচ্চ স্থান থেকে নীচে পতিত মানুষের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো।' আর এক নিমিষেই সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এজন্যেই পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, 'ফলে পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো।' অথবা 'বাতাস তাকে উড়িয়ে দৃষ্টির আড়ালে দূরে কোথাও নিয়ে ফেলে দিলো।' অর্থাৎ তার কোনো স্থীতি নেই।

এখানে 'ফা' অব্যয়টি বারবার ব্যবহার করে শব্দের মধ্যে দ্রুততা ও প্রচন্ডতা আর দৃশ্যের ভেতরে দ্রুত উধাও হয়ে যাওয়ার ভাবটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটা কোরআনের শৈল্পিক বাচনভংগির অন্তর্ভুক্ত, যাতে সংশ্লিষ্ট দৃশ্যের ছবি ভাষার মাধ্যমে চিত্রিত করা হয়।

এটা আসলে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারীদের নিখুঁত চিত্র। তারা ঈমানের সুউচ্চ অবস্থান থেকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। কেননা তাওহীদের যে ভিত্তির ওপর মানুষ পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করতে পারে এবং যাকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, একজন মোশরেক তা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তার অসংযত কামনা বাসনাগুলো তাকে শিকারী পাখীর মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ও কুরে কুরে খায় এবং নানারকমের ভিত্তিহীন কল্পনা তাকে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অথচ সে কোনো অটুট বন্ধনের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখে না– যা তাকে তার আবাসস্থল এই পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখে।

কোরবানীর পশুসংক্রান্ত বিধি বিধানের তাৎপর্য

আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিহার করার মাধ্যমে সেগুলোকে সম্মান দেখানোর বিষয়টা আলোচনার পর পরবর্তী আয়াতে হজ্জের কোরবানীযোগ্য পশুগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। পশুগুলোকে মোটা বানিয়ে ও ওগুলোকে অধিকতর দামী পশুতে পরিণত করার মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। (আয়াত ৩২)

এ আয়াতে হাজীর যবাই করা কোরবানীর পশুর সাথে আন্তরিক তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। কেননা তাকওয়াই হচ্ছে হজ্জ ও কোরবানীর মূল উদ্দেশ্য। হজ্জের প্রতিটা কাজ ও কোরবানী আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও আনুগত্যের প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। এর গভীরে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার পরবর্তী সময়কার নবীদের ত্যাগ-তিতীক্ষা ও আনুগত্যের স্মৃতি জড়িত রয়েছে। মুসলিম জাতির ভিত্তি পত্তনকাল থেকেই এই ত্যাগ, কোরবানী, আনুগত্য ও মনোনিবেশ সক্রিয় রয়েছে। সুতরাং দোয়া, নামায ও কোরবানী আনুগত্য একই পর্যায়ভুক্ত।

যে সমস্ত জন্তুকে এহরামের শেষ দিনগুলোতে কোরবানী করার জন্যে নেয়া হয়, তা দ্বারা উপকৃত হওয়াও মালিকের জন্যে বৈধ। প্রয়োজন হলে সে তার পিঠে আরোহণ করতে পারে, প্রয়োজন হলে তার দুধপান করতে পারে যতোক্ষণ না তাকে পবিত্র কাবা গৃহের কাছে পৌঁছানো ও কোরবানী করা হয়, যাতে গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়।

'রসূল (স.)-এর আমলে মুসলমানরা কোরবানীর পশুকে কেন্দ্র করে নানারকমের বাড়াবাড়ি করতো। কেউ কেউ মোটা মোটা ও দেখতে দামী জানোয়ার কোরবানী করতো এবং এ দ্বারা কোরবানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো। আর এটা তারা আল্লাহভীতির মনোভাব নিয়েই করতো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রা.)-কে একটা অল্পবয়স্ক উট উপহার দেয়া হলো। তিনি তার বিনিময়ে তিনশত দিনার দিলেন। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি একটা অল্পবয়স্ক উট উপহার পেয়েছি। ওটার বিনিময়ে আমি তিনশত দিনার দিয়েছি। এখন এটাকে কি বিক্রি করে দেবো এবং এর দাঁম দিয়ে কয়েকটা 'বাদানা' (বয়স্ক উট বা গরু, যা হজ্জের সময় আট জনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়) কিনবো? রসূল (স.) বললেন, 'না, ওটাই কোরবানী করো।'

যে অল্প বয়স্ক উটনী হযরত ওমরের কাছে উপঢৌকন হিসেবে এসেছিলো এবং যার দাম তিনশত দিনার নির্ধারিত হয়েছিলো, হযরত ওমর তার মূল্য রেখে দিতে চাননি, বরং সে

উটনীটাকে বিক্রি করে দিয়ে তা দিয়ে একাধিক গরু বা উট কিনতে চেয়েছিলেন কোরবানী করার জন্যে। কিন্তু রসূল (স.) ইচ্ছা করলেন যে, ওমর সে অল্প বয়স্ক উটনীটাকেই কোরবানী করুক, কেননা ওটা অপেক্ষাকৃত দামী ও সুন্দর। তার পরিবর্তে অনেকগুলো বড়ো বড়ো উট বা গরু কিনে কোরবানী করাকে তিনি পছন্দ করেননি। এতে গোশতের পরিমাণ বেশী পাওয়া যেতো। কিন্তু এগুলোর ভাবাবেগগত দাম কম, আর কোরবানীর মূল লক্ষ্য হলো জানোয়ারটা যেন ভাবাবেগগতভাবে বেশী দামী হয়। রসূল (স.)-এর 'ওটাই কোরবানী করো' কথাটার মর্ম এটাই।

পবিত্র কোরআন বলছে যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে এসব কোরবানীর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে সঠিক দিকে পরিচালিত করেছে এবং এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে কোরবানী না হয় এটা নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'প্রত্যেক জাতির জন্যে আমি বিধান দিয়েছি যেন তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জন্তুকে আল্লাহর নামে যবাই করে.......... ।' (আয়াত ৩৩-৩৪)

আসলে দৃষ্টিভংগী ও ভাবাবেগকে আল্লাহমুখী করাই ইসলামের প্রধান কাজ। তাই সে সকল ভাবাবেগ, কাজ, ব্যস্ততা, এবাদাত, আদত অভ্যাস ও চালচলনকে আল্লাহর দিকেই চালিত করে এবং সবগুলোকে আল্লাহর রংগে রঞ্জিত করে।

এরই ভিত্তিতে যেসব জানোয়ার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়, তাকে হারাম করা হয়েছে। যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণকে এতো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেন যবাই করাটাই আল্লাহর নাম উচ্চারণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। (আয়াত ৩৩)

এরপর পুনরায় আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করে এ বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। 'অতএব তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ।' অতপর সেই এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। 'অতএব তারই কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ করো।' আর এরপরই পরিষ্কার করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, এই আত্মসমর্পণ বল প্রয়োগে ও বাধ্য করে করানো হবে না। বরং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে করা হবে, 'এবং বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও, যারা আল্লাহর নাম শুনলেই তাদের মন কেঁপে ওঠে।' অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণেই তাদের হৃদয় ও বিবেক আলোড়িত হয়। 'এবং বিপদ-মুসিবতে যারা ধৈর্যধারণ করে।' অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সিদ্ধান্তে তারা কোনো আপত্তি তোলে না। 'এবং যারা নামায কায়েম করে।' অর্থাৎ তারা যথাযথভাবে আল্লাহর এবাদাত করে। 'এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে দান করে।' অর্থাৎ আল্লাহর পথে দান করতে কার্পণ্য করে না।

এভাবে আকীদা বিশ্বাস ও কোরবানীকে এক সূত্রে গ্রোথিত করা হয়েছে। কোরবানী আসলে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত এবং তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কোরবানী ও যাবতীয় এবাদাতে এই আকীদা বিশ্বাসই প্রতিফলিত। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শুধু কোরবানীও নয়, এবাদাতও নয়– জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডকেই এবং গোটা জীবনকেই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের রং-এ রঞ্জিত করতে হবে। এতে শক্তি ও দৃষ্টি একই কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং মানব সত্ত্বা নানাভাগে বিভক্ত হবে না।(১)

কোরবানীর সঠিক মর্ম

বর্তমান অধ্যায়ে হজ্জের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য উঁটনী কোরবানী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

কা'বা শরীফের জন্যে উৎসর্গীকৃত উঁটনীকে আমি, মহান আল্লাহ, বানিয়েছি তোমাদের জন্যে, আমার আমার ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, এর মধ্যে রয়েছে

(১) আমার রচিত 'বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম' নামক পুস্তকে 'জীবন ও বিশ্বাস' শীর্ষক অধ্যায়টি দেখুন।

তোমাদের জন্যে প্রভূত কল্যাণ............ আর এহসানকারীরাকে চূড়ান্ত সাফল্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও।' (আয়াত ৩৬-৩৭)

এখানে বিশেষভাবে কোরবানীর উঁটনীর উল্লেখ এই জন্যে করা হয়েছে যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে এটাই হচ্ছে সকল কোরবানীর শ্রেষ্ঠ কোরবানী, কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বিশেষ করে আরবের অধিবাসীদের জন্যে এর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন বলে আলোচ্য আয়াতে জানাচ্ছেন। জীবন্ত আরোহণযোগ্য ও দুগ্ধবতী উঁটনীকে কোরবানী করার মধ্যে কল্যাণ এ মহা কল্যাণের সর্বাংশ আমাদের বোধগম্য না হলেও এতোটুকু তো বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এর গোশত আংশিক খাওয়া হয় এবং বাকি অংশ বিলিয়ে দেয়া হয় যা স্থানীয় ও দূরবর্তী বহু লোকের ভোগ ব্যবহারে(২) আসে। এই প্রিয় পশুকে আল্লাহর মহব্বতে কোরবানী করায় তাঁর সন্তোষ প্রাপ্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়, যার কারণে তাঁর বিশেষ মেহেরবানী নাযিল হয়। এ কোরবানী আল্লাহ তায়ালা যে কবুল করেন এই অবস্থার মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোরবানীর সে শক্তিশালী পশুগুলোকে যখন লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাদের গলার হলকুমে তরবারির অগ্রভাগ বা বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে রক্ত প্রবাহিত করা হয়, তখন তারা মোটেই নড়া চড়া করে না। রক্ত ঝরে ঝরে যখন তাদের শরীর রক্তহীন হয়ে আসে তখন তারা আস্তে করে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়ে। এজন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে, 'সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর পর তাদের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো।'

উঁটদেরকে তিন পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে এবং শুধুমাত্র চতুর্থ পাকে বেঁধে রেখে নহর করা হয়। 'তারপর যখন পার্শ্ব দেশে প্রাণীটি পড়ে যায় এবং মাটিতে পড়ে বেরিয়ে গেছে বলে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া হয় তখন এর মালিকরা মহব্বতের সাথে এর থেকে গোশত কেটে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে, এসব কোরবানীর পশুর গোশত থেকে তাদেরকে খাওয়ানো হয় যারা অভাবগ্রস্ত, যদিও তারা কিছু চায় না, আর সেই সব ভাগ্যহারা মানুষকেও দেয়া হয় যারা নিজেদের অভাব জানাতে বাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো যে, এসব জন্তুকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ এসব নেয়ামতের জন্যে আল্লাহর শোকরগোযারি করে এবং জীবন্ত ও জবাইকৃত উভয় অবস্থাতেই এসব পশুর ভোগ ব্যবহারে ধন্য মানুষ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করেই, আমি নিয়ন্ত্রিত করেছি এগুলোকে তোমাদের জন্যে যেন তোমরা শোকরগোযারি করো।'

আর যদিও আল্লাহর নামেই এসব পশুকে নহর করতে বলা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে 'এদের গোশত ও রক্ত কোনো কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছায় না।' অর্থাৎ মহান ও পবিত্র আল্লাহর কাছে এদের গোশত বা রক্ত কিছুই পৌঁছায় না; তাঁর কাছে পৌঁছায় শুধু যে ব্যক্তি কোরবানী করলো তার অন্তরের তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার মনোভাব, সেইভাবে এগুলোর রক্ত ছিটানো হয় না যেভাবে, পূজা পার্বন উপলক্ষে আরব মোশরেকরা, বলির পশুর রক্ত মূর্তির ওপর ছিটিয়ে আনুগত্য জানতো। এটা এক চরম জাহেলী ও কঠিন শেরক! এরশাদ হচ্ছে,

---

(২) এখন প্রশ্ন হচ্ছে উঁটনী কেন, এখানে উঁটও তো হতে পারতো এর একটি জওয়াব হচ্ছে উঁটনী যদি দুগ্ধবতী হয় তার মূল্য উঁটের থেকে অনেক বেশী যা কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। এজন্য আল্লাহর মহব্বতের এই মূল্যবান পশু কোরবানী করার মাধ্যমে নিজেদেরকে সহজেই আল্লাহ পাকের দরবারে মর্যাদাবান বানানো যায়। এর হয়তো আরো কারণ আছে যা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

'এমনি করে তিনি তোমাদের (ভোগ ব্যবহারের) জন্যে এগুলোকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যেন তোমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করতে পারো, কেননা তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন।'............

অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে তাঁর একত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে দিয়েছেন, এগিয়ে দিয়েছেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিজের দিকে, এগিয়ে দিয়েছেন তোমাদেরকে রব (মনিব) ও বান্দার (গোলামের) সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝার দিকে; তিনি তোমাদেরকে, বাস্তব কাজ করা ও সৎ কাজে প্রবৃত্ত থাকার সূক্ষ্ম ও সঠিক তাৎপর্যকে বুঝবার তৌফিক দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'এবং সুসংবাদ দাও এহসানকারীদেরকে। ....যারা চিন্তা চেতনায়, এবাদাত বন্দেগীতে এবং জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এবং সকল তৎপরতায় সুন্দর-সঠিক পথ অবলম্বন করে।

এমনি করে একজন (প্রকৃত) মুসলমান জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং দিবা-রাত্রির প্রতিটি অংগ সঞ্চালনের সময়ে অবশ্যই খেয়াল করে যে, সে আল্লাহর পথে আছে তো! আল্লাহর ভয়ে তার হৃদয় মন উদ্বেলিত হতে থাকে, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাসিল করার জন্যে তার মধ্যে এক প্রবল আগ্রহ, সৃষ্টি হয় সুতরাং তার গোটা জীবনই এবাদাতের জীবন হিসাবে গন্য হয়ে যায়, যেখানে সব কিছুই সম্পাদিত হয় মহান আল্লাহরই ইচ্ছায়, যিনি সকল বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে, পৃথিবীর যেখানেই সে বাস করুক না কেন সেখানেই তার দ্বারা সংশোধনী ও কল্যাণ প্রসার লাভ করে এবং তার এই মহত্ব তাকে আরশের মালিকের কাছে প্রিয় বানিয়ে দেয়।

যুদ্ধের অনুমতি দান ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

একজন মুসলমানের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পয়দা করার জন্যে এবং তার প্রতিটি কাজে, কথায়, চিন্তায় ও ব্যবহারে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ, যা তাকে বিরোধীদের মোকাবেলায় সাহস যোগাতে পারে, সহযোগিতা করতে পারে এবং তার সব প্রতিকুলতাকে প্রতিরোধ করতে পারে, যাতে করে তার আকীদা বিশ্বাসের অনির্বাণ প্রদীপ অম্লানভাবে জ্বলতে থাকে এবং অবিরামভাবে সে তার রবের বন্দেগী করে যেতে পারে। এমনই পরিবেশ পেলে সত্য সচেতন একজন মোমেন এবাদাতের স্থান সমূহের পবিত্রতা ও ইসলামের প্রতীকী কাজগুলোর মর্যাদা রাখতে পারবে এমনই অনুকূল পরিবেশে আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর ও বাস্তব কাজে নিয়োজিত মোমেনদের পক্ষে তাদের ঈমান আকীদার ওপর ভিত্তি করে নিখুঁত এক জীবনপদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে, তাদের জীবন হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং তখনই তারা গোটা-বিশ্ববাসীর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

মদীনার জীবনে যখন এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলো তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীন, হিজরতের পর মোশরেকদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন যাতে করে তারা অহংকারী ও বলদর্পী দুশমনদের আক্রমণ থেকে তাদের ঈমান আকীদা এবং জান মাল ও ইযযত আবরু রক্ষা করতে পারে। আর এটাও লক্ষ্যযোগ্য যে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের অনুমতি তখনই দিলেন যখন কাফেরদের দৌরাত্ম সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তারা সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা চাইলেন যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরী হয়ে যাক, যার ছায়াতলে সত্যপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী মুসলমানরা নিরাপদ হয়ে যাবে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তিকামী অপর সকল মানুষের জীবন এই জন্যেই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রতিরোধকামী মুসলমানদের সাথে ওয়াদা করলেন যে অবশ্যই তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন ও পৃথিবীর বুকে তিনি ক্ষমতাসীন বানাবেন। অবশ্য এর

জন্যে তিনি শর্ত দিলেন যে মুসলমানদের আত্মসচেতন হতে হবে, সকল জড়তা ও দুর্বলতার জালকে ছিন্ন করে তাদের জেগে উঠতে হবে এবং তাদের মালিক মনিব সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াককুল করে তাদের আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এগিয়ে যেতে হবে, এর পূর্ণ বিবরণ নীচের আয়াতগুলোতে দেয়া হলো,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ওপর থেকে শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহত করবেন ....আর আল্লাহরই হাতে রয়েছে সকল কাজের পরিণতি। (আয়াত ৩৮-৪১০)

এটা অবশ্যই সত্য কথা, চিরদিনই দুনিয়ায় অন্যায় ও অসত্যের প্রসার বেশী দেখা যায় এবং এটাও সত্য যে ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায় পথ বা কাজের মধ্যে নিরন্তর এক সংঘাত লেগে রয়েছে, একইভাবে ঈমানী শক্তি ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির মাঝেও সেই দিন থেকে সংঘর্ষ লেগে রয়েছে যেদিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করেছেন।

এটাও দেখা যায় যে, যে কোনো মন্দ জিনিসই অ-গোছালো ও অশান্তিকর হয় এবং মিথ্যা সদা-সর্বদাই অস্ত্র সজ্জিত থাকে। মিথ্যা শক্তি বে-পরওয়াভাবে মানুষকে পাকড়াও করে এবং কাউকে আঘাত করার সময় ডানে বাঁয়ে তাকায় না, আর ন্যায় পথের পথিকদেরকে সত্যভ্রষ্ট করার জন্যে তাদেরকে নানা প্রকার ফেৎনার মধ্যে ফেলে দেয় এবং সত্য পথ জানা ও দেখার পরও তার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, এজন্যে এসব জবরদস্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে সত্যের সমর্থনে কাউকে না কাউকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। যেন সত্যকে সমর্থন দেয়া যায় এবং অসত্যের উপদ্রব ও অনিষ্টকারিতা থেকে সত্যকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা কখনও চাননি ঈমানী শক্তি, কল্যাণ তৎপরতার উদ্যোগ ও সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একাকী ও অসহায় অবস্থায় পতিত হোক এবং তারা একঘরে হয়ে থেকে সকল বাতেল শক্তির বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করুক। আল্লাহ তায়ালা এটাও চাননি যে আল্লাহর ভক্ত অনুগত বান্দাহরা শুধুমাত্র ঈমানী মনোবলকে সম্বল করে পৃথিবীর বস্তু শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়াক, মোকাবেলা করুক আত্মম্ভরী ও অহংকারী ক্ষমতাধরদের সাথে একেবারে খালি হাতে। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধন করার জন্যে শুধু তত্ত্বকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি– মোটেই আল্লাহর সুন্নত এটা নয় যে তাঁর সৈনিকরা ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার হয়ে যে কোনো মারনাস্ত্রের সামনে খালি হাতে এগিয়ে যাক, বরং অন্তরের গভীরে বিশ্বাসের সুবিশাল দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে অবশ্যই সেইসব সর্বাধুনিক সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে হবে যা নিয়ে বড়াই করছে শক্তিধরেরা এবং হা হা করে এগিয়ে আসছে আত্মগর্বী অহংকারী বলদর্পীরা– মোমেনদের হাতে ও প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ অস্ত্র হওয়া শর্ত, কিন্তু অস্ত্রের পরিমাণে বা জন সংখ্যায় এক হতে হবে এটা মোটেই জরুরী নয়– শত্রুর চোখে এক-কে দশ করে দেখানো এটা আল্লাহর দায়িত্ব, আর এই সাহায্য লাভের জন্যে মোমেনীন সালেহীনের কাছে আল্লাহ তায়ালা দাবী করেন পর্বতসম দৃঢ়তা, অবিচলতা-নিষ্ঠা ও আল্লাহর মহব্বতে সব কিছুকে বিলিয়ে দিয়ে, উদ্দেশ্য সাধনে নিঃশেষে নিজেদের জীবনটুকু পর্যন্ত কোরবানী করার মনোবাঞ্ছার প্রমাণ। মোমেনরা তো মানুষই– মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য দুর্বলতার উর্ধে তারা নয়। কাজেই যা মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায়, তাদের চোখেও তা চমক সৃষ্টি করে– আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল মানুষের স্বাভাবিক এসব দুর্বলতা জানেন, এজন্যে তিনি তাদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাননি যা তাদের প্রকৃতির খেলাফ। তবে, আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে, যখনই তারা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে মনে প্রাণে প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং যা

কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে কোনো শক্তিকে প্রতিরোধের জন্যে, মনের মধ্যে থাকবে 'বিনা রনে ছাড়ি নাহি দিবো এক ইঞ্চি ভূমি' তখনই আল্লাহর গায়েবী মদদ নেমে আসবে। তাই দেখা যায়, তৎকালীন নিবেদিত প্রাণ মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালা তখনই যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন যখন তারা মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে যথাসম্ভব বস্তুগত প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছে এবং তখনই তাদেরকে তিনি আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই যুদ্ধের খবরদারী করবেন এবং অবশ্যই তারা আল্লাহর সাহায্যের ছায়াতলে থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবেন।'

বিশ্ব সম্রাট আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের দুশমনদেরকে তাদের কুফরীর কারণে চরমভাবে ঘৃণা করেন এবং অবশ্য অবশ্যই তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন যেহেতু তারা সকল প্রকার আমানতের খেয়ানত করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো খেয়ানতকারী কাফেরকে পছন্দ করেন না।'

তিনিই সকল শক্তির আধার– তাঁর এই শক্তি বলেই তিনি মোমেনদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন যে তাদের শত্রুকে তিনি প্রতিহত করবেনই এবং মোমেনদের দলের মধ্যে শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখবেন যেহেতু তারা মযলুম– অন্যায়ভাবে তারা আক্রান্ত, মোটেই তারা অহংকারী নয়, মোটেই তারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের আকাংখী নয়, একথাটিই ফুটে উঠেছে নীচের আয়াতাংশে,

'তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে অনুমতি দেয়া হলো যেহেতু তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে।'

আর তাদেরকে জানানো হচ্ছে, তারা যেন নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত থাকে যে অবশ্যই আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্য আসবেই। এরশাদ হচ্ছে,

'আর নিশ্চিত একথা সত্য যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অবশ্যই সম্পূর্ণ সক্ষম।'

চিন্তাগত দিক দিয়ে মোমেনরা যুদ্ধ করার কাজটিকে যে ভালো কাজ বলে বুঝলেন তার কারণ হচ্ছে যালেমদের যুলুমকে উৎখাৎ করে যে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে বান্দাহদের বন্দেগী থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করা ও বান্দাহদেরকে তাঁর বন্দেগী করার সুযোগ করে দেয়ায় সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবতার উপকার হবে– শুধুমাত্র মুসলমানদের নয়। আর এ কল্যাণ সাধনে সকল মোমেনকে সামগ্রিকভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই যুদ্ধ-সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সকল প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতার মধ্য থেকে আকীদা ও এবাদাতের মুক্তি, আর এ মুক্তির পথ রচিত হয়েছে মক্কার মযলুম মুসলমানদের স্বদেশ থেকে না হক ভাবে বহিষ্কৃত হওয়ার বদৌলতে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'(সে মযলুম জনতা তারাই) যাদেরকে কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে; তাদেরকে শুধু মাত্র একথার কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ।'

মুসলমানদের যুদ্ধ করা সম্পর্কে আধুনিক দুনিয়ার মানুষ যতো কথা বলুক না কেন তার মধ্যে একথাটাই সব থেকে সত্য এবং সব থেকে সঠিক অথচ হায়! এই সর্বাধিক সত্য সঠিক কারণেই

তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। নিসন্দেহে ক্ষমতাগর্বী নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে এ আচরণ ছিলো সর্বদিক দিয়েই জঘন্য– এতে ব্যক্তিগত সাময়িক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কোনো লক্ষ্য এই নিষ্ঠুর আচরণের পেছনে নেই। মক্কী যিন্দেগীতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা তো সমাজ জীবনের বাস্তব কোনো ব্যাপারে হাত দিচ্ছিলেন না, নিছক বিশ্বাসগত এক পরিবর্তন এসেছিলো তাদের জীবনে, কিন্তু যালেমরা এতোটুকু অপরাধ (?) ও সহ্য করতে রাযি ছিলো না, এর জন্যেই তাদেরকে অসহায় অবস্থায় নিজেদের দেশ ছাড়তে হয়েছে– তারা কারো কোনো স্বার্থে হস্তক্ষেপ করছিলেন না, এমনও কিছু করছিলেন না যাতে তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার পথে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আঘাত লাগছিলো। কোনো স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছিলো, তাদের জীবন ধারণ পদ্ধতি বদলে যাচ্ছিলো বা তাদের কোনো উপকারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো!

এতদসত্তেও এসব কিছুর পেছনে যে সরল সত্য কথাটা বিরাজ করছে, অর্থাৎ আল্লাহকেই একমাত্র রব মানার ব্যাপার– এই আকীদাকেই তারা বরদাশত করতে পারছিলো না এবং ভাবছিলো নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালালেই সবাই ও সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, সব কিছু পরিত্যাগ করে, আবার সবাই তারা ফিরে আসবে বাপ-দাদার ধর্মে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'যদি আল্লাহ তায়ালা এক দলকে অপর আর এক দল দ্বারা দমন না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতো দরবেশদের নির্জন এবাদাতখানা খৃষ্টানদের গীর্জাসমূহ, ইহুদীদের উপাসনালয়গুলো এবং মুসলমানদের মাসজিদসমূহ– যেখানে বেশী বেশী আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।'

এখানে ব্যবহৃত শব্দগুলোতে 'সাওয়ামে' বলতে বুঝানো হয়েছে দরবেশদের নির্জন এবাদাতখানাসমূহ, 'বিয়ায়ুন' বলতে বুঝানো হয়েছে সওয়ামে থেকে প্রশস্ত খৃষ্টানদের গীর্জাসমূহ, 'সালাওয়াতুন' বলতে বুঝানো হয়েছে ইহুদীদের এবাদতখানাসমূহ এবং 'মাসাজিদ' বলতে বুঝানো হয়েছে মুসলমানদের এবাদাতের ঘরসমূহকে অর্থাৎ মাসজিদসমূহকে। উল্লেখিত এ সকল ঘর বরাবরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে খাস করে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে– অর্থাৎ এ স্থানগুলো নির্মিত ও সংরক্ষিত হয়েছে, এ স্থানগুলোতে সমবেত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করার জন্যে; কাজেই এসব স্থানগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে মোশরেকরা টার্গেট বানিয়ে রেখেছিলো এসব স্থানে একমাত্র আল্লাহরই স্মরণ হবে এবং তাদের দেব-দেবীদের কোনো স্থান এসব জায়গায় থাকবে না– এটা ছিলো তাদের সহ্যের বাইরে। এজন্যে এগুলোকে ভেংগে দিতে তারা ছিলো বদ্ধপরিকর। তাদের আক্রোশ থেকে এগুলোর রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না যদি না তাদের মধ্যে দলাদলি হতো এবং এক দল আর এক দলকে দমন না করতো প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। তারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ দেব-দেবীদের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব কায়েমের জন্যে চেষ্টা করতো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা এমনই ব্যস্ত হয়ে থাকতো যে তারা অপরের কথা ভুলে যেতো অথবা শক্তিহীন হয়ে পড়তো সে সব এবাদতখানা ভাংগার ব্যাপারে। বাতেল শক্তি সর্বদাই অহংকারে পরিপূর্ণ হয়, তার এ দম্ভ কখনও থামেনা বা শেষ হয় না, আর একারণেই সে অবিরতভাবে অন্যায় কাজ করতেই থাকে; এজন্যে এ অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্যে দরকার এমন কোনো শক্তি যা তার পাশাপাশি থেকে তার গতির সাথে তাল রেখে চলতে পারে, প্রতিবাদী ও প্রতিরোধকারী সে বাতেল শক্তিই সে অশুভ শক্তির সাথে থেকে তালে তাল মিলাতে পারে, মিথ্যা বলাতে ও মিথ্যা বলতে পারে। নিষ্ঠুরতার জওয়াব দিতে পারে নিষ্ঠুরতা দিয়ে, প্রয়োজনে ধোঁকা দিতে পারে। কেননা অনেক সময় সত্য সঠিক ব্যবস্থা দ্বারা ওদের জওয়াব ঠিক মতো হয় না। এ স্বতসিদ্ধ আইনের নিয়ম বরাবর একইভাবে চালু রয়েছে জীব জগতে ও জড় জগতে কার্যকর রয়েছে।

আল্লাহর সাহায্য কখন আসে

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন সেসব মোশরেকদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসছিলো এবং তাদের বিরুদ্ধে বাতেল শক্তি সীমালংঘন করছিলো– এজন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই মোমেনদের পক্ষে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে নিজেই উদ্যোগ নিলেন আর অবশ্যই কাফের খেয়ানতকারী, অহংকারে পরিপূর্ণ তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের পক্ষ থেকে (তাদের শত্রুর আক্রমণ) প্রতিহত করবেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারী কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তিনি নিজেই তাদের পক্ষ থেকে কাফেরদের যে কোনো আক্রমণকে প্রতিহত করবেন। আর এটা কি বুঝতে কষ্ট হয় যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যার পক্ষ নেন তার কোনো চিন্তা বা ভয় থাকার প্রশ্নই আসে না? আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন মোমেনদেরকে বিজয় দান করার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তখন আবার নিজের ভয় বা চিন্তা........ এখন প্রশ্ন আসে কিসের কারণ এ যুদ্ধ এবং কিসের কারণেই বা জেহাদের ডাক, কিসের কারণেই বা লড়াই করে প্রাণ হারানো বা জখমী হওয়া? কিসের কারণেই বা এতো সংগ্রাম, এতো কষ্ট, এতো ত্যাগ স্বীকার, এতো রক্তক্ষয়, এতো ব্যথা-বেদনা .... যুদ্ধের পরিণামে যখন বিজয় সুনিশ্চিত-একথা তো আল্লাহর জানাই আছে এবং মোমেনদের যখন জানাই আছে পরিণতিতে বিজয় আসবেই তখন এই যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজনটা কি?

এসবের জওয়াব হচ্ছে, প্রথম কথা আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে এসবের রহস্যরাজি এবং সব কিছুর পেছনে রয়েছে চূড়ান্ত যুক্তি যা হয়তো আমাদের সীমিত বুদ্ধির কারণে সঠিকভাবে সবকিছু নাও বুঝতে পারি। তবে চিন্তা করলে আমরা আল্লাহর হেকমতকে কিছু না কিছু অবশ্যই বুঝতে পারি। এ বুঝবার ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা কম বেশী হওয়ার কারণে হয়তো কিছু তারতম্য হতে পারে। তবে, আমাদের সবাই সাধারণভাবে যে জিনিসটা বুঝতে পারি তা হচ্ছে যে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা কিছুতেই চান না যে ইসলামের মৌখিক দাওয়াত তীর ধনুক প্রয়োগের মাধ্যমে যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করার দ্বারা দ্বীনের দাওয়াত বিফল হয়ে যাক। অবশ্যই মোমেনদের মধ্যে একদল লোক সকল সময়েই আছে যারা যুদ্ধের কোনো ঝুঁকি না নিয়ে এবং ময়দানে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতে চায়, চায় সহজেই আল্লাহর সাহায্যে বিনা কষ্টে বিজয় এসে যাক। যখনই কোনো কষ্ট হয় ও কোনো আক্রমণ আসে তখন তারা শুধু নামায কায়েম, কোরআন তেলাওয়াত এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করাকেই যথেষ্ট মনে করে।

হাঁ, অবশ্যই নামায কায়েম করতে হবে এবং সুখে ও দুঃখে দোয়া করার মাধ্যমে অবশ্যই আল্লাহমুখী হতে হবে, কিন্তু এতোটুকু কাজ করাকে এবাদাত বা বন্দেগী (মনিবের আনুগত্য) মনে করা এবং এর দ্বারা দাওয়াত দান করার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে এবং দ্বীনের সাহায্যকারীর ভূমিকায় সঠিক অবদান রাখা হয়েছে বলে মনে করা কিছুতেই সঠিক হবেনা? বরং আসল ব্যাপার হলো যে উপরোল্লেখিত আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ মোমেনকে জীবনের বাস্তব সমরক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়? অবশ্যই আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হবো যে বিশ্ব জোড়া আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্যে তাঁর প্রজাদের সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে রাখার লক্ষ্যে, তাঁরই আইন কানুন চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্যে যে সুশিক্ষিত সুবিন্যস্ত সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ

প্রয়োজন– ওপরে বর্ণিত গুণাবলীর মাধ্যমে সেই যোগ্যতাই অর্জিত হয় এবং সে গুণাবলীর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাথে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করতে পারে।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের পক্ষে থেকে তাদের শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন এবং তাদের সাথে এ ব্যাপারে ওয়াদাও করেছেন, অবশ্যই তিনি তাদের পদ্ধতিতে এবং তাদেরই হাত দিয়ে এ ওয়াদা পূরণ করবেন, যাতে করে যুদ্ধকালে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়। অতপর অবশ্যই এটা স্থির সত্য যে, যে কোনো মানবগোষ্ঠি যখনই তাদের সঞ্চিত শক্তিকে জাগ্রত করতে চায় তখনই তারা অবশ্যই কোনো বিপদের ঝুঁকি নেয় আর তখনই তারা অন্যায়কারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তখনই অশুভ শক্তিকে তারা দমন করতে সক্ষম হয়।

এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে তাদেরকে সংগ্রহ করতে হয় শক্তি সামর্থ এবং একত্রিত করতে হয় তাদের সম্মিলিত জনশক্তিকে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হয় ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হয়, তাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি দরদ মহব্বত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুপ্রেরণা জাগাতে হয়, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হয়, তাদের সম্ভাব্য সকল যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামকে নিয়োজিত করতে হয় এবং সর্বান্তকরণে ও সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে বাস্তব রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হয়। আল্লাহর খলীফা হিসেবে তাঁর দ্বীন কায়েমের যে বিরাট আমানত তারা কাঁধে তুলেছিলো সে বোঝা বহন করার জন্যে এবং তার হক আদায় করার জন্যে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি তারা নিয়েছিলো।

এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আশু সাহায্য আসা আল্লাহর জন্যে কোনো ব্যাপারই নয়। আর ঘরে বসে থাকা ও নির্বিকার চিত্তে গৃহের পরিবেশে নির্ঝঞ্ঝাট বসে থাকলে মোমেনদের মধ্যে যেসব সম্ভাবনার বীজ রেখে দেয়া হয়েছে তার আত্মপ্রকাশ বন্ধ হয়ে থাকবে, কেননা এ শক্তি নড়া-চড়ার অভাবে নির্জীব হয়ে যেতে বাধ্য।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাঁর সৈনিকদেরকে সময় মতো এবং এস্ত গতিতে সাহায্য করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু তার জন্যে তাঁর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যে তৎপরতা প্রয়োজন, তা যদি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে গ্রহণ করা না হয় তাহলে সে সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। এর প্রথম কারণ হচ্ছে,

অল্প মূল্যে সুন্দর ও ভালো সওদা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি এমন মূল্যবান কোনো বস্তু অল্প মূল্যে পাওয়াও যায়, সেগুলোর মূল্যায়ন হয় না এবং দেখা যায় সঠিকভাবে কাজে না লাগানোর কারণে ও অব্যবহৃত অবস্থায় তা নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে অল্পমূল্যে সংগৃহীত অস্ত্র সমরক্ষেত্রে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যায় না, আর যদি ভালো অস্ত্র অল্পমূল্যে পাওয়া যায় তাহলে তার কদর হয় না এবং অযত্ন-অবহেলায় ফেলে রাখায় তা নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্যে একাধারে হৃদয়ের আবেগ ও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং আল্লাহর সাহায্য বিজয় ও পরাজয়, আক্রমণ ও পলায়ন, শক্তি ও দুর্বলতা এবং ময়দানে অগ্রগতি ও ময়দান থেকে পলায়ন এসব অবস্থা মানুষ দেখে দেখেই বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতা লাভ করে। এসব অবস্থার পর্যায়ক্রমে আগমনে মানুষের মধ্যে যেসব চেতনা জাগে, তার মধ্যে রয়েছে আশা আকাংখা, ব্যথা-বেদনা, খুশী আনন্দ ও দুঃখ-দৈন্য, রয়েছে প্রশান্তি ও পেরেশানী। এসব চেতনার মধ্যে রয়েছে দুর্বলতা ও মুক্তির অনুভূতি............আর এগুলোর সাথে রয়েছে আকীদা বিশ্বাস, দলীয় জীবন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরের জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রসমূহে নিয়ম

শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। এ সকল অবস্থার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তি ও দুর্বলতার বিভিন্ন দিক বিকশিত হয়। এসব অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর রণক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্যে ও মানুষের বিভিন্নমুখী প্রবণতার সাথে সংঘাতকালে তাদের কাছে সঠিক দাওয়াত পেশ করা ও বিজয়ী হওয়ার জন্যে ওপরে বর্ণিত সকল প্রকার পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, যেহেতু মানুষকে দুনিয়ায় এসব অবস্থা নিয়েই চলতে হয়।

এসব কিছুর কারণে এবং এগুলোর বাইরে আল্লাহ তায়ালা আরো যা কিছু শিখিয়েছেন তা নিয়েই আমাদেরকে ময়দানে কাজ করতে হবে .... এভাবেই মোমেনদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা যে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন তা তাদের হাত দিয়েই বাস্তবায়িত করবেন আর এজন্যে তাদেরকে সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে নামতে হবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আকাশ থেকে ফেলে দেয়া এমন কোনো নেয়ামতের পুটলি নয় যা বিনা কষ্টে নেমে আসবে।(১)

যারা যুলুম করেছে, অন্যায়-অত্যাচার করেছে এবং মানুষকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের ওপর, সেই সকল হক পন্থী, যারা ঘোষণা দিয়েছে যে, আমাদের রব আল্লাহ'- তাদের বিজয় দান করতে কিছু বিলম্ব করা হয়েছে, আর এই বিলম্বের পেছনে অবশ্যই কিছু যুক্তিসংগত কারণ আছে, যা আল্লাহ তায়ালাই ভালো করে জানেন। অবশ্যই কিছু হেকমত আছে যে এ জন্যে তিনি বিজয় দিতে কিছু দেরী করেছেন। এই বিজয় দান করার কাজ পরিচালনা ও সূচনা ততোক্ষণ পর্যন্ত করা হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত মোমেন সমাজের বুনিয়াদ মযবুত না হয় এবং

(১) এতদসত্ত্বেও এটা সবৈব সত্য কথা যে ইসলাম যুদ্ধকে তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেনি। অর্থাৎ যুদ্ধ করার জন্যই ইসলাম এসেছে এবং যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম অন্য কিছু মানতে রাজি নয়-এমনটি মোটেই নয়; বরং ইতিহাস সাক্ষী যে, যে কোন যুদ্ধের পূর্বে আলাপ-আলোচনা ও শান্তি-চুক্তি করাকে বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে এই মহান আন্দোলনের সফল তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। আল কোরআনের বহু আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; কিন্তু এ শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে ইসলাম অবশ্যই একথা নিশ্চিত করতে চায় যে এ কাজে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কারো ওপর অত্যাচার করবে না, কারো স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। এ সমস্ত বিদ্রোহাত্মক ও যুক্তিহীন কাজ যেখানেই হোক এবং যার দ্বারাতেই হোক না কেন, এসব কাজ ও আচরণ যদি মানবতা বিরোধী হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি, শক্তি বা গোষ্ঠী যদি কোন জনপদের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার কাজে যদি কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ইনসাফপূর্ণ বিচার-ফায়সালায় যদি কেউ বাধা দেয়, মানুষের পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে কেউ যদি ইনসাফ না করে গনিমতের মাল ও অন্যান্য বস্তু বন্টনে কেউ যদি সঠিক ফায়সালা না করে, যার যার পাওনা তা যদি সঠিকভাবে বুঝে না দেয়া হয়, আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্য থেকে মানুষ যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মূল্যায়ন করার এসব বস্তুর মধ্যে যে কোন একটার যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন, ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির দাবী হোক বা সমাজের কাছে ব্যক্তির দাবীজনিত বিষয় হোক অথবা ব্যক্তির কাছে সমাজের ও সমাজের কাছে সমাজের দাবীর ব্যাপার হোক অথবা কোন রাষ্ট্রের অন্য কোন রাষ্ট্রের পাওনা হোক না কেন৷৷এগুলোর কোন একটিও যদি পূরণ না করা হয় তাহলেও সেসব আচরণ বিদ্রোহাত্মক বা অন্যায় কাজ বলে গণ্য করা হবে। এ ধরনের কোন অন্যায় কাজ করে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে বলে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আবার কেউ যদি মনে করে ইসলাম অর্থ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক থেকে নিয়ে সমাজ, দেশ ও জাতিতে জাতিতে আদান-প্রদান ও চুক্তি বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ সে কথাও ঠিক নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধান মতে সমাজের সকল স্তর ও পর্যায়ে হক ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নামই ইসলাম (আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আস-সালামুল আলামী আল ইসলাম'-গ্রন্থটি)

তাদের সব কিছুর মধ্যে পরিপক্কতা না আসে, কারণ কোনো কিছু পরিপক্ক হয়ে গেলে তাকে পরিপক্কতা দান করতে আর কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করবে না, একবার পরিপূর্ণতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারলে তার ওপর নতুন আর কোনো মত প্রকাশের সুযোগ কেউ পাবে না এবং একবার ইসলামী শক্তি আত্মপ্রকাশ করার পর ইসলামের দুশমনরা তার বিরুদ্ধে তৎপরতা চালানোর সাহস হারিয়ে ফেলবে। সকল প্রকার কাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা লাভ করার পূর্বেই যদি আল্লাহ তায়ালা সাহায্য ও বিজয় এসে যায় তাহলে মুসলমানেরা এ বিজয়কে বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না, বরং যোগ্যতার অভাবে শীঘ্রই তারা এই সহজ বিজয়কে হারিয়ে ফেলবে!

এই কারণেই দেখা গেছে, বিজয় দান করা হয়েছে তখন যখন মুসলমানরা সাধ্যমত যোগ্যতা অর্জন করেছে, তাদের একতা সুসংবদ্ধ হয়েছে, তাদের নিজ মিশনের প্রতি মহব্বত আশানুরূপ প্রগাঢ় হয়েছে, কিছু জনশক্তি সৃষ্টি হয়েছে, মনোবল গড়ে উঠেছে এবং যথাসাধ্য হাতিয়ার ও রসদও যোগাড় হয়ে গেছে; যখন আল্লাহর পথে সব কিছু বিলিয়ে দেয়ার জন্যে সর্বোতভাবে তারা প্রস্তুত হয়ে গেছে ঠিক তখনই এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য ও বিজয়।

রসূলুল্লাহ (স.) পরিচালিত এই ক্ষুদ্র উম্মতের জন্যে তখনই সাহায্য এসেছে যখন তারা তাদের শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা সবটুকু ব্যবহার করেছে এবং পরিশেষে আল্লাহর ওপর এই অনুভূতি নিয়ে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করেছে যে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সকল যোগাড় যন্ত্র বিফল। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সাহায্য তখনই নাযিল হবে যখন তারা সাধ্যমত সব কিছু করবে এবং এরপর আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।

কখনও এ কারণেও সাহায্য বিলম্বিত করা হয় যে আল্লাহ তায়ালা চান মানুষ আরো বেশী আল্লাহর মুখাপেক্ষী হোক, তাঁর কাছে আরো কাতর হোক এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক, এর ফলে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সুযোগ হবে। এদেরকে সাহায্য চাইতে হবে, ব্যথা-বেদনা ভোগ করতে হবে এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং মনের মধ্যে সর্বদা একথা রাখতে হবে যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই এবং দুঃখের দিনে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এমন কেউ নেই যার আশ্রয় কামনা করা যেতে পারে। আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করার পর আল্লাহর পথে মযবুতীর সাথে টিকে থাকার জন্যে আল্লাহর সাথে এই সম্পর্কই মানুষকে সাহায্য করে, যেহেতু তাঁর অনুমতিক্রমে তারা যুদ্ধ করে। কাজেই, তারা মনে করে এ বিজয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব আল্লাহর, এতে তাদের ফূর্তি করার কিছু নেই, গর্ব করার তো প্রশ্নই ওঠেনা। আর এজন্যে তারা কোনো অহংকারও করে না এবং সত্য সঠিক কাজ ও ইনসাফ করা থেকেও সেইসব কল্যাণকর কাজ থেকে তারা পিছিয়ে যায় না, যার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন।

আবার, কখনও সাহায্য আসতে এজন্যেও বিলম্ব হয় যে, আল্লাহ তায়ালা দেখে নিতে চান কে সংগ্রাম করা থেকে থেমে যায়, পরখ করে নিতে চান কে আল্লাহর পথে কতটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত, আর কে নিজ স্বার্থের জন্যে যুদ্ধ করে এবং কে যুদ্ধ করে শত্রুর মোকাবেলায় নিজের বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্যে। আল্লাহ তায়ালা চান জেহাদ একমাত্র তাঁর জন্যেই করা হোক এবং তাঁর পথেই করা হোক, এতে অন্য কোনো চিন্তা-চেতনা বা উদ্দেশ্য না থাকুক। একবার রসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে আত্ম মর্যাদা, বংশ বা জাতির স্বার্থে, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে নিজ বাহাদুরী প্রদর্শনের জন্যে, আর এক ব্যক্তি লোককে দেখানোর জন্যে যুদ্ধ করে এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে বলে মনে করা যায়? তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন,

যে আল্লাহর কথা (ও কাজকে) এবং আল্লাহর প্রাধান্যকে সমুন্নত করার জন্যে যুদ্ধ করে সেই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।(১)

আবার কখনও সাহায্য আসতে একারণেও বিলম্ব হয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে তার অকল্যাণের মধ্যে কিছু কল্যাণকারিতা থাকতে পারে, যা পরখ করার জন্যে অথবা যাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে অবস্থিত কিছু ভালো লোককে বের হয়ে পৃথক সুযোগ দেয়ার অপেক্ষায় বিলম্ব করা হয়, যাতে করে নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করা যেতে পারে এবং যেন মন্দকে দূর করতে গিয়ে ভালোর এতোটুকু ক্ষতি না হয় বা কোনো কল্যাণকারিতা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে না যায়।

কখনও আবার এজন্যেও বিলম্বে সাহায্য আসে যে, যাদের সাথে মোমেনরা যুদ্ধরত তাদের মিথ্যাচার সাধারণ মানুষের কাছে এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। এমতাবস্থায় মোমেনরা বিজয়ী হয়ে গেলে তাদের আশেপাশে যাদেরকে তারা সাহায্যকারী হিসাবে দেখতে পাবে তারা আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে পারবে না এবং গোপনে গোপনে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের অর্জিত বিজয়কে নস্যাৎ করতে চাইবে, এর ফলে, যেসব সরল মানুষের কাছে সকল ঘটনা স্পষ্ট নয় তারা সঠিক অবস্থা বুঝতে না পারায় দারুণ সংকট অনুভব করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এজন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান, বাতিল ব্যবস্থার অসারতা সাধারণ জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা টিকে থাকুক। আর সত্য ব্যবস্থার অনুসারীরা যেন এই বিলম্বিত সাহায্যের কারণে আফসোস না করে।

আবার কখনও এজন্যেও সাহায্য আসতে বিলম্ব হয় যে, মোমেনরা যে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা কবুল করেছে, তা রাষ্ট্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মতো পরিবেশ হয়তো এখনও গড়ে ওঠেনি, ইসলাম যে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার কায়েম করতে চায় তার সঠিক মূল্যায়ন করার যোগ্যতা এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে পয়দা হয়নি। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যদি এসে যায় তাহলে গোটা পরিবেশ আরও বেশী বিরোধী হয়ে উঠবে এবং সর্বদাই এ বিজয়কে তারা বাঁকা চোখে দেখবে এবং এ বিজয়কে বিফল করার জন্যে নানা প্রকার চক্রান্ত করতে থাকবে। এর ফলে সমাজের মধ্যে সর্বদা একটা ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশ বিরাজ করতে থাকবে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে তাদের স্বভাব-প্রকৃতির উপযোগী করে যে ব্যবস্থা পাঠানো হয়েছে তার কার্যকারিতা ব্যাহত হবে!

ওপরে বর্ণিত কারণসমূহ ছাড়াও হয়তো আরো কিছু কারণ আছে যেগুলো বিবেচনা করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে বিলম্ব করেছেন। এজন্যে অনেক কোরবানী দিতে হয়েছে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এবং বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদেরকে বহু কষ্ট করতে হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে এসেছে এবং আল্লাহ তায়ালা দুশমনদের মোকাবেলায় সরাসরি বরাবরই সত্যপন্থীদেরকে সাহায্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহায্য লাভের জন্যে মানুষকে বহু বহু তাকলীফ করতে হয়। কষ্ট ছাড়া, ত্যাগ ছাড়া এবং ধৈর্য ছাড়া কোনো বড়ো নেয়ামত আশা করা যায় না। একথা সর্ববাদি সত্য এবং চিরদিন মানুষ এসত্য উপলব্ধি করে এসেছে যে মূল্যবান জিনিস মূল্য দিয়েই খরিদ করতে হবে। সুতরাং, মুসলমানদেরকেও অবশ্যই অনেক অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে

(১) বোখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সত্যের বাতি জ্বালতে হবে, যেমন করে অতীতে তারা বহু দুঃসহ জ্বালা সহ্য করার মধ্য দিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা, অবশ্যই মহা শক্তিমান। সকল ক্ষমতার অধিকারী........... আর আল্লাহর হাতেই রয়েছে সকল কাজের শেষ পরিণতি। (আয়াত ৪০-৪১)

অর্থাৎ, আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে আশ্বাস দিচ্ছেন যে যারা তাঁকে সাহায্য করবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন, এটা তাঁর ওয়াদা এবং কিছুতেই তিনি এ ওয়াদা খেলাফ করবেন না। সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি বা দল আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আসবে তারা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার হকদার হয়ে যাবে। তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওয়াদা খেলাফের প্রশ্নই আসে না, যেহেতু তিনিই সর্বশক্তিমান– তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি সাহায্য করতে চাইলে যে কোনো অবস্থায় এবং যে কোনো সময়ে যে কোনো প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম। কেউ নেই এমন যে তাঁর ইচ্ছা বা ক্ষমতায় বাধ সাধতে পারে। অতএব, যে তাঁর ওপর ভরসা করে একমাত্র তাঁর জন্যেই লড়বে, কে আছে এমন যে তাদেরকে হারাতে পারে? নিশ্চয়ই তারা হচ্ছে, এসব মানুষ 'যাদেরকে আমি, যদি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি' অর্থাৎ আমি তাদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়ে দিয়েছি এবং তাদের সকল বিষয়কে আমি স্থির করে দিয়েছি যখন আমার সাহায্যক্রমে তারা পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যখন হবে তখন তাদের জীবনের বাস্তব কাজের মধ্যে দেখা যাবে যে তারা

'নামায কায়েম করেছে?'

অর্থাৎ পাঁচবার নামায কায়েম করার দ্বারা তারা ইসলাম গ্রহণ করার বাস্তব প্রমাণ পেশ করেছে– অর্থাৎ প্রকাশ্য ও দলবদ্ধভাবে এই আনুষ্ঠানিক এবাদাত কায়েমের মাধ্যমে তারা তাদের ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং অমুসলমানদের সামনে তারা মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য পেশ করেছে। এই প্রকাশ্য ও অনাড়ম্বর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তারা শারীরিক দিক দিয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত থাকার কথা ঘোষণা দিয়েছে এবং এই এবাদাতের মাধ্যমে তারা আনুগত্যভরা হৃদয় নিয়ে এবং বিনয়াবনতভাবে নিজেদেরকে আল্লাহমুখী হওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয় যে কাজটি তারা করে বলে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন তা হচ্ছে,

'তারা যাকাত দান করে,

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে অর্থ দিয়েছেন তার হক আদায় করে এবং অর্থ খরচ করার ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে যে সংকীর্ণতা আসতে থাকে তার ওপর বিজয়ী হয়েছে। এভাবে তারা লোভ লালসাকে নিয়ন্ত্রিত পাক পবিত্র হতে পেরেছে এবং শয়তানের প্ররোচনাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে এভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজের গরীব ধনীর ব্যবধান কমিয়ে এনে তাদেরকে এক সুখী সমৃদ্ধ সমাজে পরিণত করতে পারে, দুর্বল ও প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তাদের জীবনের গতি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। যেমন হাদীসের ভাষায় জানা যায়, 'মোমেনদের পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতি ও দয়া মায়া মমতার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহের মতো। সে দেহের কোনো একটি অংগে যখন কোনো কষ্ট দেখা দেয় তখন তার বেদনা গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে ও গোটা শরীরই তখন নিদ্রাহীনতায় ভোগে ও জ্বরা-গ্রস্ত হয়ে যায়।' এরপর কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে, 'তারা (পরস্পরকে) ভালো কাজের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ, ভালো ও সংশোধনী প্রচেষ্টায় তারা পরস্পরকে আহ্বান জানাতে থাকে, অর্থাৎ তারা ভালোর দিকে

অন্যান্যদেরকে এগিয়ে দেয়, 'এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে' ....তারা সম্মিলিতভাবে যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; আর এভাবে এবং সম্ভাব্য আরো অন্যান্য পন্থায় তারা মোমেনদের মধ্যে সুন্দর ও মধুর চরিত্র গঠনের উপযোগী গুণাবলী গড়ে তোলে, এসব গুণাবলী সেই সব অন্যায়কারীদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না যারা এগুলো দূর করতে চাইলে দূর করতে পারে, কিন্তু তার জন্যে তেমন কোনো চেষ্টা তাদের নেই এবং ইচ্ছা করলে ভালো গুণাবলী গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে ইচ্ছা তারা করে না।

ওপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী মানুষেরাই আল্লাহকে সাহায্য করে, তখন তারা এভাবে সাহায্য করে যে জীবনের চলার পথে সেইসব বিধান তারা অনুসরণ করে যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। একমাত্র আল্লাহকেই তারা সকল শক্তির উৎস মনে করে– অন্য কাউকে নয়, এদেরকেই সাহায্য করবেন বলে আল্লাহ তায়ালা সুনিশ্চিতভাবে ওয়াদা করেছেন।

এ সাহায্য কোনো সাময়িক বিষয় নয়, বরং মোমেনদের জন্যে সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণের মাধ্যমে এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থায়ী সাহায্যের ওয়াদা, তবে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্যে মোমেনদের মধ্যে সদা-সর্বদা ইচ্ছা আকাংখা ও আন্তরিক চেষ্টা থাকতে হবে। তারপর কখন কিভাবে সাহায্য করা হবে তা নির্ধারণ করা আল্লাহর নিজস্ব ব্যাপার। তিনি ইচ্ছা করলে সুনিশ্চিত পরাজয়কে বদলে দিয়ে বিজয়ের মালা পরান এবং চাইলে তিনি বিজয়ী অবস্থাকে পরিবর্তন করে পরাজয়ের গ্লানিতে তাদের ঢেকে দেন এটা সাধারণত তখনই হবে যখন তাদের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যাবে অথবা তাদের দায়িত্বসমূহ পালন করা থেকে তারা পিছিয়ে যাবে। 'আর আল্লাহরই হাতে রয়েছে সকল কাজের পরিণতি।'

আল্লাহর সাহায্য তখনই নেমে আসে যখন কালেমার শর্ত পুরনকারী মুসলিম দল তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর বুকে কায়েম করার জন্যে রসূলের শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালায়। যখন মানুষ হক, ইনসাফ এবং কল্যাণ ও সংশোধনী আনার জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালায় এবং আল্লাহর গোলামী ছাড়া অন্য সকল প্রকার গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে হয় আযাদী সংগ্রামে লিপ্ত তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মানজনক বিজয় নেমে আসে। এজন্যে প্রয়োজন হচ্ছে আত্মসংযম, লোভ সংবরণ ও লাগাম ছাড়া আশা-আকাংখাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা।

আল্লাহর এ সাহায্য লাভের জন্যে অবশ্যই মানুষকে কিছু করতে হবে, মূল্যবান কিছু ব্যয় করতে হবে, কিছু কষ্ট করতে হবে, কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সাহায্য কাউকে এলোমেলোভাবে বা বিনা যুক্তিতে দেয়া হয় না– এর জন্যে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতি আছে এবং কিছু শর্ত আছে। যারা এসব শর্ত পূরণ করে তাদের ওপরই আল্লাহ পাকের মোবারক সাহায্য।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ
إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَٰبُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَٰفِرِينَ
ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ
فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى
الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ أٰذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا
لَا تَعْمَى الْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ
رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ
ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۖ وَإِلَىَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

৪২. (হে নবী,) এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে (তাতে তোমার উদ্বেগের কিছুই নেই), এদের আগে নূহের জাতি, আদ ও সামুদের লোকেরাও (তাদের নবীদের) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো, ৪৩. ইবরাহীমের জাতি এবং লূতের জাতিও (তাই করেছিলো), ৪৪. (আরো করেছে) মাদইয়ানের অধিবাসীরা, মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, তারপরও আমি (এ) কাফেরদের ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অতপর (সময় এসে গেলে) আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করেছি, কি ভয়ংকর ছিলো আমার (সে) আযাব! ৪৫. আমি ধ্বংস করেছি (আরো) অনেক জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, অতপর তা (বিধ্বস্ত হয়ে) মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো, (কতো) কূপ পরিত্যক্ত হয়ে পড়লো, (কতো) শখের সুন্দর প্রাসাদ বিরান হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলো! ৪৬. এরা কি যমীনে ঘুরে ফিরে (এগুলো পর্যবেক্ষণ) করেনি? (পর্যবেক্ষণ করলে) এদের অন্তর এমন হবে যা দ্বারা এরা তা বুঝতে পারবে, তাদের কান এমন হবে যা দ্বারা তারা শুনতে পারবে, আসলে (অবোধ নির্বোধের) চোখ তো কখনো অন্ধ হয়ে যায় না, অন্ধ হয়ে যায় সে অন্তর, যা মনের ভেতর (লুকিয়ে) থাকে। ৪৭. (হে নবী,) এরা তোমার কাছে আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে (তুমি বলো), আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না; তোমার মালিকের কাছে যা একদিন, তা তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। ৪৮. আরো কতো জনপদ ছিলো, তাদেরও আমি (প্রথম দিকে) ঢিল দিয়ে রেখেছিলাম, অথচ তারা ছিলো যালেম, অতপর (এক সময়) আমি তাদের (কঠিনভাবে) পাকড়াও করেছিলাম, (পরিশেষে সবাইকে তো) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿৪৯﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿৫০﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا
مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿৫১﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ
وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا
يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿৫২﴾ لِّيَجْعَلَ مَا
يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ
الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿৫৩﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿৫৪﴾

রুকু ৭

৪৯. (হে নবী,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি (তো) তোমাদের জন্যে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র, ৫০. যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। ৫১. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। ৫২. (হে নবী,) আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী কিংবা রসূলই পাঠাইনি (যারা এ ঘটনার সম্মুখীন হয়নি যে), যখন সে (নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করলো তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফেরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, অতপর আল্লাহ তায়ালা শয়তানের নিক্ষিপ্ত (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজের আয়াতসমূহকে (আরো) মযবুত করে দেন, আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন, তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞ কুশলী, ৫৩. (এর উদ্দেশ্য হচ্ছে) যেন আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রক্ষিপ্ত (সন্দেহ)-গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের অন্তরে (আগে থেকেই মোনাফেকীর) ব্যাধি আছে, উপরন্তু যারা একান্ত পাষাণ হৃদয়; অবশ্যই (এ) যালেমরা অনেক মতবিরোধ ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে, ৫৪. (এটা এ কারণে,) যাদের (আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে, এটাই তোমার মালিকের পক্ষ থেকে আসা সত্য, অতপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ
يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

৫৫. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, তারা এ (কোরআনের) ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা থেকে কখনো বিরত হবে না, যতোক্ষণ না একদিন আকস্মিকভাবে তাদের ওপর কেয়ামত এসে পড়বে, অথবা তাদের ওপর একটি অবাঞ্ছিত ও ভয়ংকর দিনের আযাব এসে পড়বে। ৫৬. সেদিন চূড়ান্ত বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার; তিনি তাদের সবার মাঝে ফয়সালা করবেন; অতপর যারা (তাঁর ওপর) ঈমান এনেছে এবং (সে মোতাবেক) নেক কাজ করেছে, তারা (সেদিন) নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে। ৫৭. যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের জন্যে অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা থাকবে।

তাফসীর
আয়াত ৪২-৫৭

এখানে পূর্ববর্তী দারসটি শেষ হচ্ছে। এ দারসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসসমূহ ও ইসলামের প্রতীকী চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে; আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে সকল লোককে সাহায্য করবেন বলে ওয়াদা করেছেন যারা তাদের ঈমান আকীদা ঠিক রাখার জন্যে এবং মানুষের জীবনে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার কষ্ট করেছে এমনকি জীবনেরও ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারপর দ্বীনের খাতিরে মোমেনদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও ঝুঁকি নেয়ার কথা বর্ণনা শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসূলুল্লাহ (স.)-কে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে বলছেন যে তাঁর সাহায্যের জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতকে প্রসারিত করে রেখেছেন এবং কাফেরদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্যে তাঁর গযবের হাতও কার্যরত রয়েছে, যেমন করে তাঁর পূর্ববর্তী রসূল ভাইদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের হাতকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। সত্যকে মিথ্যা বানানোর প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যামানায় তিনি কঠিনভাবে পাকড়াও করেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে তিনি কোরআন নাযিল কালের মোশরেকদের সহ সকল যামানার অন্যায়-অত্যাচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে সময় থাকতেই সাবধান হতে বলেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নেয় এবং যে কারণে তাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছিলো, সময় থাকতেই সে কারণগুলো বর্জন করে, যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা শিক্ষা গ্রহণকারী ও চিন্তাশীল অন্তরের অধিকারী হয়ে থাকে। আসলে তাদের

চোখগুলো এমন অন্ধ হচ্ছে নয় যে সত্য ও ন্যায়ের পথ তারা দেখতে পাচ্ছে না; বরং অন্ধ তাদের বক্ষস্থিত কালব (অন্তর) সমূহ।

এরপর মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদেরকে বরাবর শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন এবং হেফাযত করেছেন সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র থেকেও, আর শয়তানের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করে দিয়ে তিনি তাঁর নিদর্শনাবলীকে মযবুত বানিয়ে সেগুলোকে যে কোনো নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত অন্তরসমূহের কাছে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কিন্তু রোগগ্রস্ত সত্য বিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের হৃদয়ের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় থাকবেই।

অতপর খেয়াল করুন আলোচ্য অধ্যায়ের সবটুকুই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের নমুনাসমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিয়োজিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে এবং এসব বর্ণনা দাওয়াতী কাজের জন্যে রচিত কেতাবসমূহের মধ্যেও লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখানে এটাও দেখানো হয়েছে যে, ইসলামের দাওয়াত দানকারীরা তাদের মৌলিক ও প্রাথমিক কর্তব্যসমূহ পালন করার সাথে সাথে সারা বিশ্বের বুকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এমনকি তারা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেও এ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেছেন, যার বিবরণ ইতিপূর্বেকার পর্বে আমরা দেখতে পেয়েছি।

যুগে যুগে দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকারকারীদের পরিণতি

এরশাদ হচ্ছে,

'যদি ওরা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে ও তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে চেষ্টা করে তাহলে জেনে রাখো, এটা নতুন কোনো কথা নয়, বরং ....সুতরাং দেখো না, কেমন হলো (তাদের অস্বীকৃতির) পরিণতি। (আয়াত ৪২-৪৪)

আসলে রসূলদের সকলের জীবনেই এই অস্বীকৃতিজনিত কষ্ট দান সাধারণভাবে দেখা যায়। শেষ রসূল (স.)-এর পূর্বে যতো রসূলই এসেছেন তাদের সবার জীবনেই দেখা যায়, তাদের দেশবাসীরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, শুধু আখেরী রসূলকেই যে অস্বীকার করা হয়েছে তা নয় অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে যে পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তাও, মোটামুটি সবার জানা আছে, এই সাধারণ নিয়মের কথা আল কোরআনের ভাষায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অবশ্যই ওদের পূর্বে নূহের কওম, আদ, সামূদ ও ইবরাহীমের কওম এবং লূৎ-এর কওম (তাদের রসূলদেরকে) প্রত্যাখ্যান করেছে।' (আয়াত ৪৩) এখানে দেখা যায়, এই সাধারণ বর্ণনার ধারার মধ্য থেকে মূসা (আ.)-এর কথা একটু পৃথকভাবে বলা হয়েছে, খাস এক একটি বাক্যে তার কথাটি পেশ করা হয়েছে,

এরশাদ হচ্ছে, 'আর মূসাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো।' তাঁর কথা খাসভাবে বলার অনেকগুলো কারণ দেখা যায়; যেমন, এক, অন্যান্য জাতিরা যেমন তাদের রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিলো, সেইভাবে মূসা (আ.)-এর কওম তাকে অস্বীকার করেনি, বরং তাঁকে অস্বীকার করেছিলো ফেরাউন ও তার কওমের নেতৃবৃন্দ। দুই, মূসা (আ.)-কে তার রেসালাতের প্রমাণস্বরূপ অনেকগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ বা মোজেযা দেয়া হয়েছিলো, এতো বেশী দৃশ্যমান মোজেযা আর কাউকেই দেয়া হয়নি এবং প্রত্যেকটি মোজেযা দেখানোর পর কাফেরদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে এবং বুঝার জন্যে বেশ কিছু সময় দেয়া হয়েছিলো, যেমন করে সময় দেয়া হয়েছিলো কোরায়শদেরকেও– তারপর তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়েছিলো। আর এখানে

অত্যন্ত ভীতিপ্রদভাবেও বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন রাখা হয়েছে, অতপর কেমন হলো তাদের শাস্তি (শেষ পরিণাম)?................ আসলে 'নাকীর' শব্দটির অর্থ হচ্ছে কঠিন অস্বীকৃতি, যার মধ্যে (শিক্ষা ও কথাকে) পরিবর্তনের অর্থও নিহিত রয়েছে। এর জবাবও সর্বজন বিদিত অর্থাৎ, এটা ছিলো বড়ো ভয়ংকর শাস্তি! আর তা হচ্ছে, তুফানের শাস্তি, পৃথিবীর মধ্যে ধসে যাওয়ার শাস্তি, প্রলয়কান্ড ও জনপদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার শাস্তি, ভূমিকম্পের শাস্তি– ঘূর্ণিঝড় ও সর্বগ্রাসী আতংকের শাস্তি.......।

আর একের পর এক এসব কথা পেশ করার পর সাধারণভাবে প্রাচীনকালে সত্য বিরোধীদের প্রতি অবশ্যম্ভাবী আযাব নাযিল হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কতো যালেম জাতিকে আমি মহান আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে (নীস্ত না-বুদ হয়ে গেছে ধরনীর বুক থেকে), পরিত্যক্ত ও বীরান হয়ে রয়েছে তাদের ইদারাগুলো এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে তাদের ইমারতগুলো।'

তাদের যুলুমের কারণে এধরনের বহু এলাকা ও শহর নগরের ধ্বংসাবিশেষের চিহ্ন আজও পৃথিবীর বুকে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে,

এসব ঘটনার বিবরণ এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যেন মনে হয় সে ধ্বংসলীলার দৃশ্যগুলো আমাদের চোখের সামনে আজও ভাসছে এবং আমাদের অন্তর্চক্ষুর সে দেখা আমাদের মধ্যে প্রবল এক কম্পনের সৃষ্টি করছে,

'সেগুলো পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে আছে'...............

'উ'রূশ' বলতে ছাদসমূহকে বুঝায় এগুলো তো ভিত্তি নির্মাণের পর নির্মিত ইমারতের প্রাচীরের ওপর স্থাপিত হয়........ যখন এ বুনিয়াদগুলো ভেংগে যায় তখন তার ওপর ধসে পড়ে ছাদগুলো আর তার পর গোটা প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কল্পনানেত্রে এ দৃশ্যটি ভেসে উঠলে ভয়ানক এক দুঃখজনক অবস্থা হৃদয়মনকে ছেয়ে ফেলে এবং এ কাল্পনিক দৃশ্য চিন্তা জাগায়।

মক্কানগরীর নিকটে বহু ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, দেখা যায় বহু শূন্য কূপ ও ইঁদারার চিহ্ন, বহু পর্যটক এখানে এসে এসব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেছে, তারা এসব ধ্বংসস্তূপ দেখে এখানকার অহংকারী অধিবাসীদের কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে।

আরো দেখা যায় মক্কানগরীর চতুর্দিকের পবর্তাঞ্চলে জনশূন্য বহু মযবুত ইমারতের ধ্বংসাবিশেষ। বহু পর্যটক এখানে এসে আর অনুভব করে যে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিসমূহের প্রেতাত্মাগুলো যেন এখনও এসব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবিশ্বাসীদের বিবেকের দরজায় আঘাত হানা

এ প্রসংগের আলোচনা যখন সামনে আসে তখন পাঠকের হৃদয় পটে ভেসে ওঠে এসব ধ্বংস্তূপের ছবি, আর তখনই মোশরেক কাফেরদের সামনে ক্রোধ ও ঘৃণার সাথে এ প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়,

ওরা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করে না.........কিন্তু তাদের বক্ষ মধ্যস্থিত হৃদয়গুলো অন্ধ (ভোঁতা) হয়ে গেছে। (আয়াত ৪৬)

অতীতের অহংকারী জাতিসমূহের নাফরমানীর দরুণ নেমে আসা এসব গযবের দৃশ্য দেখে যে কোনো ব্যক্তির চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, নিষ্পলক নেত্রে সে এগুলোর দিকে তাকিয়ে তার অন্তরপটে জেগে ওঠে সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির অহংকারপূর্ণ আচরণ ও তার ফলে নেমে আসা এসব গযব। তাই, এসব দর্শকদের শিক্ষার জন্যে, তাদের সামনে এ প্রশ্নটি রাখা হচ্ছে, 'তারা কি

ভ্রমণ করে না পৃথিবীর বুকে এবং দেখে না কি ....' এগুলো সামনে রেখে ওরা কি চিন্তা করে না? চিন্তা করলে অবশ্য তারা বুঝবে নাফরমানীর পরিণাম কতো কঠিন এবং হয়তো এর থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারবে, কারণ এসব দৃশ্য অবলোকনকালে এগুলো যেন তাদের সাথে কথা বলতে থাকে।

'তখন তাদের অন্তরগুলো কি এসব দৃশ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না।'

অবশ্যই অন্তর্চক্ষু ও দিলওয়ালা লোকেরা ধ্বংসস্তূপের এসব দৃশ্য থেকে শিক্ষা নিতে পারবে এ- ধ্বংসাবশেষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবিকলভাবে পড়ে রয়েছে- এ ছবিগুলো বদলে যাচ্ছে না, শেষও হয়ে যাচ্ছে না- মানুষকে দেখানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা এসব ধ্বংসাবশেষকে অবিকল অবস্থায় রেখে দিয়েছেন।

'তাদের কি কান নেই, কি তার দ্বারা (এসব অতীত কাহিনী) কি তারা শোনে না?'

তারা যদি অতীতের এসব ধ্বংসাবশেষের কাহিনী পর্যটকদের মুখে শুনতো তাহলেও তারা অনেক শিক্ষা নিতে পারতো।

তাদের কি অন্তর নেই? তারা দেখছে এসব জীবন্ত দৃশ্য তবুও তারা এ থেকে কি শিক্ষা নিচ্ছে না? এসব ঘটনার বিবরণ তারা শুনছে, তবুও তাদের টনক নড়ছে না, কোনো প্রকার দাগই কাটছে না তাদের হৃদয় কন্দরে! এজন্যেই বলা হয়েছে,

'আসলে তাদের চোখগুলো অন্ধ নয়, বরং তাদের বুকের মধ্যে অবস্থিত অন্তরগুলোই অন্ধ হয়ে গেছে।'

বিশেষভাবে অন্তর মধ্যস্থিত স্থানের কথা উল্লেখ করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে, 'যা রয়েছে বক্ষসমূহের মধ্যে' অর্থাৎ, পাঠকের হৃদয়ে বিশেষভাবে চিন্তার উদ্রেক করানোর উদ্দেশ্যে এই বুকের মধ্যে অবস্থিত স্থানের কথা খাস করে বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষেই যদি তাদের বুকের মধ্যে অবস্থিত অন্তরগুলো বাস্তব চোখের অধিকারী হতো তাহলে অবশ্যই তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো এবং পরকালের ঈমানের চিন্তার দিকে তাদের গতি ফিরে যেতো। তারা বুঝতো যে অতীত জাতিসমূহের নাফরমানী ও অহংকারের কারণে যে দুর্গতি হয়েছে তাদের জন্যেও সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে এবং তাদের আশ-পাশেই তো প্রাচীন জাতিসমূহের বিস্তর ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে!

কিন্তু ধ্বংসাবশেষ দেখে চিন্তা করা ও শিক্ষা নেয়া ঈমান আনার দিকে ঝুঁকে পড়া ও আল্লাহর আযাবকে ভয় করার আসুক না দেখি আযাব, দেখি কেমন করে আসে, অর্থাৎ শাস্তি লাভ করার জন্যে তারা বড়োই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ভাবখানা এই যে আযাব বড়ো মজার জিনিস তাই না? আর এটা এই জন্যে সম্ভব হচ্ছে, যে আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা বড়োই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আযাবের জন্যে .... আর সেদিনকার একটি দিন, তোমরা যেসব দিন গুনে থাক তার হাজার বছরের সমান।'

সকল কালের ও সকল সময়ের যালেমদের এইটিই তো রীতি। তারা যালেমদের তৎপরতা ও পরিণাম দেখে তাদের সম্পর্কে বহু সংবাদও পাঠ করে এবং তাদের পরিণাম কি হচ্ছে এরপরও। জানতে পারে, পথের শেষের দিকে না তাকিয়ে এবং পরিণাম কি হবে সে চিন্তা না করে তারা সেই চিহ্নিত ধ্বংসের পথে মহা উল্লাসে চলতে থাকে, যে পথে অতীত জাতিসমূহ চলেছে। এরপর যদি তাদেরকে তাদের অতীত জাতির নির্মম পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়

এবং তাদের পূর্ব-সুরীদের পথ পরিহার করার জন্যে উপদেশ দেয়া হয় তাদের ওপর যেসব মুসীবত নেমে এসেছে, সেসব মুসীবতের ভয় দেখানো হয়, খবর পৌছানোর উদ্দেশ্যে যদি অহংকারী জাতিসমূহের ইতিহাসও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন যারা তাদেরকে শেষ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করছে তাদেরকে তারা উপহাস বিদ্রূপ করতে শুরু করে দেয়। আর এই উপহাস বিদ্রূপেরই একটি অংশ হচ্ছে, সে আযাবের জন্যে ব্যস্ততা দেখানো, যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে! এজন্যে এরশাদ হচ্ছে,

'কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই ওয়াদা খেলাপ করবেন না যা তাদেরকে তিনি দিয়ে রেখেছেন।'

অবশ্যই তা আসবে সেই সুনির্দিষ্ট সময়ে যা তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং বিশেষ কোনো কারণে পূর্ব-পরিকল্পিত সময় পর্যন্ত সে আযাব আসাকে তিনি বিলম্বিত করেছেন। মানুষ জলদি করলে তিনিও যে তাদের সাথেই ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনাকে ভেংগে দিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি আযাব নাযিল করে ফেলবেন এমন কখনও হবে না। আসলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সময়ের হিসাব নিকাশ ও তার ব্যবহার মানুষের হিসাব নিকাশ থেকে ভিন্নতর। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কতো কতো এলাকাবাসীকে যুলুম করা সত্তেও আমি ঢিল দিয়েছি, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি, আর আমার কাছেই তো তাদেরকে ফিরে আসতে হবে।'

সুতরাং, একবার ভেবে দেখুন, আযাব পাওয়ার ব্যাপারে যারা ব্যস্ততা দেখাচ্ছে সেসব মোশরেকদের ব্যাপারটা আসলে কি? কী আশ্চর্য, শাস্তির ধমকি যখন তাদেরকে শোনানো হচ্ছে তখন তারা আযাবের জন্যে ব্যস্ততা দেখিয়ে দাওয়াত দানকারীদের সাথে ঠাট্টা-মস্কারি করছে। আচ্ছা, তাদেরকে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত ঢিল দিয়ে রাখা হয়েছে- এই জন্যেই এতো ব্যস্ততা? ঠিক আছে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও (ওহে রসূল) হে মানবমন্ডলী, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট একজন সতর্ককারী হিসেবে আগমন করেছি.......ওরাই হচ্ছে দোযখবাসী। (আয়াত ৪৯-৫১)

উপরের আয়াতগুলোতে সতর্ককারী হিসাবে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দায়িত্বের কথাটাই শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে,

'আমি তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

একথার কারণেই তো প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং প্রকাশ্যভাবে আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করায় জলদীই আযাব নামিয়ে আনতে বলা হচ্ছে............. এরপর প্রত্যাবর্তন স্থলের বিস্তারিত বিবরণ দান শুরু করা হচ্ছে,

অতপর, যারা ইমান এনেছে এবং ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে যে কাজ ও আচরণ প্রয়োজন সে সব দায়িত্ব পালন করেছে, 'ভালো কাজসমূহ করেছে' তাদের প্রতিদান হচ্ছে, 'তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া মাগফেরাত' ওইসব গুনাহের জন্যে যা তারা পূর্বে করেছে অথবা যেসব ত্রুটি ইতিপূর্বে তাদের দ্বারা হয়ে গেছে সে সবের জন্যে 'আরও রয়েছে (তাদের জন্যে) সম্মানজনক রেযেক (সর্বপ্রকার জীবন সামগ্রী)। অর্থাৎ, এরপর তাদেরকে আর কোনোপ্রকার দোষারোপ করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো দিক দিয়ে ছোটো করা হবে না, আসবে না তাদের জন্যে কোনো অপমানজনক অবস্থা!

আর যারা, আল্লাহর আয়াতসমূহকে মানুষ পর্যন্ত পৌছুতে বাধা দান করবে এবং মানুষকে এই আয়াতগুলো অনুসারে চলতে দেবে না- অথচ আল্লাহর এসব আয়াত তো সত্য কথা ও সত্য

ব্যবস্থা প্রকাশকারী ও মানবমন্ডলীর জন্যে আল্লাহর বিধান বর্ণনাকারী- এমতাবস্থায় এ আয়াতগুলোর সাথে সেসব দুর্ব্যবহারকারী নিজেদেরকে জাহান্নামের অধিকারী বানিয়ে নিলো। আর, হায়, ওই সম্মানজনক রেযেকের পরিবর্তে তারা কি কঠিন ও নিকৃষ্ট পরিণতি নিজেদের জন্যে খরীদ করে নিলো!

শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ওহী ও রসূলদের হেফাযত করা

আল্লাহ তায়ালা মহান সেই সত্ত্বা যিনি অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানকারীদের থেকে তাঁর দ্বীনের দাওয়াতকে হেফাযত করেন, হেফাযত করেন দাওয়াতী কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও বাধা দানকারীদের দৌরাত্ম থেকে, হেফাযত করেন অক্ষমকারীদের অক্ষম করার অপ-প্রচেষ্টা থেকে এবং এভাবেই তিনি দাওয়াতদানকারীদেরকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেন, আরো তিনি হেফাযত করেন তাঁর দ্বীনের দাওয়াতকেও। রসূলদের অন্তরে মানবীয় দুর্বলতার কারণে যে সব কথা জাগে সেসব কথা চালু হওয়া থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাসুম বানিয়েছেন, এজন্যে তারা সবাই শয়তানের শয়তানী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এতদসত্তেও তারা তো ছিলেন মানবীয় সকল দুর্বলতাসহ সবাই এক একজন মানুষ। এজন্যে তাদের মনেও জাগত সেসব আশা-আকাংখা যা অন্যান্য মানুষের মধ্যে জাগে, রেসালাতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তাদেরকে বিচ্যুত করতে চায়, পরকালীন জীবনে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির চিন্তাকে ভুলিয়ে দিতে চায়, তাও তাদের মনে জাগাটা ছিলো স্বাভাবিক। এদিকে শয়তানও বসে থাকে না, সে তাদের আকাঙ্খার মধ্যে এমন কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিতে চায় যেন দাওয়াতী কাজ মূলোৎপাটিত হয়ে যায় এবং তার সঠিক মূল্য থেকে মানুষ দূরে সরে চলে যায়........... এজন্যে দেখা যায়, সকল যামানায় রসূলদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে ব্যার্থ করে দিয়েছেন এবং তাদের দাওয়াতকে বানিয়ে দিয়েছেন ক্ষুরধার। তিনি রসূলদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন দ্বীনের মূলনীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে এভাবে তিনি তাঁর আয়াতগুলোকে মযবুত ও সংরক্ষিত বানিয়েছেন এবং সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়েছেন, দাওয়াতের মূল্যবোধ ও এর উপায়-উপাদানকে রক্ষে করেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখনই তোমার পূর্বে, আমি কোনো রসূল পাঠিয়েছি....... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ঈমানদারদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালনাকারী।' (আয়াত ৫২-৫৪)

ওপরের এ আয়াতগুলোর শানে নযুল সম্পর্কে অনেকগুলো রেওয়ায়েত এসেছে যা বহু মোফাসসেররা তাদের তাফসীরসমূহে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এসব রেওয়ায়াত মুরসাল (সাহাবা পর্যন্ত যার বর্ণনাক্রম শেষ- রসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছায়নি) এগুলোর কোনো একটিকেও সঠিকভাবে রসূলুল্লাহ (স.) পর্যন্ত পৌঁছুতে আমি দেখিনি। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।'

আরো যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ একমাত্র ইবনে আবি হাতেমের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, ইবনে শেহাব বলেছেন (এ ব্যক্তি সাহাবী কিনা তারও কোনো হদীস নেই), সূরায়ে নাজম নাযিল হলে মক্কার মোশরেকরা বলতে থাকে, এ লোকটা যদি আমাদের 'মাবুদ' (মূর্তিসর্বস্ব) দেবতাদের সম্পর্কে কিছু ভালো কথা বলতো তাহলে তার কথা ও তার সংগীদের কথাকে আমরা মেনে নিতাম এবং তাদেরকে কোনো কাজে আমরা বাধা দিতাম না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের পরম পূজনীয় এসব (মূর্তি-সর্বস্ব) মাবুদদেরকে সে এমনভাবে নিন্দা করে এবং তাদেরকে অকল্যাণকারী বলে গালি দেয় যে, তাদের দ্বীন থেকে

ইহুদী নাসারাদের দ্বীন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এমনভাবে নিন্দা করে না। আর এসময়টি ছিলো এমন সংগীন যে এসময় মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে তাদের তৎপরতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের ওপর চরম যুলুম নির্যাতন ও পূর্ব থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছিলো, রসূল (স.)-এর কাছে তাদের এসব গোমরাহী কাজ ছিলো বড়োই হৃদয়বিদারক যেহেতু তাঁর সকল ঐকান্তিকতা নিয়ে তাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত দেখতে চাইতেন কিন্তু যখন সূরায়ে নাজম নাযিল হলো যে, 'তোমরা কি 'লাত' ও 'উযযার' কথা চিন্তা করে দেখেছ আর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি 'মানাত'-এর কথাও কি কখনও ভেবে দেখেছো? তোমাদের জন্যে তোমরা পুত্র সন্তান (ব্যাটা ছেলে) পছন্দ করলে আর তাঁর জন্যে বরাদ্দ করলে মেয়ে-ছেলে (কন্যা সন্তান)?'

এ সময় যখন আল্লাহ তায়ালা তাগূতী শক্তিসমূহের কথা উল্লেখ করছিলেন, তখন শয়তান তার নিজের তরফ থেকে কিছু কথা ওই কথাগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, যার কারণে তিনি বলে উঠলেন, আর ওরা হচ্ছে এমন সুন্দরী যাদের কপালের চুলগুলো কী সুন্দর লম্বা! আর তাদের সুপারিশই আশা করা হয়ে থাকে।

আসলে এটা ছিলো শয়তানের একটি ছন্দময় কথা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক ফাঁদ। ব্যস, একথাটা মক্কার মোশরেকদের অন্তরে বড়ো মজাদার মনে হলো, শুরু হয়ে গেলো এর চর্চা এবং তারা এটাকে দারুণ এক সুখবর হিসাবে প্রচার করতে লেগে গেলো, তারা বলতে থাকলো, হাঁ, কী মজা, এবারে মোহাম্মদ তার বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে এসেছে, ফিরে এসেছে তার জাতির ধর্ম মতে। রসূলুল্লাহ (স.) কথাটা জানতে পেরে সূরায়ে নাজম পড়া শেষ করে সেজদা করলেন এবং সেখানে উপস্থিত মুসলিম ও মোশরেক যারা ছিলো তারা সবাই সেজদা করলো। একমাত্র এক বর্ষিয়ান ব্যক্তি ওলীদ ইবনে মুগীরা সাজদা করলো না, সে এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে নিয়ে তার ওপর সেজদা করলো। এমতাবস্থায় উপস্থিত মুসলমান অমুসলমান সকল জনতা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে সাজদা করলো সবার এই একসাথে সেজদা করার কারণে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ছিলো। মুসলমানরা বিস্মিত হলো একথা মনে করে যে তাদের সাথে মোশরেকরা কেমন করে সেজদা করলো। অথচ তাদের না আছে ঈমান, আর না আছে কোনো একীন, আসলে এসময় মোমেনরা ওই কথাটি শোনেনি যা শয়তান কাফেরদের কানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এজন্যে তাদের মন নিশ্চিন্ত ছিলো, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ যখন কথা বলতে শুরু করেছিলেন তখন শয়তান একটি কথা উপস্থিত মোশরেকদের মনে জাগিয়ে দিয়েছিলো যে রসূলুল্লাহ (স.) সূরার মধ্যে, (শয়তান কর্তৃক সংজোযিত) সে কথাটি পড়েছেন এজন্যে তাদের মাবুদদের সম্মানার্থে তারা সেজদা করেছে। অতপর শয়তানও একাজে যোগ দিয়ে কথাটা খুব করে প্রচার করে দিলো, যার কারণে অচিরেই হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) অবস্থিত হিজরতকারী সকল মুসলমান এবং স্থানীয় অমুসলমানদের কাছে খুব জলদিই কথাটা এভাবে পৌঁছে গেলো যে, রসূলুল্লাহ (স.) সূরার মধ্যে সে কথাটা পড়েছেন এবং সবাই এক সাথে সেজদা করেছেন। এসব মুসলমানদের মধ্যে ওসমান ইবনে মাযউন ও তাঁর সংগীরা ছিলেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকলো যে মক্কাবাসীরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে তারা নামায পড়েছে, তারা আরো জানতে পারলো যে ওলীদ ইবনে মুগীরাই শুধু তার হাতের মধ্যে তুলে নেয়া মাটির ওপর সেজদা করেছে তারা আরো শুনলো যে মক্কার মোমেনরা সবাই এখন নিরাপদ হয়ে গেছে। সুতরাং শীঘ্রই তারা মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরার অংশ হিসাবে শয়তান কর্তৃক কথাগুলোকে নাকচ করে ঘোষণা করলেন এবং তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা মুক্ত করে হেফাযত করলেন ও মযবুত বানালেন, আর তারপর নাযিল করলেন,

'আমি, তোমার পূর্বে যখনই কোনো রসূল বা নবী পাঠিয়েছি, তারা কথা বলার এরাদা করতেই, কোনো কোনো সময়ে শয়তান তার নিজের কথা, সে আয়াতগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে............ আর অবশ্যই যালেমরা এতো বেশী বিরোধিতা করেছে যে তারা হেদায়াত থেকে বহু বহু দূরে সরে গেছে।' (আয়াত ৫২-৫৩)

তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফয়সালার কথা জানিয়ে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথাকে শয়তানের সে ছন্দময় কথা থেকে মুক্ত করলেন তখন মোশরেকরা আবার তাদের ভুল পথে এবং মুসলমানদের বিরোধিতায় ফিরে গেলো, বরং পূর্ব থেকে আরো বেশী কঠিন হয়ে গেলো তাদের বিরোধী ভূমিকা।

ইবনে কাসীর বলেন, বাগবী তার তাফসীরে, ইবনে আব্বাসের কিছু রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি সেখানে এই একই ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়াত এনেছেন মোহাম্মদ ইবনে কা'ব আলকুরাযী এবং আরো কয়েকজন থেকে, তারপর একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর যামানতপ্রাপ্ত সুরক্ষিত একটি সূরার মধ্যে শয়তানের কথার অনুপ্রবেশ কি করে সম্ভব হলো? তারপর এ বিষয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও কিছু কথা লিখেছেন। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে শয়তান নাকি মোশরেকদের কর্ণ কুহরে কিছু কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো যার কারণে তারা ভাবতে শুরু করেছিলো যে, কথাগুলো রসূলুল্লাহ (স.)-নিজেই বলেছেন। আসলে ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা ছিলো শয়তানের এক কীর্তি, আল্লাহর রসূলের কোনো ভূমিকা এর মধ্যে নেই। ঘটনাটি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

বোখারী বলেন, 'ইবনে আব্বাস 'ফী উমনিয়্যাতিহী' (তাঁর আকাংখার মধ্যে) শব্দগুলোর অর্থ করতে গিয়ে বলেন, 'রসূলুল্লাহ যখন একথাটি বলেছেন, তখন শয়তান তাঁর কথার সাথে যোগ দিয়ে মোশরেকদের কানে অতিরিক্ত কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন শয়তানের সে কথাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন, 'তারপর তিনি তাঁর আয়াতগুলোকে মযবুত করে দিয়েছেন।'

মোজাহেদ 'ইযা তামান্না' শব্দ দুটির অর্থ করতে গিয়ে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 'যখন তিনি বললেন।' আর 'উমনিয়্যাতিহী' অর্থ তার কেরআত-এর (পাঠের) মধ্যে বাগবী বলেন, অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে 'তামান্না' শব্দটির অর্থ তিনি তেলাওয়াত করেছেন বা আল্লাহর কেতাব পড়েছেন, 'শয়তান তাঁর 'উমনিয়্যা'র মধ্যে, অর্থাৎ তেলাওয়াতের মধ্যে কিছু কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। 'তামান্না' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে জারীর বলেন, 'তালা' অর্থ তিনি তেলাওয়াত করেছেন এই কথাটাই উক্ত কথার ব্যাখ্যা হিসাবে বেশী উপযোগী।

'গারানীক' এর হাদীস বলে যে হাদীসটি পরিচিত সে সম্পর্কে এইই হচ্ছে সার কথা। এ ছাড়া অন্য যতো কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভিত্তিহীন। হাদীসবেত্তারা সম্মিলিতভাবে বলেছেন, সেহাহ সেত্তা প্রণেতাদের কেউই এই হাদীসটি রেওয়ায়াত করেননি, আর যারা এটা রেওয়ায়াত করেছেন, তারাও রসূলুল্লাহ পর্যন্ত বর্ণনা ধারা পৌঁচেছে বলে দাবী করেননি, অর্থাৎ তারা এটাকে মোত্তাসেল হাদীস বলেননি (যা বিশ্বাসযোগ্যতার এক বিশেষ মাপকাঠি বলে সবাই জানে)। আবু বকর আল বাযযার বলেন, একথাটিকে হাদীস বলা হলেও নবী (স.) থেকে একথাটা এসেছে বলে আমরা জানিনা। যাকে মোত্তাসেল বলা হয় এবং হাদীস বলে যার উল্লেখ জায়েয মনে করা যায়– এটা মোটেই সে রকম কোনো কথা নয়। আর একথার মধ্যে যে সুরটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাতে

রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার ওপর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত- এটা আমাদের যে মূল আকীদা যে- 'রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার মধ্যে শয়তান কর্তৃক কোনো সংমিশ্রন তাঁর যামানায় সম্ভব ছিলো না'-এর সাথে সংঘর্ষশীল।

এ কাল্পনিক হাদীসটিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যের কিছু উর্বর মস্তিষ্ক ব্যক্তি এবং এ দ্বীনকে দোষারোপকারী কিছু ব্যক্তি অনেক কিছু কল্পনার জাল বুনেছে এবং মনে করেছে যে এভাবে ইসলামের এই শাশ্বত জীবন ব্যবস্থাকে সংশয়পূর্ণ করে তোলা যাবে- কিন্তু তাদের এ দিবা স্বপ্ন কোনো দিন সফল হয়নি আর কোনো দিন হবেও না। ব্যাধিগ্রস্ত কিছু অন্তর ছাড়া এসব বাজে কথায় কেউ কোনো দিন কান দেয়নি, আর এটাকে কোনো দিন আলোচনার কোনো বিষয়বস্তু হিসাবেও মনে করা হয়নি।

আল কোরআন থেকে যা জানা যায় তাতে একথা বেশ বুঝা যায় যে রসূল (স.)-এর যিন্দেগীতে এধরনের ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি এবং এ ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের কোনো শানে নযুলও নয়। আল কোরআন রেসালাত ও রসূলদের ব্যাপারে সাধারণভাবে এই মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে,

'তোমার পূর্বে যতো নবী রসূলকেই আমি পাঠিয়েছি, তারা যখনই কোনো কথা বলতে চেয়েছে তাদের ইচ্ছার মধ্যে শয়তান কিছু কথা এনে দিয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেগুলো নাকচ করে দিয়েছেন এবং তারপর তাঁর আয়াতগুলোকে তিনি মযবুত বানিয়েছেন।'

সুতরাং সাধারণভাবে একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে মানুষ হিসাবে সকল রসূলদের মধ্যেই শয়তান কিছু কথা ঢুকিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। ওয়াসওয়াসা দেয়ার এই সম্ভাবনা থাকা তাঁর বে-গুনাহ (মাসূম বা নিরপরাধ) হওয়ার পরিপন্থী মোটেই নয়, যেহেতু রসূলদের মাসূম রাখার স্থির সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই হয়ে রয়েছে।

এই কথাটাই আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আল্লাহর সাহায্যেই রসূলরা মাসূম ছিলেন আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। আমরা আমাদের মানবীয় বুঝ মতোই তাঁর কালামের তাফসীর করছি মাত্র.......... ।

রসূলদের যখন মানুষের কাছে রেসালাতের বার্তা বহন করে নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু হচ্ছে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করা এবং আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা পেয়েছেন তাদের নিজেদের জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে সাধারণ মানুষ এ কল্যাণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখতে পায় এবং হৃদয় মন দিয়ে তারা তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক দ্বীন-এর দাওয়াতে বিস্তর বাধা বিঘ্ন আসবে, এপথ কাঁটায় ভরা। রসূলরাও মানুষ হিসাবে বিশেষ এক সীমার মধ্যে থাকতে বাধ্য, তাদের বয়স ও সাধ্যের নির্দিষ্ট সীমা আছে। তারা এটা জানেন ও অনুভব করেন, এজন্যে তারা কামনা করেন যে তারা সব থেকে দ্রুত উপায়ে মানুষকে তাদের দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট করবেন একইভাবে তারা এটাও চান যে যদি মানুষ তাদেরকে কোনো কথা দেয়, তা যেন রক্ষা করে। তারা সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে চান যে মানুষ জাহেলী যুগের মধ্যে লালিত সকল বদভ্যাসকে পরিহার করুক, বাপ-দাদার আমল থেকে প্রাপ্ত সকল রীতি নীতিগুলোকে ত্যাগ করুক, ধীরে ধীরে মিথ্যা ও অসার জিনিসের অনুসরণ করা পরিত্যাগ করুক এবং এভাবে মানুষ যেন হেদায়াতের দিকে পরিপূর্ণভাবে এগিয়ে আসে। তারপর, এভাবে যখন ইসলামের ছায়াতলে তারা মনে প্রাণে প্রবেশ করবে তখনই বাপ-দাদার আমল থেকে প্রাপ্ত বাতিল রীতিনীতিকে তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে,

যেগুলোকে তারা এতো দিন থেকে বড়ো মহব্বতের সাথে লালন করে আসছিলো! অবশ্য, এমনও হতে পারে যে, পূর্ব জীবনের কোনো কিছুর জন্যে তাদের মনের মধ্যে কোনো আকর্ষণ যদি থেকেও থাকে তাহলে সেটা ছাড়তে হয়তো একটু বিলম্ব হতে পারে। আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্য সকল বিষয়বস্তুর আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে, কিন্তু তার জন্যে সঠিক পরিচর্যা ও পরিচালনা প্রয়োজন যা অন্য সব কিছু থেকে তাদের মনকে সরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

সকল নবীরা মানবীয় অন্যান্য চাহিদামতো বা তার থেকেও বেশী– সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চান যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর যে দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তার আশু প্রসার ঘটুক এবং অচিরেই তা বিজয়ী হোক। এজন্যেই তারা এ মিশন সফল করতে সর্বাধিক তৎপর ছিলেন যেহেতু আল্লাহ তায়ালা চান, তাঁর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কাজটা পূর্ণাংগ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হোক, যেহেতু আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত এজন্যে অবশ্যই এ ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ। আর আল্লাহ তায়ালা চান, নবীদের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত এ জীবন ব্যবস্থাকে মানুষ পড়াশুনার মাধ্যমে জানুক, নবীদের জীবনকে সামনে রেখে এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করুক এবং পরিতৃপ্ত মন নিয়ে এ মহান ব্যবস্থা গ্রহণ করুক অথবা পছন্দ না হলে অস্বীকার করুক। মানবীয় সকল দুর্বলতা ও সন্দেহ সংশয়কে ঝেড়ে মুছে ফেলে পূর্ণাংগভাবে এ দাওয়াত কে গ্রহণ করেছে তা সন্দেহাতীতভাবে জানেন একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তিনি চান যে মানুষ ভারসাম্যপূর্ণ ঐসব মূলনীতি মেনে চলুক, যদিও এ পথের প্রথম দিকে কিছু লোক ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু দাওয়াতী কাজের মূলনীতির ওপর যারা সুদৃঢ় অবস্থান করবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে যারা সুসামঞ্জস্যভাবে সকল কাজ আনজাম দেয়ার চেষ্টা করবে তারাই জীবনের সফলতার দেখা পাবে তারাই দাওয়াতী কাজের কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে পারবে, তারাই চলতে পারবে সেই সরল-সোজা পথে যেখানে নেই কোনো বিভ্রান্তি, নেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়ার মতো কোনো শক্তি।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে যেসব আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, যেসব ঝোঁক প্রবণতা মাঝে মাঝে তাদের কথা বা কাজে প্রকাশ পায়, এসব কিছুর মধ্যে শয়তান সংগোপনে প্রবেশ করে, নানা প্রকার বিভ্রান্তি আনার চেষ্টা করে, যাতে দাওয়াতী কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তারা এর মূলনীতি থেকে দূরে সরে যায়, তাদের মনের মধ্যে নানাপ্রকার ওয়াসওয়াসা আসায় মন দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু এতদসত্তেও বিশ্বে দাওয়াতী কাজ চলছে, চলবে এ কাজ কোনোদিন থেমে যাবে না। আল্লাহ তায়ালা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকর নির্দেশগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মানুষ তাঁর নির্দেশাবলী যতোটুকু বুঝেছে এবং দাওয়াতী কাজের কৌশল সম্পর্কে যে জ্ঞান-গবেষণা চালিয়েছে, তাতে কখনও কখনও ক্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, যেমন যদি কখনও রসূল (স.)-এর কোনো কথাকে কেন্দ্র করে কোনো বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, সেগুলোরও সমাধান আল কোরআন দিয়েছে।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের জারিজুরিকে বাতিল করে দেন এবং তাঁর আয়াতগুলোকে মযবুত বানান, যাতে তা পালন করার ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে।

'আল্লাহ তায়ালা জাননেওয়ালা, বিজ্ঞানময়' ....

এখন যাদের অন্তরে রয়েছে কপটতা অথবা দ্বীন থেকে সরে যাওয়ার মনোভাব তাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যদিকে রয়েছে কাফের ও কঠিন হৃদয় বিরোধী শ্রেণী, তারা ঝগড়া করার জন্যে সব

কিছুর মধ্য থেকে কিছু না কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি বের করে, তাদের জেদ ও বিরোধী মনোভাব ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্দি থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছে, বরং বলা যায়, তারা মাছির মতো সব কিছুর মধ্যে পচা জিনিসই খোঁজ করে। তাই বলা হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই যালেমরা দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো বিরোধিতায় মগ্ন।' আর অনেক মানুষকেই সত্য-সঠিক জ্ঞান ও সত্যকে চেনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর কোনো কথা এবং কোনো বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা জানতে পারার সাথে সাথে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে সঠিক পথের দিকে পরিচালনাকারী।'

সার্বজনীন ইসলামী দাওয়াত

নবী (স.)-এর যিন্দেগীতে এবং ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস থেকে আমরা যেসব তথ্য জানতে পাই তাতে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এই কথাটার দিকেই ইবনে জারীর ইংগিত করেছেন।

এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রা.)-এর একটি ঘটনা আমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়ে গেছে। অন্ধ অভাবী এই পাগলপারা সাহাবী একদিন রসূল (স.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে একটু পড়িয়ে দিন এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব শিক্ষা দিয়েছেন তার থেকে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন– কথাটা তিনি বারবার বলতে থাকলেন, অপরদিকে রসূলাল্লাহ (স.) ওলীদ ইবনে মুগীরার সাথে কথায় ব্যস্ত থাকায় ইবনে মাকতুমের দিকে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না, তিনি চাইছিলেন যদি ওই লোকটিকে তিনি ইসলামের দিকে এগিয়ে নিতে পারতেন!– তার সাথে আরো কয়েকজন কোরায়শ নেতৃবৃন্দ ছিলো, কিন্তু অন্ধ হওয়ার কারণে ইবনে উম্মে মাকতুম তাদেরকে দেখতে পারছিলে না আর তিনি জানতেনও না যে রসূলুল্লাহ (স.) এভাবে ব্যস্ত আছেন; ফলে ইবনে উম্মে মাকতুমের এক কথা বারবার বলাতে তাঁর একটু খারাপ লাগলো, এজন্যে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অতপর এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কঠিনভাবে ধমক দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন,

'সে বেজার হলো ও মুখ ফিরিয়ে নিলো তার কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছে বলে .... না, সে যা চাইছে তা কিছুতেই হবার নয়। অবশ্যই এটা একটা উপদেশমালা, অতপর যে এর থেকে শিক্ষা নিতে চায়, নেবে ....। (আবাসা ১-১২)

এভাবে আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের মূল্য এবং দাওয়াত দানের পাত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ ও নিরপেক্ষ এবং সঠিক মূল্যের কথা ঘোষণা করলেন, দাওয়াতী প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্র সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.)-এর খেয়ালকে তিনি শুধরে দিলেন, কারণ অবশ্যই একান্ত একাগ্রতা নিয়ে তিনি কোরায়শ নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলছেন– সর্বান্তকরণে তিনি চাইছিলেন। 'ওরা যদি ইসলাম গ্রহণ করতো!' ওরা তো বহু লোকের নেতা, ওরা মুসলমান হলে ওদের দেখা-দেখি হয়তো আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করবে; এজন্যে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, যে সূক্ষ্ম ভিত্তির ওপর ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত তা গ্রহণ করার জন্যে আগ্রহী হৃদয়, পরম আগ্রহ ও গভীর হৃদয়াবেগ নিয়ে যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে আসবে তাদের সামনে সেসব হঠকারী, অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক নেতৃবৃন্দের কোনো মূল্য নেই। এই বুঝের মধ্যে যে শূন্যতা বিরাজ করছিলো তা পূরণ করার জন্যে শয়তানের অপচেষ্টাকে আল্লাহ তায়ালা বাতিল করে দিলেন, তিনি তাঁর নিদর্শনগুলোকে মযবুত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে সঠিক চেতনা দিয়ে তাঁর প্রিয় নবীসহ সকল মোমেনদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে দিলেন।

এরপর থেকে রসূলুল্লাহ (স.) বরাবর ইবনে উম্মে মাকতূমকে বিশেষভাবে সম্মান দিতেন, আর যখনই তাঁকে দেখতেন বলতেন, স্বাগত (হে বন্ধু) তুমিই তো সেই ব্যক্তি যার জন্যে আমার রব আমাকে তিরস্কার করেছেন, আর তাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমার কি কিছু প্রয়োজন আছে? রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে কতোবেশী মর্যাদা দিতেন তা এতে বুঝা যায় যে, দু'দুবার তাঁকে মদীনাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

এভাবে, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে জানা যায়, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওককাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে আমরা ছ'জন ব্যক্তি একদিন এক জায়গায় উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় কয়েকজন মোশরেক ব্যক্তি নবী (স.) কে বললো, এ লোকদেরকে সরিয়ে দিন, এরা আমাদের উপস্থিতিতে এখানে থাকার যোগ্য নয়। রেওয়ায়াতকারী ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলছেন, ওখানে উপস্থিত ছিলাম আমি, ইবনে মাসউদ, হুযায়েল গোত্রের একজন, বেলাল এবং আরো দু'জন যাদের নাম আমি ভুলে গেছি। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) মনে মনে কিছু বললেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে যারা সকাল সন্ধা সন্তুষ্টি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাদের রবকে ডাকছে।'

এভাবে ইসলামের দিকে দাওয়াতের কাজকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছেন, এর সূক্ষ্ম মূল্য সম্পর্কে, আর এ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের কাজে নাক গলানোর চেষ্টায় শয়তানের হস্তক্ষেপকে তিনিই প্রতিহত করেছেন। এ মর্যাদায় যারা অভিষিক্ত হয়েছেন তাদের গন্ডীর মধ্যে নেতা-অথবা বিত্তশালী হওয়ার দোহাই দিয়ে কারো অনুপ্রবেশ চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, রদ করে দিয়েছেন তাদের একথাকে যে, সে গরীব দুঃখী ও মর্যাদাহীন লোকদের যদি তাদের উপস্থিতির সময় সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দৃষ্টিতে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহের মূল্যই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এজন্যে তাঁর দৃষ্টিতে ওইসব অহংকারী নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের থেকে সে গরীব আগ্রহী ব্যক্তিদের মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ ওদের থেকে আগ্রহী লোকদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের মহব্বত বহু বহুগুণে অধিক। সে নেতৃবৃন্দের তুলনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার এই সাধারণ লোকদের দ্বারাই বেশী আশা করা যায়, যদিও সাধারণ মানুষ এতো হিসাব করে পারে না, যেমন রসূলুল্লাহও (সঠিকভাবে না বুঝতে পেরে) সে নেতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ আশা করেছিলেন বেশী এবং তাদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, শক্তির উৎস কোথায়। আর তা হচ্ছে মহব্বতপূর্ণ ইচ্ছা ও দৃঢ়তা যা সঠিকভাবে মানুষকে পরিচালনা করে— এটা বিশেষ বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়।

সম্ভবত আরো দুটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে, যেমন রসূলুল্লাহ (স.)-এর ফুপাতো বোন যায়নাব বিনতে জাহশ-এর ঘটনায় জানা যায়। তাঁকে রসূলুল্লাহ (স.) যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর সাথে বিয়ে দেন। এরা সংসার জীবন শুরু করেন নবুওত আসার পূর্বে। এসময় যায়েদকে যায়েদ ইবনে মোহাম্মাদ বলা হতো; কিন্তু এভাবে ধর্মবাপ বলার প্রথাকে, আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিলেন— এজন্যে আল্লাহরই পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সম্পর্কটা ভাংগার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো যেন এই ধর্মবাপ হওয়ার কারণে যে কৃত্রিম হালাল-হারাম মানার চিন্তা করা হতো সে প্রথাটা বন্ধ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিলেন,

'ওদেরকে তাদের নিজেদের বাপের নামে ডাকো, এটাই আল্লাহর কাছে বেশী সুবিচার ও যুক্তিপূর্ণ।' আরো বলেছেন, 'আর তিনি তোমাদের পালক ছেলেদেরকে তোমাদের সন্তান বানাননি।'

যায়েদ (রা.), রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে অন্য সবার থেকে বেশী প্রিয় ছিলেন, এজন্যেই তিনি নিজের ফুপাতো বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের এ বিবাহিত জীবন টিকলো না। আরব দেশে পালক ছেলের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করাকে চরম ঘৃণার বিষয় মনে করা হতো, আল্লাহ তায়ালা এ কৃত্রিম ও ভুল প্রথা ভেংগে দিতে চাইলেন, যেমন বাপ ছাড়া অন্য কারো নামে কোনো ব্যক্তিকে ডাকার প্রথাকে তিনি ইতিপূর্বে ভেংগে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁর রসূল নির্দেশ দিলেন যে, যায়েদ তদীয় স্ত্রী যায়নাবকে তালাক দিয়ে দিলে তিনি নিজেই যেন যয়নবকে বিয়ে করেন। যাতে পালক ছেলের তালাক দেয়া স্ত্রী বিয়ে করাকে ঘৃণিত মনে করার যুক্তিহীন প্রথা চিরতরে তিরোহিত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এ নির্দেশের কথাটি মনের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন এবং যতোবারই যায়েদ, তার স্ত্রী সম্পর্কে কোনো নালিশ নিয়ে আসতেন ততোবারই রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, 'স্ত্রীকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাও' তার মনে হতো যায়েদ তালাক দিয়ে দিলে যায়নাবের সম্ভ্রমের জন্যে এটা বড়োই কঠিন হবে, আর অবশেষে 'যায়েদ যে তালাক দিয়ে দেবে' আল্লাহর এ সিদ্ধান্তকেও তিনি প্রকাশ করছিলেন না, অবশেষে যায়েদ তালাক দিয়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে তাঁর ছাফ ছাফ ফয়সালা আল কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, যাতে করে রসূল (স.)-এর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছিলেন তা সফল হয় এবং জাহেলী যামানার কুপ্রথাটারও ইতি ঘোষিত হয়ে যায়– পরিস্কারভাবে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো, সেই সময়ের কথা যখন তুমি বলছিলে .... এবং আল্লাহ নির্দেশ কার্যকরী হবেই হবে। (আহযাব ৩৭)

আর আয়শা (রা.) সত্য বলেছেন, যখন তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে কথাটা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন রসূলুল্লাহ (স.) তা প্রকাশ না করে থাকলে অবশ্যই তা গোপন করেছেন (এবং অবশ্যই কোনো কারণবশত তা করেছেন) যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর তুমি মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখছিলে তাই যা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করতে চান, আর তুমি মানুষকে ভয় করছো, কিন্তু আল্লাহকেই বেশী ভয় করা দরকার।'

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিধান ও তাঁর হুকুম আহকামকে মযবুত বানিয়েছেন। আর, রসূলুল্লাহ (স.) এর অন্তরে যে খটকাটা ছিলো তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, অর্থাৎ এ বিয়ে করলে সমাজের লোকেরা নানাভাবে তাঁকে দোষারোপ করতে থাকবে, যে, 'দেখ মোহাম্মাদ এখন পালক ছেলের স্ত্রীকে পর্যন্ত বিয়ে করা শুরু করে দিয়েছে।' আল্লাহ তায়ালা নিজে বিষয়টা পরিষ্কার করে দেয়াতে শয়তানের জন্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করার আর কোনো উপায় থাকলো না। আর যে সব ব্যাধিগ্রস্ত মোনাফেক রসূল (স.) কে বদনাম করার জন্যে ওঁৎ পেতে ছিলো তাদের জন্যেও ফেৎনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করারও আর কোনো সুযোগ রইলো না।

আন্দোলন কৌশলের নামে সুন্নাত পরিহার করার অবকাশ নেই

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে এভাবেই আমরা সংশয়মুক্ত ও তৃপ্ত হয়েছি।

এভাবে রসূলদের যামানা শেষ হওয়ার পর পরবর্তী মোবাল্লেগদের জন্যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে, সর্বকালে দাওয়াত গ্রহণ করার জন্যে সেসব মানুষকেই উপযোগী মনে করতে হবে এবং তাদের কাছেই আগ্রহভরে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে যারা আগ্রহভরে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীনের জন্যে অন্তরের মহব্বত নিয়ে অগ্রসর হবে। যেহেতু যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের মূল্যই তাঁর কাছে বেশী, এতে তাদের শক্তি সামর্থ

অর্থ সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা যতো তুচ্ছই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না– তাদের দ্বারাই আল্লাহ তায়ালাই তাঁর দ্বীনের খেদমত নেবেন। অপরদিকে সামাজিক মর্যাদায় যারা অধিষ্ঠিত এবং অর্থ সম্পদ ও বিভিন্নমুখী মর্যাদাবোধকে সামনে রেখে যে সব ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দ নিজেরাই নিজেদের মূল্যায়ন করে এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহর নযরে তারা মূল্যহীন।

অতএব, ইসলামী দাওয়াতকে যারা অগ্রসর করতে চায়, তারা যেন সে ভুলটি আর না করে যে ভুলটি রসূলুল্লাহ (স.)-এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন তাঁর রসূলের এ ভুল সংঘটিত হোক, তাহলে সে ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে স্থায়ী একটা শিক্ষা রেখে দেয়া যাবে।

এভাবে চিরদিনের জন্যে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার পদ্ধতি নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে, কিসের মূল্য দিতে হবে, কাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। ওপরের ঘটনা থেকে এ শিক্ষাটিও পাওয়া যায়, মানুষ দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধির জন্যে অনেক সময় নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেয়, সে অবস্থায় অনেক কাজ নেক নিয়তে করতে গেলেও ভুল হয়ে যায়, যেহেতু শয়তান সদা-সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকে যেন মানুষের ভালো ইচ্ছার সাথে সে কিছু নিজের চিন্তা চেতনার গুরুত্ব দিতে গিয়ে এধরনের ভুল করে, যেন তাকে আত্মম্ভরিতায় পেয়ে বসে এবং সে নিজের চিন্তার প্রাধান্য দিয়ে বসে, আর সেই সুযোগে শয়তান তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। এজন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও অতীতের ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে যে দিক-নির্দেশনা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে সামনে রেখে পরবর্তী দায়িত্বশীলেরা নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নেয়। আল্লাহর হাতেই সকল কাজের পরিণতি নিবদ্ধ, গায়েবের খবর একমাত্র তাঁরই হাতে, কাজেই তাঁর দেয়া পদ্ধতিতে কাজ করেই আমাদের সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকতে হবে।

এভাবেই মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদেরকে শয়তানের সূক্ষ্ম চালবাজি থেকে সাবধান করছে। সে আমাদের মনে নানা প্রকার আশা আকাংখা জাগিয়ে দেয় এবং সেগুলো কোনো ভালো কাজের জন্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে আমাদেরকে বুঝায়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী রসূলদেরকে তো নিজেই শয়তানের এসব সূক্ষ্ম চাল থেকে রক্ষা করেছেন, শয়তান হাজারো চেষ্টা করা সত্তেও তাদের দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ করাতে পারেনি। কিন্তু আমরা তো মাসুম (নিরপরাধ) নই, এজন্যে আমাদেরকে আরো বেশী সাবধান হতে হবে, আর তার উপায় হচ্ছে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি আত্মসমপর্ণ করা এবং সকল কাজে রসূল (স.)-এর তরফ থেকে কি দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে তা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে সেগুলো সযত্নে অনুসরণ করা। দাওয়াতী কাজ করার ব্যাপারে শয়তান যেন আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালনা করতে না পারে তার জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলো ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনেক সময় এমন হয় যে নিজের মনে অনেক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি জাগে যেগুলো আমাদেরকে বুঝানো হয় যে পরিস্থিতির আলোকে এগুলোই মাসলিহাত (অপরিহার্য) ও হেকমত (কৌশল)। পরামর্শ, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও কোরআন হাদীসের কথাকে প্রাধান্য দান না করার কারণে নিজের বুদ্ধি অনেক সময় বড়ো হয়ে দেখা দেয় এবং তখনই শয়তান সুযোগ করে নেয়। এজন্যে শয়তান যুক্তি দেখায়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত নীতিমালার মধ্যে নিহিত হেরফের করাতে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। এটাই হচ্ছে একমাত্র বড়ো শয়তানী হাতিয়ার, যার দ্বারা সে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও রসূল (স.)-এর প্রদর্শিত পন্থাকে বড়ো করে না দেখে নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দান, আসলে এটাই সঠিক পথ পরিহার করার নামান্তর। এই পরিহার অল্প হোক আর বেশী এটাই আসল ফেৎনা– অবস্থার চাহিদা বা মাসলেহাতের নামে

এগুলো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। অবস্থা কি আছে এগুলো খেয়াল না করলে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না, পাকড়াও করা হবে আমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কথা পুরোপুরি মানছি কিনা সে ব্যাপারে।

এ প্রসংগের সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে দাওয়াতী কাজের জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলো আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা বাদ দিয়ে কৌশলের নামে নিজেদের বুদ্ধির কোনো প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এ স্থায়ী নীতি থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সদা-সর্বদা কাফেররা কোরআনের মধ্যে তাদের তরফ থেকে সন্দেহ জাগাতে থাকবে................ তারাই হচ্ছে সেসব মানুষ যাদের জন্যে অপেক্ষা করছে অপমানজনক আযাব।'

এটাই হচ্ছে সমগ্র কোরআনের সাথে কাফেরদের ব্যবহার। বর্তমান আয়াতগুলোও আলোচ্য প্রসংগ, তাদের অবস্থান ও দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে জানাচ্ছে। নবী রসূলদের অন্তরে জাগ্রত নানা আশা আকাংখার কথা তুলে ধরে মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করতে চায়। এজন্যে তারা নানা প্রকার উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, বিশেষ করে ওপরে বর্ণিত ঘটনাদ্বয়কে তারা মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এভাবে তারা 'কোরআনের মধ্যে সন্দেহ পূর্ণ কথা রয়েছে' বলে প্রচার করতে থাকে, উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন খুশী মনে ও তৃপ্তি সহকারে আল কোরআনের কথাগুলো গ্রহণ করতে এবং এভাবে আল কোরআনের তাৎপর্যও মাধুর্য পাওয়া থেকে যেন তারা বঞ্চিত হয়। তাদের এই অপচেষ্টা চলতে থাকবে। অবশেষে, হঠাৎ করে তাদের ওপর কেয়ামত এসে যাবে অথবা এমন সময় এসে যাবে যা তাদের সকল তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেবে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আর কি থাকবে তাদের জন্যে (সে চিন্তা এখনই করা দরকার)। ব্যর্থতার দিন আসবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সে দিনের পর আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার থাকবে না। সেদিনটিই শেষ দিন।

এই দিনটিতে রাজ্য ও ক্ষমতা হবে একমাত্র আল্লাহর, অন্য কারো হাতে থাকবে না কোনো ক্ষমতা ও এখতিয়ার, এমনকি দুনিয়ায় যাদেরকে বাদশাহ মনে করা হয়, তারাও হারিয়ে ফেলবে তাদের সকল ক্ষমতা। সে দিন একমাত্র আল্লাহর ফয়সালাই কার্যকর হবে। সেদিন তিনি সকল দলের জন্যে, তাদের জন্যে নির্ধারিত ফয়সালা শোনাবেন এবং সেই অনুযায়ী তারা তাদের পাওনা পাবে।

'অতপর ঈমান যারা এনেছে এবং ভালো কাজসমূহ যারা করেছে তারাই নেয়ামত ভরা জান্নাতে থাকবে...... আর কুফরী যারা করেছে এবং আমার আয়াতগুলোকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক আযাব।'.........

এটাই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের সাথে ষড়যন্ত্রের বদলা, আর তাঁর আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিদানও নির্ধারিত রয়েছে, নির্ধারিত রয়েছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা থেকে অহংকারপূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার শাস্তি।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ
رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ
بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ
الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫
فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

রুকু ৮

৫৮. যারা আল্লাহ তায়ালার পথে (তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে) নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে গেছে, পরে (আল্লাহর পথে) নিহত হয়েছে, কিংবা (এমনিই) মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) তাদের উত্তম রেযেক দান করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বোত্তম রেযেকদাতা। ৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা (খুবই) পছন্দ করবে; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময় ও একান্ত সহনশীল। ৬০. এই (হচ্ছে তাদের প্রকৃত অবস্থা,) অপরদিকে কোনো ব্যক্তি (দুশমনকে) যদি ততোটুকুই কষ্ট দেয়, যতোটুকু কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছিলো, (তার) সাথে যদি তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ (মযলুম) ব্যক্তির সাহায্য করবেন; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (মানুষের) পাপ মোচন করেন এবং (তাদের) ক্ষমা করে দেন। ৬১. এ হচ্ছে (আল্লাহর নিয়ম,) আল্লাহ তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে আবার দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন সব কিছুই দেখেন। ৬২. এটা (হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম,) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (একমাত্র) সত্য, (প্রয়োজন পূরণের জন্যে) যাদের এরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকে, তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সমুচ্চ, তিনিই হচ্ছেন মহান। ৬৩. তুমি কি তাকিয়ে দেখোনি, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর (এ পানি পেয়ে কিভাবে) যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপরায়ণ, তিনি (তাদের যাবতীয়) সূক্ষ্ম বিষয়েরও খবর রাখেন, ৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে (যেখানে) যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্যে; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (সব ধরনের) অভাবমুক্ত ও (যাবতীয়) প্রশংসার একমাত্র মালিক।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ
بِاَمْرِهٖ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۖ اِنَّ اللّٰهَ
بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ
يُحْيِيْكُمْ ۖ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا
يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۖ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٦٧﴾
وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ

রুকু ৯

৬৫. তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ তায়ালা (কিভাবে) এ যমীনে যা কিছু আছে তাকে এবং সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানকে নিজের আদেশক্রমে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন; তিনিই আসমানকে ধরে রেখেছেন যাতে করে তা যমীনের ওপর পড়ে না যায়, কিন্তু তাঁর আদেশ হলে (সেটা ভিন্ন কথা); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সাথে স্নেহপ্রবণ ও দয়াবান। ৬৬. তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, অতপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন, মানুষ (আসলেই) অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ (তারা সব ভুলে যায়)। ৬৭. প্রত্যেক জাতির জন্যেই আমি (এবাদাতের কিছু আচার) অনুষ্ঠান ঠিক করে দিয়েছি যা তারা পালন করে, অতএব এ ব্যাপারে তারা যেন কখনো তোমার সাথে কোনো তর্ক না করে, (মানুষদের) তুমি তোমার মালিকের দিকে ডাকতে থাকো, অবশ্যই তুমি সঠিক পথের ওপর রয়েছো। ৬৮. (তারপরও) তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতন্ডা করে তাহলে তুমি বলে দাও, তোমরা (আমার সাথে) যা কিছু করছো আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন। ৬৯. তোমরা যে সব বিষয় নিয়ে (নিজেদের মধ্যে) মতবিরোধ করছো, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। ৭০. তুমি কি জানো না, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন, এর সবকিছু একটি কেতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে, এ (সংরক্ষণ প্রক্রিয়া)-টা আল্লাহ তায়ালার কাছে (অত্যন্ত) সহজ একটি কাজ। ৭১. (তারপরও) তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন সব কিছুর গোলামী করে, যার সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল

عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ (٧١) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ

فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ

عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٢) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ

الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ

وَالْمَطْلُوْبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٧٤)

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (٧٥)

করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদের নিজেদের (কাছেও) কোনো জ্ঞান নেই; বস্তুত সীমালংঘনকারীদের জন্যে (কেয়ামতের দিন) কোনোই সাহায্যকারী থাকবে না। ৭২. (হে নবী,) যখন এদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি কাফেরদের চেহারায় (তীব্র) অসন্তোষ দেখতে পাবে; অবস্থা দেখে মনে হয়, যারা তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করছে এরা বুঝি এখনি তাদের ওপর হামলা করবে; (হে নবী,) তুমি (এদের) বলো, আমি কি তোমাদের এর চাইতে মন্দ কিছুর সংবাদ দেবো? (তা হচ্ছে জাহান্নামের) আগুন; আল্লাহ তায়ালা যার ওয়াদা করেছেন– (ওয়াদা করেছেন) তাদের সাথে যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে, আবাসস্থল হিসেবে তা কতো নিকৃষ্ট!

রুকু ১০

৭৩. হে মানুষ, (তোমাদের জন্যে এখানে) একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, কান পেতে তা শোনো; আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা যাদের ডাকো, তারা তো কখনো (ক্ষুদ্র) একটি মাছিও তৈরী করে দেখাতে পারবে না, যদি এ (কাজের) জন্যে তারা সবাই একত্রিতও হয়; (এমনকি) যদি সে (মাছি) তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তারা তার কাছে থেকে তাও ছাড়িয়ে নিতে পারবে না; (যাদের এতোটুকু ক্ষমতা নেই) কতো দুর্বল (তারা), যারা (এদের কাছে সাহায্য) প্রার্থনা করে; কতো দুর্বল তারা যাদের কাছে (এ সাহায্য) চাওয়া হচ্ছে। ৭৪. এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালাকে কোনো মূল্যায়নই করতে পারেনি, ঠিক যেভাবে (তাঁর ক্ষমতার) মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো; আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী। ৭৫. আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওহী বহন করার জন্যে) ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক মনোনীত করেন, মানুষদের ভেতর থেকেও (তিনি এটা করেন); অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু শোনেন ও সব কিছু দেখেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

৭৬. তাদের সামনে যা আছে তা (যেমনি) তিনি জানেন, (তেমনি) জানেন তাদের পেছনে যা আছে তাও; (কেননা একদিন) তাঁর কাছেই সবকিছুকে ফিরে যেতে হবে। ৭৭. হে মানুষ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে রুকু করো, সাজদা করো এবং তোমাদের মালিকের যথাযথ এবাদাত করো, নেক কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় এতে করে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। ৭৮. আর আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা জেহাদ করো, যেমনি তাঁর জন্যে জেহাদ করা (তোমাদের) উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এ) জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, (তোমরা প্রতিষ্ঠিত থেকো) তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর; সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এর (কোরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেয়া হয়েছে), যেন (তোমাদের) রসূল তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, আর তোমরাও (দুনিয়ার গোটা) মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো, অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালার রশি শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক (তিনি), কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!

তাফসীর

আয়াত ৫৮-৭৮

কেয়ামতের ময়দানে যখন একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে তখন মোমেন ও কাফেরদের পরিণতি কী দাঁড়াবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রেরিত নবী রসূলকে কিভাবে সাহায্য করবেন, তাদের দাওয়াতী কর্মকান্ডকে কিভাবে রক্ষা করবেন, যারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে কি প্রতিদান দেয়া হবে এবং যারা অস্বীকার করবে তাদেরকে কি শাস্তি দেয়া হবে এসব বিষয়ের আলোচনা পূর্বের আয়াতগুলোতে এসেছে।

এখন আলোচনা করা হচ্ছে মোহাজেরদের প্রসংগ নিয়ে যাদেরকে ইতিপূর্বে জেহাদে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এই অনুমতি প্রদান করা হয়েছে মূলত তাদের আকীদা বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্যে, তাদের এবাদাত বন্দেগীকে রক্ষা করার জন্যে এবং যুলুম অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যে। কারণ, তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের বাড়ী ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের অপরাধ কেবল এতোটুকুই যে, তারা একমাত্র আল্লাহকে নিজেদের রব বা প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই এ সকল মোহাজেরদের জান মালের কোরবানীর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কি উত্তম প্রতিদান দেবেন সে প্রসংগও এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

এরপর একটা সাধারণ নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যুলুম অত্যাচারকে ঠেকাতে গিয়ে যদি কেউ আক্রমণের শিকার হয়, অত্যাচারের শিকার হয় তাহলে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা অনিবার্যভাবে তার সাথেই থাকবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা ওয়াদা।

এই কঠিন ওয়াদা রক্ষা করার মতো শক্তি সামর্থ্য যে আল্লাহর রয়েছে, তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করছেন। গোটা সৃষ্টি জগতের পাতায় পাতায় চির উজ্জ্বল বাস্তব ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ পেশ করছেন। জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত আল্লাহর চিরন্তন বিধান থেকে প্রমাণ পেশ করছেন। এ সকল বাস্তব ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহর সাহায্য অত্যাচারিত ও নিপীড়িত লোকদের সাথেই থাকে। কারণ এরা আগ্রাসী নয়; বরং আগ্রাসনের শিকার। এরা আত্মরক্ষার প্রয়োজন যখন হাতিয়ার তুলে নেয় তখন এদের ওপর যুলুম অত্যাচারের পাহাড় ভেংগে পড়ে। ফলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে রক্ষা করেন। এটাই শাশ্বত নিয়ম, এটাই চিরন্তন বিধান। এই বিধানের অধীনেই গোটা বিশ্ব ও জগত পরিচালিত হচ্ছে।

এরপর রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব একটা আদর্শ থাকে। এই আদর্শ অনুযায়ীই তাদেরকে চলতে হয়। এই আদর্শ অনুযায়ী চলার জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করা হয়। এই আদর্শকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকেই মোশরেকদের সাথে এসব বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অথচ তারা তাদের আদর্শ ও বোধ বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে মোশরেকদেরকে সুযোগ দেয় না। মোশরেকরা যদি আলোচনার পরিবর্তে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মোমেনের উচিত ওদের বিষয়টি আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেয়া। তিনিই শেষ বিচারের দিন এদের এসব তর্ক-বিতর্কের ফয়সালা করবেন। কারণ, একমাত্র তিনিই ভালোভাবে জানেন, ওরা কতোটুকু সত্যের ওপর টিকে আছে। বস্তুত আসমান ও যমীনের সকল বিষয়ই তো তাঁর নখদর্পনে।

এরপর সে কাফের মোশরেকদের মনগড়া ও বিধর্মীয় পূজা অর্চনার প্রতি, ওদের পাষাণ হৃদয়ের প্রতি এবং ওরা যে সত্য কথাটুকু পর্যন্ত শুনতে রাযী নয় সেই বাস্তব অবস্থার প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে। ওদের অবস্থা এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, কেউ ওদের সামনে আল্লাহর পবিত্র কালামের তেলাওয়াত করলে তার ওপর ওরা ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। এমনকি ওরা সত্যের ধারক ও প্রচারকদের পর্যন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার হুমকি দেয়। অথচ আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি তো ওদের ভাগ্যে জুটবে কেয়ামতের দিন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর এই ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই।

আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যেসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হয় তারা যে কতোটুকু দুর্বল ও সামর্থ্যহীন তা সৃষ্টি জগতের সামনে তুলে ধরার জন্যে পরবর্তী আয়াতে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা

হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত কোনোরূপ অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হয়নি; বরং বর্ণনাভংগির মাধ্যমেই কাংখিত বক্তব্যটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যাদের মাঝে একটা মাছি তাড়ানোর মতো ক্ষমতা নেই, এমনকি মাছি তাদের দেহের কোনো অংগ বিশেষ ছিনিয়ে নিলে তা রক্ষা করার মত ক্ষমতা যাদের নেই তারাই নাকি উপাস্য! এমন উদ্ভট দাবীই মোশরেকরা করে থাকে!

এরপর মোমেন বান্দাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে আলোচনা শেষ হচ্ছে এবং সূরাও শেষ হচ্ছে। এই দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করা, সৎ কাজ করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সব বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা, তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা।

মোহাজের ও মাযলুমদের সাহায্যের ওয়াদা

'যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে............।' (আয়াত ৫৮-৫৯)

আল্লাহর রাস্তায় 'হিজরত' করার অর্থ হচ্ছে মনের সকল কামনা বাসনা, মনের সকল লোভ লালসা ও মায়া মমতা সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা। এই কামনা বাসনা, লোভ লালসা ও মায়া মমতা পরিবার পরিজনকে কেন্দ্র করে হতে পারে, দেশ ও মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে হতে পারে, অতীত স্মৃতিকে কেন্দ্র করে হতে পারে, বিষয় সম্পদকে কেন্দ্র করে হতে পারে, এমনকি গোটা জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও অবস্থাকে কেন্দ্র করেও হতে পারে। এসব কিছুকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আকীদার খাতিরে, ঈমানের খাতিরে এবং আদর্শের খাতিরে ত্যাগ করাই হচ্ছে প্রকৃত 'হিজরত'। এই ত্যাগ তখনই সম্ভব যখন মানুষ এই পৃথিবীর সব কিছুর তুলনায় পরকালীন জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতে শিখে।

হিজরতের বিধান ছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে। মক্কা বিজয়ের পর এই বিধান আর কার্যকর নয়। তবে এরপর জেহাদের বিধান এবং আমলের বিধান রয়েছে। কাজেই যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে, সৎ কাজ করবে তারা এর বিনিময়ে হিজরতের সওয়াব লাভ করবে। পবিত্র হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে যারা মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা উত্তম জীবিকা দান করবেন। এই মৃত্যু শাহাদাতের হোক, অথবা স্বাভাবিক উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই উত্তম জীবিকা দান করবেন। কারণ তারা ঘর বাড়ি, বিষয় সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে এবং এই অবস্থায় যে কোনো ভাগ্য ও পরিণতি বরণ করতে প্রস্তুত ছিলো। জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই ছিলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। হিজরতের মাধ্যমে যে কোনো উপায়ে শাহাদত লাভের আকাংখাও তাদের মাঝে ছিলো। কাজেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করার ওয়াদা দিচ্ছেন। আর তাই হলো উত্তম জীবিকা। এই জীবিকা হবে তাদের ত্যাগ করা সকল বিষয়-সম্পত্তি হতে উত্তম। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে তাদের পছন্দনীয় স্থানেও জায়গা দেয়া হবে। সেই জায়গা হচ্ছে জান্নাত। কারণ, তারা আল্লাহকে খুশী করার জন্যে ঘর বাড়ি ত্যাগ করেছিলো।

এখন বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে খুশী করার জন্যে তাদের পছন্দনীয় জায়গায় চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের আয়োজন করে দেবেন। এটা কত বড়ো সম্মান ও গৌরবের বিষয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে বলবেন, তোমরা যেখানে থাকতে চাইবে, আমি সেখানেই তোমাদেরকে রাখবো!

'আল্লাহ জ্ঞানময় ও সহনশীল'

আয়াতের এই শেষাংশের অর্থ হচ্ছে যে, মোহাজেরদের ওপর কি ধরনের যুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই যালেম ও অত্যাচারী লোকদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তিনি সহনশীল, তাই ইচ্ছা করলেই ওদেরকে আপাতত ছেড়ে দিয়েছেন। তবে শেষ বিচারের দিন তিনি যালেম ও মযলুম উভয় শ্রেণীর লোকদের বিচার যথাযথভাবে করবেন।

এমন লোক অনেকই আছে যারা যুলুম নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করে নেয় না। বরং যুলুমের বদলা নেয়, শাস্তির বদলায় শাস্তি দেয়, আঘাতের বদলায় আঘাত দেয়। এই ক্ষেত্রে অত্যাচারী ও আগ্রাসনবাদীরা যদি দমে না গিয়ে পুনরায় সে মযলুমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বা আক্রমণ করে বসে তাহলে আল্লাহ তায়ালা মযলুমদেরই পক্ষ নেবেন এবং যালেমদেরকে শায়েস্তা করবেন। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে,

'তা এই জন্যে যে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত।' (আয়াত নং ৬০)

তবে এর জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, নিপীড়িত ব্যক্তিরা কেবল বদলা নেবে, নিজেরা যুলুম করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না এবং শক্তির মহড়া দেখাতে যাবে না। ঠিক যতোটুকু অত্যাচার করা হয়েছে ততোটুকু পর্যন্তই বদলা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনোমতেই যেন এতে বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় না দেয়া হয়।

যুলুম অত্যাচারের বদলা নেয়ার প্রসংগ উল্লেখ করার পর বলা হচ্ছে যে, 'আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল' এর অর্থ হচ্ছে, ক্ষমা ও মার্জনা কেবল আল্লাহ তায়ালাই করে থাকেন। এই গুণের একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র তিনিই। মানুষ কিন্তু এমন নয়। তাই সে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমা করেনা, মাফ করে না; বরং সে অনেক ক্ষেত্রে বদলার পথই বেছে নেয়, যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা নেয়, মানুষ হিসাবে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। কারণ, তারা অত্যাচারিত হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। তাই আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন।

যুলুম অত্যাচারের বদলা নিতে গিয়ে পুনরায় যুলুম অত্যাচারের শিকার হলে আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য, এই ওয়াদা ব্যক্ত করার পর আল্লাহর কুদরতের বেশ কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, মযলুমদের সাহায্য করার ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর রয়েছে। কারণ তিনি গোটা জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, পরিচালনা করছেন। একটি সূক্ষ্ম ও চিরস্থায়ী নিয়মের অধীনে এই বিশ্বচরাচর পরিচালিত হয়ে আসছে, এই নিয়ম ও ব্যবস্থার যিনি রূপকার তিনি নিশ্চয়ই অপার কুদতরের মালিক। কাজেই তিনি কোনো কিছু করার ওয়াদা করে থাকলে সে ওয়াদা বাস্তবায়িত না হয়ে পারে না এর কারণ প্রসংগে বলা হচ্ছে

'এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা রাতকে দিনের মধ্যে........। (আয়াত নং ৬১)

দিবা-রাত্রির এই যে পরিবর্তন, সেটা একটা প্রাকৃতিক ও সাধারণ বিষয় যা মানুষ সকাল বিকাল এবং শীত ও গ্রীষ্মে প্রত্যক্ষ করে থাকে। সূর্য যখন অস্তমিত হয় তখন দিনের মাঝে রাত প্রবেশ করে, আর যখন উদিত হয় তখন রাতের মাঝে দিন প্রবেশ করে। এ ছাড়া শীতের মৌসুমে যখন দিন ছোট হয় এবং রাত বড়ো হয় তখনও বলতে পারি যে, দিনের মাঝে রাত প্রবেশ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে গরমের মৌসুমে যখন রাত ছোট হয়ে দিন বড়ো হয়, তখনও আমরা বলতে পারি যে, রাতের মাঝে দিন প্রবেশ করেছে, এই প্রাকৃতিক বিষয়টি মানুষ অহরহ প্রত্যক্ষ করছে এবং একটি অতি সাধারণ বিষয় হিসেবে এর প্রতি তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় না। তারা

ভুলে যায় যে, এর পেছনে এক সূক্ষ্ম ও চিরস্থায়ী নিয়ম কাজ করছে। ফলে এর মাঝে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় না, কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না এবং কোনো বৈকল্যও দেখা যায় না, এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, মহা শক্তিধর সত্ত্বা এই অপরিবর্তণীয় ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীনে গোটা বিশ্বকে পরিচালনা করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন।

অহরহ ঘটে যাওয়া এই জাগতিকে বিষয়টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। এই আয়াতের বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর কুদরত ও শক্তির ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিকে উন্মোচিত করা হচ্ছে, তাদের চিন্তা চেতনাকে নাড়া দেয়া হচ্ছে। ফলে মানুষ যেন উপলব্ধি করতে পারে, যে মহান সত্ত্বা একদিকে দিনকে গুটিয়ে নিয়ে রাতের পর্দা টেনে দিচ্ছেন, অপরদিকে রাতকে গুটিয়ে নিয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন অত্যন্ত সুচারু রূপে, সূক্ষ্ম ভাবে এবং অপরিবর্তণীয় এক স্থায়ী নিয়মের অধীনে– তিনি অবশ্যই সেসব মযলুমদের সাহায্য করতে সক্ষম যারা যুলুমকে প্রতিহত করতে গিয়ে যুলুমের বদলা নিতে গিয়ে পুনরায় যুলুমের শিকার হবে। রাত ও দিনের পরিবর্তন যেমন ভাবে আল্লাহ তায়ালা করছেন ঠিক সে ভাবেই সে মযলুমদেরকেও সাহায্য করবেন। এটা তাঁর অমোঘ বিধান, অলঙ্ঘনীয় বিধান। এই বিধান অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা যুলুমবাজদের ক্ষমতার কালো রাত্রিকে গুটিয়ে নিয়ে ন্যায়পরায়নদের ক্ষমতার আলো ছড়িয়ে দেবেন। দুটোই ঘটবে বা ঘটছে একই নিয়মের অধীনে, কিন্তু মানুষ এগুলো দেখেও দেখে না যেমনটি দেখে না জগতময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য আল্লাহ তায়ালা কুদরত ও নিদর্শনাবলী।

এসব বাস্তব বিষয়াদি এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মহা সত্য। এই মহাসত্যের অধীনেই পরিচালিত হচ্ছে গোটা বিশ্ব, তাঁরই মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই গোটা প্রকৃতি। কাজেই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর যা কিছু আছে, তা সবই মিথ্যে ভ্রান্ত, অচল, অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল। এ কথাই নিচের আয়াতে বলা হচ্ছে,

'এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ তায়ালাই সত্য..................।' (আয়াত ৬২)

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সত্য, কাজেই তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করবেন এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিপক্ষে থাকবেন। আর এটাই সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয় প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট-এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, জাগতিক নিয়ম কানুন যেমন স্থায়ী, অভ্রান্ত ও অলংঘনীয় তেমনিভাবে সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়ও অভ্রান্তও অলংঘনীয়।

সৃষ্টি জগতের সবকিছুই মানুষের সেবায় নিয়োজিত

অত্যাচারীদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা অনেক উর্ধে। যুলুমবাজদের তুলনায় তিনি অনেক বড়ো ও ক্ষমতাধর। কাজেই তিনি অত্যাচারকে বাড়তে দিতে পারেন না, অন্যায় অবিচারকে দীর্ঘ হতে দিতে পারেন না।

'এবং আল্লাহ তায়ালাই সবার উচ্চে, সর্বমহান'।

প্রতি মুহূর্তে মানুষ যেসব নিদর্শন গোটা প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান দেখতে পায় সেগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে,

'তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে..................।' (আয়াত ৬৩)

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, তারপর রাতারাতি ধরনীর শ্যামল রূপ ধারণ এ গুলো অতিসাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা যা অহরহ ঘটছে। এগুলো দেখতে দেখতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই তা মনের মাঝে তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু যখন সংবেদনশীল অনুভূতির

উন্মেষ ঘটে তখন ধরনীর এসব সাধারণ দৃশ্যাবলী মনের মাঝে এক ধরনের ভাবাবেগ ও চেতনার জন্ম দেয়। তখন মানুষ হৃদয়ের গভীর থেকে উপলদ্ধি করতে পারে এবং দেখতে পায় যে, ধরনীর বুক চিরে উদিত ছোট চারাগুলো বর্ণে ও সম্পর্কে যেন কচি কচি শিশু যারা আনন্দে উল্লাসে হাসছে এবং আলোর পাখার ভর দিয়ে যেন উড়ে চলছে।

এ'ভাবে যারা উপলব্ধি করতে পারে, অনুভব করতে পারে, তারা 'নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে জ্ঞাত', এই বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন করতেও সক্ষম। কারণ তাদের অনুভূতি সূক্ষ্ম, তাদের অনুধাবন শক্তি গভীর, কাজেই তারা এ জাতীয় সূক্ষ্ম দৃশ্যের তাৎপর্য ও মর্ম বুঝতে সক্ষম। একইভাবে আল্লাহর সূক্ষ্মদর্শীতার তাৎপর্যও অনুধাবন করা তাদের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহর কুদরতী কোমল হাতের স্পর্শের ফলেই মাটির নিচ থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও কোমল চারা গাছ ধীরে ধীরে উঁকি মারতে পারে। আল্লাহর কুদরতী হাতই ওটাকে বাতাশে মেলে ধরে, পৃথিবীর আকর্ষণ এবং ভূমির ভারের ওপর ভিত্তি করে ওটাকে ওপরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি বর্ষণের সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। ফলে সময়মতো ও প্রয়োজনমতো আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এরপর বৃষ্টির পানি মাটির সাথে মিশে গিয়ে সে বাড়ন্ত চারা গাছগুলোর প্রতিটি জীবন্ত কোষে শক্তি জোগায় এবং সজীবতা ও শ্যামলতায় ভরে তোলে।

এই বৃষ্টি আল্লাহর আকাশ থেকে বর্ষিত হয়ে তাঁরই যমীনে পতিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর বুকে জীবনের উম্মেষ ঘটান। এর মাধ্যমে আহার যোগান, ঐশ্বর্য যোগান। তিনিই এই গোটা জগত ও জগতবাসীদের মালিক এবং কর্তা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি পানির দ্বারা, বৃষ্টি দ্বারা এবং বৃক্ষ তরুলতা দ্বারা সকল প্রাণীর আহার যোগান। এর বিনিময়ে প্রাণী জগতের কাছ থেকে লাভ করার মতো তার কিছুই নেই। কারণ,' আল্লাহ তায়ালাই অভাব মুক্ত, প্রশংসার অধিকারী'।

আকাশবাসী ও যমীনবাসী কারো কাছ থেকে আল্লাহর কিছু চাওয়ারও নেই এবং পাওয়ারও নেই, তিনি সব ধরনের প্রয়োজন হতে মুক্ত। বরং তিনি স্বীয় নেয়ামতের জন্যে সকলের কাছে প্রশংসার অধিকারী কৃতজ্ঞতার দাবীদার এবং আনুগত্যের উপযুক্ত।

প্রতি মুহূর্তে মানুষ যেসব খোদায়ী কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখতে পায়, পুনরায় সেগুলো তার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, 'তুমি কি দেখো না যে, ভূপৃষ্টে যা আছে......।' (আয়াত ৬৫)

এই পৃথিবীর বুকে কতো শক্তি, কতো সম্পদই না আল্লাহ তায়ালা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। অথচ মানুষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সে বুঝতেই পারে না যে, এর পেছনে কোনো মহান সত্ত্বার হাত কাজ করছে।

পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে তার সবটাই আল্লাহ তায়ালা এই মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে পৃথিবীর প্রকৃতি ও স্বভাব মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের অনুকূল করা হয়েছে। মানুষের স্বভাব ও তার গঠন প্রকৃতি যদি এই পৃথিবীর স্বভাব ও প্রকৃতি হতে ভিন্ন হতো, তাহলে এখানে টিকে থাকা এবং বেঁচে থাকাই তার পক্ষে সম্ভব হতো না, উপকৃত হওয়া ও লাভবান হওয়া তো অনেক দূরের কথা। মানুষের দৈহিক গঠন প্রণালী যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা, আলো, বাতাস, খাদ্য ও পানির অনুকূল না হতো, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যেও সে এখানে টিকতে পারত না। মানুষের দেহের ঘনত্ব আর পৃথিবীর ঘনত্ব বর্তমানে যা আছে, তার চেয়ে যদি সামান্যও ব্যতিক্রম হতো, তাহলে মাটির ওপর তার পা টিকে থাকতো না। বরং বাতাসে উড়ে যেতো, অথবা মাটির নিচে তলিয়ে যেতো। এই পৃথিবীর বুকে যদি বায়ুর কোনো অস্তিত্বই না থাকতো, অথবা বর্তমানে

বায়ুর যে ঘনত্ব আছে, তার চেয়ে যদি বেশী হতো, অথবা কম হতো, তাহলে মানুষ দম আটকে মারা যেতো অথবা তার শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। সে কারণেই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি পৃথিবীর সব কিছুকেই তার সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে। আর এসব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশে।

পৃথিবীকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেই আল্লাহ তায়ালা ক্ষান্ত হননি। বরং পৃথিবীর প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার মতো যোগ্যতা, ক্ষমতা ও শক্তিও তাকে দান করেছেন। ফলে মানুষ একের পর এক প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার উদ্ঘাটন করে চলেছে। যখনই তার নতুন সম্পদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই সে নতুন নতুন ভান্ডারের মুখ খুলে দেয়। এক ভান্ডার শেষ হলে আর এক ভান্ডার আবিষ্কার করে নেয়। বর্তমানে পৃথিবীর বুকে গ্যাস ও তেল আকারে যে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ মজুদ রয়েছে তা এখনও শেষ হতে না হতেই আনবিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি ও সৌরশক্তির নয়া ভান্ডার মানুষের সামনে উন্মুক্ত হতে চলেছে। তবে মানুষ যখন এসব সম্পদ কল্যাণমুখী কাজে এবং গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করে তখনই আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে, যখন সে আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং জীবন সম্পর্কিত আল্লাহর বিধান মেনে চলবে। নচেত তার অবস্থা সেই অবুঝ শিশুর ন্যায় হবে যে আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে নিজেকেও জ্বালিয়ে মারে এবং অন্যকেও জ্বালিয়ে মারে।

'সমুদ্রে চলমান নৌকা'– প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিগুলো আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, সমুদ্রের বুকে নৌকা ভাসতে পারে ও চলতে পারে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির তত্ত্বজ্ঞান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শিখিয়েছেন। ফলে সে নিজের কল্যাণ ও উপকারে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে। যদি সমুদ্র বা নৌকার স্বভাব ও প্রকৃতির মাঝে সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখা দিতো, অথবা এ সবের জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মাঝে অভাব থাকতো, তাহলে যা হচ্ছে ও ঘটছে, তা কখনও হতো না।

'এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপ্রষ্ঠে পতিত না হয়' .... অর্থাৎ তিনি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে এই জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এই নিয়মের অধীনেই তা পরিচালিত করছেন। সে নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকার ফলেই গ্রহ-নক্ষত্র পরস্পর থেকে অনেক দূরে ও শূন্যে অবস্থান করছে। কাজেই ভূপৃষ্ঠে সেগুলো পতিতও হয় না এবং পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষও হয় না।

মহা জাগতিক নিয়ম নীতি সম্পর্কিত জ্যোতির্বিদ্যার যে কোনো ব্যাখ্যা মূলত সেই সুসংঘবদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম নীতিরই ব্যাখ্যা প্রয়াস যা এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টার অন্যতম সৃষ্টি। কিন্তু অনেকেই এই জাজ্বল্যমান সত্যটিকে ভুলে যায়। ফলে তারা এই মহা জাগতিক নিয়ম নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অস্বীকারই করে বসে যে, এর পেছনে কোনো মহান সত্ত্বার সুনিপুণ হাত কাজ করছে। এটা একটা আজগুবী ধারণা, অমূলক ধারণা এক অদ্ভুত ভ্রান্ত চিন্তাধারা। প্রথমত: জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিতান্তই অনুমান নির্ভর হয়ে থাকে। সেগুলো সত্য হতে পারে এবং মিথ্যাও হতে পারে। এমনকি আজকে যে মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, আগামী কাল হয়তো নতুন কোনো মতবাদের মাধ্যমে তা বাতিল বলেও সাব্যস্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও এগুলোকে যদি সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তবুও এর দ্বারা জাগতিক নিয়ম নীতির স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না এবং এই নিয়ম নীতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় স্রষ্টার প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না।

আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-নীতির ফলে ও প্রভাবেই আকাশ ভূপৃষ্ঠে পতিত হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে সেদিন এই নিয়ম নীতি অচল হয়ে পড়বে, অকার্যকর হয়ে পড়বে সেদিন অবশ্যই আকাশ ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। এর পেছনেও আল্লাহর রহস্য কাজ করছে।

আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং সুক্ষ্ম প্রাকৃতিক ও মহা জাগতিক নিয়মনীতি বর্ণনার পর এখন মানব জগতে জীবন মৃত্যুর বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। নিচের আয়াতে এ প্রসংগে বলা হচ্ছে,

'তিনিই তোমাদেরকে জীবিত ....। (আয়াত ৬৬)

জীবনের উৎপত্তিই হচ্ছে এক অলৌকিক ঘটনা। দিন ও রাতের প্রতিটি মুহূর্তে যে সব জীবনের উৎপত্তি ঘটছে তার প্রত্যেকটির মাধ্যমে সে অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে। এর পেছনে যে নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে তা অনুধাবন করতে গিয়ে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলেছে। কারণ, এটা একটা বিশাল বিষয়। এর জন্যে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রও অনেক প্রশস্ত।

মৃত্যু হচ্ছে আর এক রহস্য। এই রহস্য উদঘাটন করতে গিয়েও মানুষ অপারগ হয়ে পড়েছে। এই মৃত্যু ঘটে এক নিমিষেই। জীবনের প্রকৃতি আর মৃত্যুর প্রকৃতির মাঝে যে ব্যবধান, তা শত যোজন। কাজেই এই রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রও অনেক প্রশস্ত ও দীর্ঘ।

মৃত্যুর পরের জীবন একটি অদৃশ্য ব্যাপার। কিন্তু সে জীবন যে অবধারিত ও নিশ্চিত তার প্রমাণ রয়েছে জীবনের উৎপত্তির ঘটনার মাঝেই। অতএব এ সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করার মতো সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু মানুষ এ সব অকাট্য প্রমাণাদি এবং এসব নিগূঢ় রহস্যাদি সম্পর্কে আদৌ চিন্তা ভাবনা করে না। তাই বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয় মানুষ বড়ো অকৃতজ্ঞ।'

এসব নিদর্শনাবলী পেশ করে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ করতে চান যে, যুলুম অত্যাচারকে প্রতিহত করতে গিয়ে কেউ পুনরায় অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হলে আল্লাহর মদদ তার সহায়ক হবেই। এই জোরালোভাবে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হচ্ছে, মানুষের হৃদয়কে এসব নিদর্শনাদির প্রতি আকৃষ্ট করা এবং সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ভংগিরই একটি অন্যতম রূপ। এর মাধ্যমে জাগতিক ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী পেশ করা হয়। সৃষ্টি জগত সম্পর্কিত সত্য ও ন্যায় নীতি বিধানের মাঝে একটা যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য সে একটাই। আর তা হচ্ছে মানুষের হৃদয়কে এই সত্যতা ও বাস্তবতাকে স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করা।

ইসলামী আন্দোলনে আপোষকামীতার সুযোগ নেই

মহা জাগতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে আল্লাহ তায়ালা কুদরতের প্রমাণাদি পেশ করার পর এখন সরাসরি রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তিনি যেন নিজের পথই অনুসরণ করে চলেন এবং মোশরেকদের দিকে না তাকান, ওদের তর্ক বিতর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন। কারণ, ওদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে, তর্ক বিতর্ক করে ওদেরকে আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। ওদের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়াই নবীর কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন করলেই যথেষ্ট। বলা হচ্ছে,

'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদাতের একটা নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি.........।' (আয়াত ৬৭-৬৮)

এটা একটা বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেক জাতির জীবন যাপন, চিন্তা চেতনা, আচার আচরণ এবং বোধ ও বিশ্বাসের একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও আদর্শ থাকে। এই আদর্শ আল্লাহর সেই চিরন্তন নীতিরই অধীন যার মাধ্যমে মানবীয় স্বভাব ও মানসিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই যে জাতি জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সত্যের সন্ধানদাতা অগনিত প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়া দিয়ে খোলা মনে তা গ্রহণ করে নেয়, সে জাতিই আল্লাহর পথের সন্ধান পায়, হেদায়াত লাভে ধন্য হয়। অপরদিকে যে জাতি এসব প্রমাণাদি ও নিদর্শনাবলীর ডাকে সাড়ে দেয় না, ভ্রুক্ষেপ করে না, সে জাতি পথভ্রষ্ট জাতি। কাজেই সে জাতির এই তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্য তাদেরকে সত্যের পথ থেকে এবং ন্যায়ের পথ থেকে আরো দূরে সরিয়ে রাখবে।

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও আদর্শ সৃষ্টি করে রেখেছেন। কাজেই এসব বিষয় নিয়ে নবীর ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং এগুলো নিয়ে মোশরেকদের সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ওরা ইচ্ছা করেই সত্যের পথ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং উৎসাহ ভরে নিজেদেরকে ভুল পথেই চালিয়ে নিচ্ছে। নবীর আদর্শের ব্যাপারে এবং মত ও পথের ব্যাপারে ওরা যাতে নবীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না পায় সে নির্দেশ তাঁকে দেয়া হচ্ছে। সাথে সাথে তাঁকে আরো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন নিজের আদর্শের ওপরই অটল থাকেন এবং কাফের মোশরেকদের তর্ক বিতর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন। বরং তর্ক বিতর্কের সুযোগই যেন ওদেরকে না দেন। কারণ তিনি যে আদর্শের ধারক ও প্রচারক সেটাই হচ্ছে প্রকৃত আদর্শ এবং সত্য আদর্শ। তাই নবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে,

'তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে আহ্বান করো। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথেই আছো।'

অতএব নবীকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তিনি সঠিক আদর্শের ওপরই আছেন এবং সত্য পথই অনুসরণ করে চলেছেন। এরপরও যদি কাফের মোশরেক সম্প্রদায় তাঁর সাথে তর্ক করতে আসে তাহলে তিনি যেন অহেতুক সময় ও শ্রমের অপচয় না করে সংক্ষেপে এভাবে উত্তর দিয়ে দেন,

'তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অধিক জ্ঞাত।'

যারা সত্যকে জানার জন্যে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং যাদের মাঝে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আছে, কেবল তাদের সাথেই তর্ক করা যায়। এতে কাজও হয়। কিন্তু যারা গোঁয়ার প্রকৃতির, দাম্ভিক ও অহংকারী; যারা নিজেদের ভুল পথ ও মত থেকে এক চুল পরিমাণ সরতেও রাযী নয়– তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করে কোনো লাভ নেই। কারণ, ওদের চোখের সামনে শত শত আলামত ও নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু, এসব কিছু দেখেও ওরা সত্যকে মেনে নেয় না। কাজেই ওদের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। তিনিই ওদের ফয়সালা করবেন। কারণ, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে এবং বিভিন্ন মত ও পথের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। তাই বলা হচ্ছে,

'তোমরা যে ব্যাপারে মত বিরোধ করছো সে ব্যাপারে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত দেবেন।' (আয়াত ৬৯)

কারণ, তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি করার কারও ক্ষমতা নেই। সেই কেয়ামতের দিন কারো তর্ক করার সাহস হবে না। তাঁর চূড়ান্ত রায়ের ব্যাপারে কারো দ্বিমত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ে রায় দেন, তখন পরিপূর্ণভাবে জেনে শুনেই দেন। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। কোনো দলীল প্রমাণ ও কার্যকারণই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়। তিনি যমীন ও আসমানের যা কিছু ঘটছে, সবই জানেন। এমনকি মানুষের অন্তরে কি ঘটছে তাও জানেন। মানুষের নিয়তের খবরও তিনি রাখেন। তাই বলা হচ্ছে, 'তোমার কি জানা নেই ....।' (আয়াত ৭০)

আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম। কাজেই জগতের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নেই। যে সব কারণে মানুষ ভুলে যায় বা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে- সেগুলো আল্লাহর মাঝে নেই। কাজেই তাঁর সত্ত্বাকে একটি বিশাল গ্রন্থের সাথেই তুলনা করা যায়, যার মাঝে সব কিছুরই তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

অপরদিকে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি খুবই সীমিত। কাজেই তার পক্ষে আল্লাহর জ্ঞানের বিশালতা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এমনকি তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই জগতের সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি, সকল কর্ম, সকল অনুভূতি এবং সকল গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ণাংগ ও সুক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়েও মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ বিষয়টা তার জন্যে অসম্ভব হলেও, আল্লাহর জন্যে নয়। বরং আল্লাহর জন্যে তা খুবই সহজ। তাই বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'

সত্যের আহবানে বাতিলের গাত্রদাহ অবশম্ভাবী

রসূলের সত্য আদর্শের ব্যাপারে কাফের মোশরেকদেরকে অহেতুক তর্ক বিতর্কের সুযোগ না দেয়ার আদেশ করার পর এখন আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে ওদের মতাদর্শের স্বরূপ তুলে ধরছেন। ওদের মতাদর্শে কি বক্রতা রয়েছে, কি দুর্বলতা রয়েছে, কি অজ্ঞতা ও কুসংস্কার রয়েছে এবং সত্যের প্রতি কি অন্যায় ও অবিচার রয়েছে তা তুলে ধরছেন এবং প্রমাণ করছেন যে, ওরা তাঁর মদদ ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত। কাজেই ওদের পক্ষে কেউ নেই। বলা হচ্ছে,

'ওরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে.........।' (আয়াত ৭১)

যে কোনো মত ও পথ, যে কোনো ধর্ম ও আদর্শ তার শক্তি আহরণ করে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে। কাজেই যে মতবাদ বা আদর্শের পেছনে আল্লাহর সমর্থন নেই এবং স্বীকৃতি নেই সে মতবাদ অবশ্যই দুর্বল, নড়বড়ে এবং মৌলিকতা বিহিন মতবাদ।

সে মোশরেকদের দল বিভিন্ন মূর্তিরূপী দেব-দেবী অথবা মানুষ ও শয়তান রূপী দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে। এসব দেব-দেবীর পেছনে আল্লাহর কোনো শক্তি নেই, সমর্থন নেই। কাজেই ওরা শক্তিহীন এবং সামর্থ্যহীন। কোনো বলিষ্ঠ বা সন্তোষজনক যুক্তি প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ওরা এ সবের পূজা অর্চনা করে না। বরং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই করে থাকে।

সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ওরা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই এবং নিতান্ত অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এসব দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করা সত্তেও হক কথা শুনতে মোটেও রাযী নয়। সত্যের আহ্বানে সাড়া দিতেও রাজী নয়। বরং তাদেরকে হক কথা বলা হলে বা সত্যের পথে আহ্বান করা হলে সেটাকে তারা নিজেদের জন্যে অবমাননাকর বলে মনে করে। ফলে কেউ তাদের সামনে পবিত্র কোরআনের বাণী পাঠ করে শুনাতে গেলে তার ওপর চড়াও হতে তারা উদ্যত হয়। নিচের আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয় ....'। (আয়াত ৭২)

অর্থাৎ ওরা যুক্তির মোকাবেলা যুক্তি এবং সাক্ষ্য প্রমাণের মোকাবেলা সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে করতে সক্ষম নয়। তাই যুক্তি-তর্কে হেরে যাওয়ার ভয়ে তারা বল প্রয়োগের আশ্রয় নেয়, যুলুম

নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। উগ্রবাদী ও স্বৈরাচারী লোকদের স্বভাবই এ রকম। যুলুম অত্যাচার এবং উৎপীড়ন নিপীড়ন ওদের অস্থি মজ্জার সাথে মিশে থাকে। তাই, ওরা হক কথা বরদাশত করতে পারে না। বরং এই হক কথার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে ওরা সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে। কারণ, ওদের বিশ্বাস, কঠোর হস্ত ব্যতীত এই কণ্ঠ স্তব্ধ করা যায় না।

কোরআন ওদেরকে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বলছে যে, তোমাদের এসব যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনের পরিণতি খুবই খারাপ হবে। তোমাদের স্থান জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হবে না। কাজেই হুশিয়ার, সাবধান।

পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণে কোরআনের উপমা

এর পর প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মানব জাতির সামনে একটা বাস্তব সত্য তুলে ধরা হচ্ছে। আর সেটা হচ্ছে কল্পিত দেব-দেবীদের শক্তি সামর্থ্যের বিষয়টি। কিছু সংখ্যক মানুষ যেসব কল্পিত দেব-দেবীকে নিজেদের ত্রাণকর্তা মনে করে তাদের সামনে সাহায্যের জন্যে হাত বাড়ায় এবং ওদের চরণে নিজেদেরকে সঁপে দেয় সেগুলো যে কত দুর্বল ও সামর্থ্যহীন তা চোখে আংগুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে অত্যন্ত বাস্তব ও চাক্ষুষ একটা দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হচ্ছে,

'হে লোক সকল! একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, তোমরা মনোযোগ শোনো।' (আয়াত ৭৩)

একদম খোলামেলা ঘোষণা, একদম জোরালো কণ্ঠের ঘোষণা। সকল মানুষকে ডেকে বলা হচ্ছে, তোমরা শোনো। অর্থাৎ যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে লুকোচুরির কিছু নেই এবং তা বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে নয়। বরং সকলের অবগতির জন্যে জানানো হচ্ছে। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে সবার জন্যে, তাই সকলকে খেয়াল করে শুনার জন্যে বলা হচ্ছে। দৃষ্টান্তটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা তোমরা করছো, তারা সকলে একত্রিত হয়েও একটা মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা রাখো না। এসব কল্পিত উপাস্য কোনো মূর্তি, কোনো ব্যক্তি, কোনো আদর্শ বা কোনো মূল্যবোধ যাই হোক না কেন এদের কোনো ক্ষমতা নেই। মাছির মতো একটা নগণ্য ও তুচ্ছ প্রাণী সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতাও এদের নেই। অথচ এদেরকেই মানুষ উপাস্যের আসনে বসিয়ে এদের চরণে পূজা অর্চনা নিবেদন করছে! এদের কাছে সাহায্য কামনা করছে, আশ্রয় কামনা করছে!

একটা উট বা হাতি সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ছোট্ট একটা মাছি সৃষ্টি করাও। কারণ, প্রাণ নামক যে বিস্ময়কর রহস্যটি উট বা হাতির মাঝে কাজ করছে, সেই একই রহস্য মাছির মাঝেও কাজ করছে। কাজেই উভয় শ্রেণীর প্রাণী সৃষ্টি করা একই পর্যায়ের অসম্ভব কাজ। কিন্তু পবিত্র কোরআনের অননুকরণীয় বর্ণনা ভংগিতে একটা নগন্য ও তুচ্ছ মাছির দৃষ্টান্তই স্থান পেয়েছে। কারণ, একটা হাতি বা উট সৃষ্টি না করার অক্ষমতার মাঝে দুর্বলতার যে চিত্র ফুটে উঠবে, তার চেয়েও অনেক বেশী দুর্বলতা ফুটে উঠবে একটা মাছি সৃষ্টি না করার অক্ষমতার মাঝে। অথচ এই বর্ণনা ভংগির ফলে প্রকৃত সত্যের মাঝে কোনো হেরফের হচ্ছে না। এখানেই কোরআনের বিস্ময়কর বর্ণনা ভংগির সার্থকতা নিহিত।

এরপর আর এক কদম আগে অগ্রসর হয়ে ওই কল্পিত দেব-দেবীদের অক্ষমতার অপর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হচ্ছে,

'আর যদি মাছি তাদের কোনো অংশ ছিনিয়ে নেয়, তাহলে সেটাও তারা রক্ষা করতে পারবে না।'

এসব তথাকথিত মূর্তিরূপী, বস্তুরূপী অথবা মানুষরূপী উপাস্যদের মাঝে আসলেও এতোটুকু ক্ষমতা নেই যে, নিজেদেরকে মাছির মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

এমন অনেক প্রিয়বস্তু মানুষের হাত থেকে মাছি ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা পুনরায় উদ্ধার করতে পারে না। মাছি যদিও একটি দুর্বল ও ছোট্ট প্রাণী। কিন্তু এর মাঝে এমন মারাত্মক জীবাণু বহন করার মতো ক্ষমতা রয়েছে যার মাধ্যমে সে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান অংগ-প্রত্যংগের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমনকি মানুষের প্রাণ বা জীবনও ছিনিয়ে নিতে পারে। কারণ, মাছি যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয় ও ডাইরিয়ার মতো মারাত্মক রোগের জীবাণু বহন করে। ফলে তুচ্ছ ও নগন্য হওয়া সত্ত্বেও সে মানুষের এমন ক্ষতি করতে পারে যা পূরণ করা কখনও সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরআনের অননুকরণীয় বর্ণনাভংগির মাঝে আর একটি বাস্তব সত্য ধরা পড়েছে। আয়াতে যদি বলা হতো যে, কোনো হিংস্র পশু ওদের কোনো অংশ ছিনিয়ে নিলে তা উদ্ধার করার মতো ক্ষমতা ওদের নেই তাহলে এর দ্বারা ওদের শক্তিই বুঝাতো, দুর্বলতা নয়। অথচ হিংস্র পশু যা ক্ষতি করতে পারে তা মাছির ক্ষতির চেয়ে কিন্তু বড়ো নয়। কাজেই মাছির দৃষ্টান্তই তুলে ধরা হয়েছে।

আর এটাই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভংগির বাস্তব নিদর্শন,

ওপরের দৃষ্টান্তটি পেশ করার পর মন্তব্য আকারে বলা হচ্ছে, 'দুর্বল প্রার্থী ও প্রার্থিত'। এর ফলে দৃষ্টান্তটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মূল ভাবটি মনের মাঝে গেঁথে যায়।

কল্পিত দেব-দেবীদের অন্তসারশূন্যতা ও সামর্থহীনতা বর্ণনা করার সঠিক ও উপযুক্ত মুহূর্তটিতে আল্লাহ তায়ালা নিজের কুদরত ও অসীম ক্ষমতার মূল্যায়নে যারা ব্যর্থ-তাদেরকে নিন্দাবাদ জানিয়ে ঘোষণা করছেন,

'তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে মূল্যায়ন করতে পারেনি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।' (আয়াত ৭৪)

সত্যিই ওরা আল্লাহর মর্যাদা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। নইলে ওরা কখনো এমন দুর্বল ও অক্ষম উপাস্যদেরকে আল্লাহর শরীক বলে বিশ্বাস করতো না, যাদের মাঝে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটা মাছিও সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা নেই, এমনকি মাছির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার মতো শক্তিও নেই!

ঠিকই ওরা আল্লাহর মর্যাদা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। নইলে আল্লাহর অপার কুদরতের শত শত নিদর্শন দেখেও এবং তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের শত শত প্রমাণ স্বচক্ষে দেখেও ওরা কিভাবে তাঁর সাথে এমন কল্পিত উপাস্যকে শরীক করে যার মাঝে একটা তুচ্ছ ও নগণ্য মাছি সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা নেই?

ওরা ঠিকই আল্লাহর মর্যাদা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তা না হলে ওরা কি করে মহাশক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছু দুর্বল ও শক্তিহীন দেব-দেবীর কাছে ধর্ণা দেয় যেগুলো মাছির আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা রাখে না?

বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্যে মনের মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার জন্যে ওপরের বর্ণনাভংগি ও বক্তব্য সাবধান বাণী হিসেবে কাজ করছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে মনোনীত করে নবী রসূলদের কাছে পাঠান এবং মানুষ জাতির মধ্য থেকে

কিছুসংখ্যক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদেরকে নবী বা রসূল হিসেবে মনোনীত করে মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে প্রেরণ করেন। এগুলো আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ রূপে নিজের অসীম জ্ঞান ও কুদরতের ওপর ভিত্তি করে নিধারণ করেন। নিচের আয়াতে এ কথাই বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা ও মানুষ জাতির মধ্য থেকে...............।' (আয়াত ৭৫-৭৬)

অর্থাৎ ফেরেশতা ও নবী রসূলদের মনোনয়ন সম্পন্ন হয় মহা শক্তিধর আল্লাহর হাতেই। এই মহা শক্তিধর আল্লাহর পক্ষ থেকেই মোহাম্মদ (স.) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর কাছ থেকেই ক্ষমতা লাভ করেছেন। তিনি এই আল্লাহরই মনোনীত ও নির্বাচিত রসূল। কাজেই তাঁকে বাধা দেয়ার শক্তি ঐসব লোকদের কোথায় থাকবে যারা দুর্বল, অক্ষম ও তুচ্ছ দেব-দেবীর চরণে মাথা ঠুঁকে বেড়ায়?

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' অর্থাৎ তিনি শুনেন ও দেখেন। কাজেই তিনি জানেনও। আগে পিছে কি ঘটছে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান তিনি রাখেন। উপস্থিত, অনুপস্থিত, কাছের এবং দূরের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। শুধু তই নয়, বরং সব কিছুর মীমাংসা ও সমাধানও তাঁর হাতেই ন্যস্ত। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাও তাঁর হাতেই ন্যস্ত।

যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে মুসলিম জাতির মনোনয়ন

মোশরেকদের আদর্শের দুর্বল দিক তুলে ধরার পর এবং ওদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারপূর্ণ পূজা অর্চনার প্রসংগ উল্লেখ করার পর এখন মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন দাওয়াত ও তবলীগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য আদর্শের ওপর অটল থাকে। বলা হচ্ছে,

'হে মোমেনরা! তোমরা রুকু করো ও সেজদা করো ....।' (আয়াত ৭৭-৭৮)

এই দুটো আয়াতে মুসলিম জাতির জীবনাদর্শের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। মুসলিম জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালা কী স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন তা বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে এ বাস্তব সত্যটিও তুলে ধরা হয়েছে যে, এই জাতির অস্তিত্ব ও শেকড় ততোদিন পর্যন্ত অটুট ছিলো, আছে এবং থাকবে যতোদিন পর্যন্ত এই জাতি তার নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের ওপর অটল থাকবে, অনড় থাকবে।

এখানে মোমেন বান্দাদেরকে রুকু এবং সেজদার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই রুকু ও সেজদা হচ্ছে নামাযের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান অংগ। এর দ্বারা গোটা নামাযই বুঝানো হয়েছে। ফলে গোটা নামাযই একটি দৃশ্যমান চিত্র, একটা প্রকাশ্য কর্মকান্ড, একটা প্রত্যক্ষ দৃশ্য এবং একটা জ্বলন্ত অভিব্যক্তি রূপে ধরা পড়ছে। বলা নিস্প্রয়োজন যে, এ জাতীয় বর্ণনাভংগির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয় এবং এর আবেদন হয় অত্যন্ত গভীর।

এরপর এবাদাতের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এবাদাত নামাযের তুলনায় ব্যাপক। কারণ, আল্লাহর এবাদাত বা আনুগত্যের আওতায় এমন প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি চিন্তা চেতনায়ই পড়ে যা বান্দা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকে। এই হিসেবে মানুষের জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডই এবাদাতরূপে গণ্য হতে পারে যদি সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্য হয়। এমনকি জাগতিক বৈধ উপকরণ ভোগ করার

মাধ্যমে মানুষ যে তৃপ্তি লাভ করে থাকে সেগুলোও কেবল একটু খানি সতর্কতার ফলে নেক কাজে রূপান্তরিত হয়ে অশেষ সওয়াবের কারণ হতে পারে। এর জন্যে মানুষকে কেবল আল্লাহর কথা স্মরণ রাখতে হবে যিনি তাকে এই নেয়ামত দান করেছেন। সাথে সাথে নিয়ত থাকতে হবে যে, এসব উপকরণ ভোগ করার মাধ্যমে সে আল্লাহর এবাদাতবন্দেগীর জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করছে। কেবল এতোটুকু নিয়তের ফলেই সে এবাদাতের সওয়াব লাভ করতে সক্ষম হবে। অথচ এই নিয়তের ফলে তার সম্ভোগ তৃপ্তির মাঝে কোনোই পার্থক্যের সৃষ্টি হবে না। বরং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ একটা নিরেট দুনিয়ামুখী কাজ ও নিয়তের ফলে আল্লাহমুখী হয়ে যাচ্ছে।

নামায ও এবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর দায়-দায়িত্ব পালন করার নির্দেশের পর সব শেষে সাধারণভাবে সৎ কাজ করার মাধ্যমে মানুষের দায়-দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

কামিয়াবী ও সফলতা লাভের আশা নিয়েই মুসলিম জাতিকে এসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এসব নির্দেশ পালনের মধ্যেই কামিয়াবী ও সফলতা নিহিত। এবাদাতবন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে তার জীবন মযবুত ভিত্তির ওপর কায়েম থাকবে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত থাকবে। তাছাড়া, সৎ কাজের মাধ্যমে জীবনে স্থিতিশীলতা আসে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সামাজিকতার গুণ সৃষ্টি হয়। কারণ এ জাতীয় জীবনের ভিত্তি হচ্ছে অটল ঈমান ও সঠিক আদর্শ।

আল্লাহর সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর, জীবনে স্থিতিশীলতা আসার পর এবং বিবেক বুদ্ধিতে পরিপক্কতা আসার পর সে একটি কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা লাভ করে। তাই তাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে,

'তোমরা আল্লাহর খাতিরে জেহাদ করো, যেমনটি করা উচিত।'

এটা একটা ব্যাপক ও সুক্ষ্ম অর্থবহ বর্ণনাভংগি। এর দ্বারা এমন একটি বিরাট ও গুরুদায়িত্বের প্রতি ইংগিত করা হচ্ছে যা পালন করার জন্যে এ জাতীয় ঈমানী শক্তি, আমলের হাতিয়ার এবং মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার অর্থ অনেক ব্যাপক এর দ্বারা শত্রুর সাথে লড়াই করা বুঝায়, নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা বুঝায় এবং অমংগল ও অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই বুঝায়। এক কথায় এই সব ধরনের লড়াই 'জেহাদ' শব্দের আওতায় পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতিকেই এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে নির্বাচিত করেছেন, মনোনীত করেছেন। কাজেই এই দায়িত্ব ত্যাগ করারও কোনো অবকাশ নেই এবং তা এড়িয়ে চলারও কোনো সুযোগ নেই। বরং এই দায়িত্বকে নিজেদের জন্যে একটা গৌরব ও মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং বিনিময়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সাথে সাথে এই গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাও উচিত।

এই গুরুদায়িত্বের মাঝে আল্লাহর রহমত ও দয়া নিহিত রয়েছে। তাই বলা হচ্ছে,

'এবং জীবন বিধানের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ইসলামের সকল আদেশ নিষেধ, সকল এবাদাত বন্দেগী এবং সকল বিধি বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি, শক্তি ও সামর্থের দিকটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

আরো বিবেচনায় রাখা হয়েছে সেই স্বভাবের দাবী পূরণের বিষয়টি। এই ধর্মে মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যকে গঠনমূলক কাজে, উন্নতি ও অগ্রগতির কাজে নিয়োগের স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে তা আটকে থাকা বাষ্পের ন্যায় অবরুদ্ধও থাকে না এবং বাঁধনমুক্ত পশুর ন্যায় অবাধে বিচরণও করে না।

এটা হচ্ছে একটা শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শ যার সূচনা মানবতার আদিকাল থেকে এবং যা অতীত ও বর্তমানের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে। তাই বলা হয়েছে,

'তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাকো।'

কারণ এই ধর্মই হচ্ছে তাওহীদের উৎস যার ধারাবাহিকতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। এতে মূল আকীদা বিশ্বাসের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়ার মতো কোনো ব্যবধান বা ফারাক সৃষ্টি হয়নি যেমনটি সৃষ্টি হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্ববর্তী যুগের রেসালাতের ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তায়ালা এই তাওহীদবাদী জাতিকে মুসলিম জাতি নামে আখ্যায়িত করেছেন, পূর্বেও এই নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এখন কোরআনেও এই একই নামে আখ্যায়িত করছেন। বলা হচ্ছে,

'তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও।'

ইসলামের মর্মার্থ হচ্ছে, কায়মনবাক্যে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করা। তাই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নবী রসূলদের আমলে এবং বিভিন্ন আসমানী কেতাবের সময়ে এই জাতি একই আদর্শের অধিকারী ছিলো। এই ধারাবাহিকতা হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে এই আদর্শ উম্মতে মোহাম্মাদীকে হস্তান্তরিত করা হয় এবং মানবতার প্রতি যে অংগীকার ও দায়িত্ব সেটা তার ওপর ন্যস্ত করা হয়। ফলে এই জাতি বা উম্মতের অতীতের সাথে তার বর্তমান ও ভবিষ্যত একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়ও এটাই ছিলো। তাই বলা হচ্ছে,

'যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে।'

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স.) এই উম্মতের জন্যে সাক্ষী হবেন। এই উম্মতের আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন এবং তাদের ভালো-মন্দ ও শুদ্ধতা অশুদ্ধতার দিকগুলো চিহ্নিত করবেন। একইভাবে এই উম্মত ও অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর জন্যে সাক্ষী হবে। ফলে নবীর পরে এই উম্মতই হবে মানব জাতির অভিভাবক। এই উম্মতের আইনের মানদন্ড, এর শিক্ষার মানদন্ড এবং জীবন ও জগত সম্পর্কিত এর চিন্তা ও দর্শনই হবে অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর জন্যে অনুসরণীয় ও পালনীয় বিষয়। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন স্বয়ং এই উম্মত তার নিজস্ব আদর্শের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হবে, যত্নশীল হবে। কারণ তার আদর্শ আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত। তার আদর্শ শাশ্বত ও চিরন্তন।

যতোদিন পর্যন্ত এই উম্মত সেই আদর্শের ওপর অটুট ছিলো এবং যতোদিন পর্যন্ত এই আদর্শকে নিজের ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করেছে, ততোদিন পর্যন্ত সে গোটা মানব জাতির অভিভাবক ছিলো। কিন্তু যখনই সে এই আদশ হতে বিচ্যুত হয়েছে, এই আদর্শের দায় দায়িত্ব ত্যাগ করেছে তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে নেতৃত্বের প্রথম সারি থেকে হটিয়ে দিয়ে অনুগামীদের পেছন সারিতে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। এই অবস্থা চলতে থাকবে যতোদিন পর্যন্ত না এই আদর্শ রক্ষার গুরুদায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা মনোনীত জাতির হাতে ন্যস্ত হয়।

এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে যেহেতু সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন, প্রস্তুতির প্রয়োজন তাই মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সালাত কায়েমের, যাকাত প্রদানের এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার। কারণ, সালাত হচ্ছে সহায় ও শক্তির উৎসের সাথে দুর্বল ও মরণশীল বান্দার যোগসূত্র। যাকাত হচ্ছে সামষ্টিক জীবনের বন্ধন, প্রয়োজন ও দুঃসময়ে নিরাপত্তার চাবিকাঠি। আর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা হচ্ছে মাবুদের সাথে বান্দার এমন অটুট বন্ধন যা ছিন্ন হওয়ার নয়।

এসব প্রস্তুতি গ্রহণের পর মুসলিম জাতি গোটা বিশ্ব মানবতার অভিভাবকরূপে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্বাচিত করেছেন, মনোনীত করেছেন। এর সাথে সে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও শক্তিকে নিজের কল্যাণে ও স্বার্থে কাজে লাগাতে পারবে। এসব পার্থিব সম্পদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন উদাসীন নয়। বরং প্রয়োজনীয় ঐক্য, শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করার মাধ্যমে এগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে আহ্বান করে। কারণ এগুলোর সদ্ব্যবহার কল্যাণমুখী ব্যবহার, গঠনমূলক ব্যবহার এবং উন্নয়নমুখী ব্যবহার একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

মানব জাতির জন্যে মনোনীত আল্লাহর বিধান বা আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মানব জাতি জাগতিক জীবনে আল্লাহর নির্ধারিত পূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছতে পারে। কারণ, এই আদর্শ মানব জাতিকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় কেবল আহার, বিহার ও ভোগের শিক্ষা দেয় না।

উন্নত মানবিক মূল্যবোধ অবশ্যই প্রয়োজনীয় বস্তুতান্ত্রিক জীবনের ওপর নির্ভর করবে। তবে এই আদর্শের প্রধান মূল্যবোধ ইসলাম চায়, মানুষ আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানে অবিচল থেকে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ গ্রহণ করুক।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ